ইনবাত এডুকেশন কর্তৃক পরিচালিত 'ওনলি সিস্টার্স কোর্স'- এর পাঠ্যপুস্তক

محصنات

মুহসানাত

পবিত্র নারীদের পাঠশালায়



inbaat publication

মুহসানাত

সংকলকবৃন্দ : শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন
আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর
বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার
সায়মা সাজ্জাদ মৌসি
খন্দকার মারিয়াম হুমায়ুন

কোর্সের মুদাররিসাহবৃন্দ : আনিকা তুবা
সায়মা সাজ্জাদ মৌসি
বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার
খন্দকার মারিয়াম হুমায়ুন

সম্পাদনা : আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর
বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার

শরঈ সম্পাদনা : শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন

বানান : মাকামে মাহমুদ

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর

محصنات

মুহসানাত

পবিত্র নারীদের পাঠশালায়

ইনবাত পাবলিকেশন

অন্তরগুলোতে হোক ঈমানের অঙ্কুরোদগম

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين، و الصلاة و السلام على عبده و رسوله نبينا محمد بن عبد الله، إمام الدعاة إليه و صلى الله و سلم و كرم و بارك عليه و على آله و على أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময়। সকল প্রশংসা জগতের প্রতিপালকের জন্য এবং অন্তিম প্রতিদান মুত্তাকীদের জন্যই। সালাত ও সালাম আল্লাহর বান্দা, রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ–এর ওপর। যিনি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের ইমাম। তাঁর ওপর আল্লাহ ﷻ–এর দয়া, অনুগ্রহ ও বরকত নাযিল হোক। অনুরূপ তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিদের ওপর এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাঁদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণকারীদের ওপর।

সূচীপত্র

সম্পাদকদ্বয়ের কথা

মুহস্বানাত—সেই সকল নারী যারা নিজেদের আব্রু রক্ষা করে চলে। একজন নারীর জন্য 'মুহস্বানাত' শব্দটির ব্যাপকতা অনেক। একজন মু'মিনা নারী চোখ বুজে কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়ার মতো নিম্নমানের চিন্তাধারা লালন করে না। তার জীবন জুড়ে রয়েছে অসংখ্য দায়িত্ব এবং কর্তব্য। সেই দায়িত্বের দিক থেকে তার অবস্থান অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। আর সেই দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জ্ঞান রপ্ত করতে দরকার প্রচুর পড়াশোনা।

জেনারেল শিক্ষিত নারীরা হিদায়াত লাভের পর থেকেই এ সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেতন হতে থাকে। সে তার সাধ্যমতো নানান মাধ্যম থেকে এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করে। বইপত্র ও ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি বা দ্বীনি আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে সেই পড়াশোনা চলতে থাকে। কিন্তু পর্দার আড়ালে তার এ সকল পরিশ্রমেও বিশাল একটা ফাঁক-ফোকর থেকেই যায়। তার প্রয়োজন পড়ে শরঈ বিষয়ে বিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সোহবতে থেকে সরাসরি দ্বীনি ইলম অর্জনের। কিন্তু তার পক্ষে বাসার বাইরে বের হয়ে ঘুরে ঘুরে ইলম অর্জন অসম্ভবপ্রায়। নানান বিষয়ের ক্ষেত্রে তাকে সুস্পষ্ট শরঈ জ্ঞান অর্জন করতে হয়; যেমন- ত্বহারাত, বিবাহ, বর্তমান ফিতনার সমাজ, ফেমিনিজম, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়, ইলম অনুযায়ী আমলকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ফিকহী বিষয় থেকে বের হয়ে এসে তাকে নানান জীবনমুখী জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। যেমন: পর্দা কীভাবে করবে, কাদের সামনে করবে আর কাদের সামনে করবে না—এসব সম্পর্কে সহজে জানা গেলেও প্রতিকূল অবস্থায় পর্দা কীভাবে রক্ষা করবে তাকে সেটা নিজ থেকেই জানতে হয়। যেহেতু জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত বোনদেরকে না চাইতেও প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হতে হয়; তাই পুরুষদের যৌন মানসিকতা, নারীবাদীদের ভয়ানক থাবা, পর্নোগ্রাফির নীল অন্ধকারের কুপ্রভাবসহ আরও নানান বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হয়। আবার পবিত্রতা বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানগুলো অর্জন করা সম্ভব হলেও প্রতিনিয়ত নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাকে, যার কোনো উত্তর সে খুঁজে পায় না। পবিত্রতা, বিবাহ, গর্ভধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো মেডিকেল দৃষ্টিকোণ থেকে জেনে রাখাও প্রতিটি নারীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে চলে আসে মেডিকেল বিষয়ক অনেক প্রশ্ন। কিন্তু একজন মু'মিনা নারীর জন্য

যখন তখন কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াটাও সহজতর নয়। এসব কিছুকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে ইনবাত এডুকেশন কর্তৃক পরিচালিত 'ওনলি সিস্টার্স কোর্স' এর মাধ্যমে। আর 'মুহস্বানাত' সেই কোর্সেরই পাঠ্যপুস্তক।

বহু দিক বিবেচনায় রেখে 'মুহস্বানাত' কে সাজানো হয়েছে। নারীদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ফিক্বহী মাসআলাগুলোর সকল উত্তর প্রদান করেছেন বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, যা কোর্সে দারসের মাধ্যমে সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করে থাকেন মুহতারমাহ আনিকা তুবা। অপরদিকে মুহতারমাহ সায়মা সাজ্জাদ মৌসি মেডিকেল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল ব্যাখ্যা যথেষ্ট বোধগম্য ভাষায় প্রদান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। পুরুষদের মনস্তত্ব অংশটুকু The Nafs Psychological & Spiritual Wellness Centre এর পরিচালিকা মুহতারমাহ খন্দকার মারিয়াম হুমায়ুনের অসামান্য সংযোজন। এছাড়াও বইয়ের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা, Men's Psychology Survey থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত নিরূপণ, পুরুষদের অনুষাঙ্গিক বিষয়াদি উল্লেখ ও সম্পাদনা করেছেন আমার উস্তায ও উত্তম অর্ধেক আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর। আর নারীদের দৈনন্দিন প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পর্কে সামান্য সংযোজন ও সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি আমি বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার। সেই সাথে শতাধিক ত্বলিবাহ বোনদের প্রশ্নোত্তরের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে 'মুহস্বানাত'। আল্লাহ ﷻ সকলকে নিরাপত্তার চাঁদরে ঢেকে নিক। আমীন।

......

এক মহা সুনামি। সেই সুনামির ঢেউ আঁচড়ে পড়ছে জন সমুদ্রে। নাজেহাল করে দিচ্ছে পরিবারের গিঁট। ছিন্ন হচ্ছে দাম্পত্যের মধুর বন্ধনগুলো। দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে রবের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হারাম-হালাল পার্থক্যকারী দেওয়াল। ফলে আমরা সাক্ষী হচ্ছি হালের ভয়ানক সব অভিজ্ঞতার। আমাদেরই এই অবস্থা, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কী হতে চলেছে তা কি ভাবা যায়! এই ফিতনার সুনামি থেকে রক্ষা পায়নি দ্বীনিমহলও। বাকি তিন উপেক্ষা করে শুধু দ্বীন দেখে বিয়ে করার পরও অনেকের সংসার ভেঙে যাচ্ছে অল্প সময়েই। এর স্বরূপ সন্ধান হয়ে পড়েছিল সময়ের দাবি। মুহস্বানাতের মাধ্যমে আমরা সেটাই চেষ্টা করেছি। কিতাবটিতে পুরুষদের মনস্তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ করে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ওপর বিস্তর আলোচনার মাধ্যমে খুঁটিনাঁটি বিষয়গুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সাথে রয়েছে ৮০ জন পুরুষের ওপর "ইনবাত মেন'স সাইকোলজি সার্ভে" এর রিপোর্ট। এর সাথে আবার যুক্ত করা হয়েছে নারীদের

বিভিন্ন বিষয়ে পুরুষদের মন্তব্য যার মাধ্যমে নারীদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

ইনবাত এডুকেশন-এর ওনলি সিস্টার্স কোর্সের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে 'মুহস্বানাত'- এ পবিত্রতা, পর্দা, সাজগোজ, বিবাহ পূর্ববর্তী-পরবর্তী, সন্তান-লালন ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর মাসআলাগত আলোচনা ও জীবনধর্মী বিষয়সমূহের বাস্তবিক প্রয়োগ পদ্ধতির পাশাপাশি হায়েয-নিফাস, বিবাহ, গর্ভকাল ইত্যাদি বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে পুরুষদের মনস্তত্ব। আমরা আশা করি যে, 'মুহস্বানাত' কিতাবটি থেকে আহরিত জ্ঞান একজন নারীর জন্য দ্বীন মেনে চলতে সহায়ক হবে, পরপুরুষদের থেকে পবিত্র নারীদের আব্রু রক্ষার্থে এবং আপন স্বামীর মন বুঝে তাকে সন্তুষ্টি রাখার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে ইন শা আল্লাহ।

আসন্ন ভয়াবহ দাজ্জালীয় ফিতনার মোকাবেলায় 'মুহস্বানাত' কতটুকু ঢাল হিসেবে কাজে দেবে এই গায়েবী বিষয়ের ইলম যেই সত্তার কাছে রয়েছে, তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। সেই সাথে মুহস্বানাতের পিছনে ব্যয়কৃত আমাদের অক্লান্ত, রাত জাগা পরিশ্রমের বিষয়েও সেই রবই সাক্ষী। আমরা এর প্রতিদান কেবল সেই মহান সত্তার রব্বুল আলামীনের কাছেই আশা করি। আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে তার মনোনীত বান্দাদের মাঝে শামিল করে নিন, আমীন।

সম্পাদকদ্বয়

বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার, আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর

১১ জুমাদাল আউয়াল ১৪৪২

২৭ ডিসেম্বর ২০২০

শরঈ সম্পাদকের কথা

نحمده حمداً كثيراً، فلا أحد أحق بالحمد منه، ولن نبلغ كمال حمده مهما حمدناه، ونشكره على ما هدانا وأولانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ من عرفه أحبه وعظمه وعبده ولهج بحمده وشكره والثناء عليه بما هو أهله، ومن جهله تمزق قلبه، وضاق صدره، وشقي في دنياه وأخراه ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ كان أكثر الناس بالله تعالى علما ومعرفة، وأشدهم حبًا وتعظيماً له سبحانه، وأكثرهم خضوعاً وتعبداً له عز وجل، قام ليلة يصلي فاقتربت منه عائشة رضي الله عنها فقال: «يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّي» فما زال يصلي ويبكي حتى الفجر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

আল্লাহ ﷻ-এর এক অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত সৃষ্টি হচ্ছে নারীজাতি। পুরুষকুলের মানসিক স্বস্তি ও মানবকুল বিস্তারে তারাই অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

তিনি ঐ সত্ত্বা যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং এর মাঝ থেকেই তিনি তোমাদের একে অপরের (বৈবাহিক) জোড়া নির্ধারণ করেছেন যাতে করে সে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে।[১]

মহান আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারীমে নারীদের ফজিলত ও তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান নিয়ে স্বতন্ত্র সূরাই নাযিল করেছেন যার নাম 'আন নিসা'। 'নিসা' শব্দের অর্থই হচ্ছে- 'নারী'। এছাড়াও নেককার নারীদের প্রতিনিধিত্ব করে এমন এক

[১] সূরা আ'রাফ- ১৮৯

সৎকর্মশীল নারীর নামেও আল্লাহ ﷻ আলাদা একটি সূরা নাযিল করেছেন যার নাম 'আল মারিয়াম'।

এছাড়াও আরও বহু আয়াত ও হাদীসে তাদের ব্যাপারে যেসব বক্তব্য এসেছে তাতে ঈর্ষান্বিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অথচ পুরুষ জাতির ব্যাপারে এসব দৃষ্টান্ত বেনজির! এতেই বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ ﷻ পুণ্যবতী নারীদের ব্যাপারে কতটা সজাগ ও সদয়! আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾

সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা (যারা) অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে (নিজেদের) হিফাযত করে ঐ বিষয়ের যা স্বয়ং আল্লাহ হিফাযত করেছেনে। [২]

পুণ্যবতী ও পবিত্র নারীদের ফজিলতের ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে–

الدُّنيا كلُّها متا عٌ، وخيرُ متا ع الدنيا المرأةُ الصالحة

গোটা দুনিয়াই হচ্ছে সম্পদ আর এর মাঝে উত্তম সম্পদ হচ্ছে পুণ্যবতী নারী। [৩]

أربعٌ مِن السَّعادةِ: المرأةُ الصَّالحةُ، والمسكَنُ الواسعُ، والجارُ الصَّالحُ، والمركَبُ الهنيءُ،

وأربعٌ مِن الشَّقاوةِ: الجارُ السَّوءُ، والمرأةُ السَّوءُ، والمسكَنُ الضَّيِّقُ، والمركَبُ السَّوءُ

৪টি বিষয় হচ্ছে সৌভাগ্যের–নেককার নারী, সুপ্রশস্থ ঘর, নেককার প্রতিবেশী এবং দ্রুতগামী তবে নিরাপদে চলে এমন আরোহন। আর ৪টি বিষয় হচ্ছে দুর্ভাগ্যের–বদকার প্রতিবেশী, বদকার নারী, সংকীর্ণ (স্থানের) ঘর আর খারাপ আরোহন। [৪]

قيل يا رسولَ اللهِ، أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال: التي تسرُّهُ إذا نظَرَ، وتُطيعُهُ إذا أمرَ، ولا تُخالفُه في نفسِها ولا في مالِهِ بما يكرهُ

নবীজি ﷺ–কে জিজ্ঞাস করা হলো যে, "হে আল্লাহর রাসূল! কোন নারী উত্তম?" তিনি ﷺ বললেন– "ঐ স্ত্রী যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে সে খুশি করে। তাকে

---

[২] সূরা নিসা- ৩৪

[৩] সহীহ মুসলিম- ১৪৬৭; সুনানে ইবনু মাজাহ- ১৮৫৫

[৪] মুসনাদে আহমাদ- ১৪৪৮; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৪০৩২, হাদীসটির মান সহীহ।

নির্দেশ দিলে আনুগত্য করে। তুমি তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে সে তার নিজেকে এবং তোমার সম্পদকে সকল অনিষ্ট হতে হেফাজত করে।" [৫]

সাহাবাগণ ﵃ একবার বললেন–

يارسولَ اللهِ،أيَّ المالِ نتَّخذُ؟فقالَ:ليتَّخِذْأحدُكُم قلبًاشاكرًا،ولِسانًاذاكرًاوزَوجةً مُؤمِنَةًتعينُأحدَكُم علَى أمرِ الآخِرةِ

হে আল্লাহর রাসূল, কোন সম্পদ আমরা গ্রহণ করব?" তিনি ﷺ বললেন- "তোমরা শুকরিয়া আদায়কারী অন্তর, সদা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত জিহ্বা এবং তোমাদের আখিরাতে সফল করতে সহায়তা করবে এমন স্ত্রীদেরকে উত্তম সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করো।" [৬]

جَاءَرَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: مَن أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أَبُوكَ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে এসে জিজ্ঞাস করলেন যে, "কোন ব্যক্তি আমার উত্তম আচরণের অধিক হকদার?" তিনি বললেন- "তোমার মা।" লোকটি বলল- "অতঃপর কে?" তিনি আবারও জবাব দিলেন- "তোমার মা।" লোকটি আবার বলল- "অতঃপর কে?" তিনি এবারও জবাব দিলেন- "তোমার মা!" এরপর লোকটি একই প্রশ্ন আবার করলে এবার নবীজি ﷺ উত্তর দিলেন- "তোমার বাবা!" [৭]

নেককার ও পুণ্যবতী নারীদের ফজিলত বুঝাতে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সমূহ দ্বারা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

নেককার নারী যেমনিভাবে সম্মান, আব্রু, মর্যাদা ও উপকারের সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থান করে; অনুরুপভাবে নারী যদি বদকার হয় তাহলে সে ব্যাক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির জন্য অভিশাপ ও অনিষ্টকারিনী হয়ে থাকে। নারী যেমন তার পুণ্য ও পবিত্রতা দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির নির্মলতা বজায় রেখে সেগুলো গড়ে তুলতে

---

[৫] সুনানে আবু দাউদ- ১৬৬৪; সুনানে নাসাঈ- ৩২৩১; সুনানে ইবনু মাজাহ- ১৮৫৭; মুসনাদে আহমাদ- ২/৪৩২, ৪৩৮, ২৫১, হাদীস ৭৪২১; মুস্তাদরাকে হাকেম- ২/১৬১, সনদ হাসান।

[৬] মুসনাদে আহমাদ- ২২৪৩৭; জামেউস সগীর- ৭৫২৬; সুনানে ইবনু মাজাহ- ১৮৫৬, শাইখ শুয়াইব আল আরনাউত্ব ﵀ একে হাসান লি গইরিহী বলেছেন এবং অনেক মুহাদ্দিস এর সনদকে সহীহ লি গইরিহী আখ্যায়িত করেছেন।

[৭] সহীহ বুখারী- ৫৯৭১; সহীহ মুসলিম- ২৫৪৮

ভূমিকা রাখে; তদ্রূপ বদকার নারী উল্টো পরিবার, সমাজ এবং জাতির জন্য হয়ে উঠে বিধ্বংসী!

নবীজি ﷺ বলেন,

ما تركت بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء

আমার চলে যাওয়ার পর আমি পুরুষদের উপর ফিতনার (পরীক্ষার) বিষয় হিসেবে নারী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর আর কিছু রেখে যাচ্ছি না! [৮]

অন্যত্র বর্ণিত রয়েছে যে,

صِنْفَان من أهل النار لم أرَهُما: قوم معهم سِيَاط كأذْنَابِ البَقر يضربون بها الناس، ونساء كاسِيَات عاريات مُمِيلات مَائِلات، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلة لا يَدْخُلْن الجَنَّة، ولا يَجِدْن ريحها، وإن ريحها ليُوجَد من مَسِيرة كذا وكذ (وفي رواية: من مسيرة خمسمائة عام)

দুই প্রকার জাহান্নামী মানুষ আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করি নি (অর্থাৎ, আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে)- এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। আর পোশাক পরিহিত উলঙ্গ নারী (অর্থাৎ নারীরা এমন নগ্ন ও পাতলা পোশাক পরবে যে, বাস্তবে উলঙ্গ থাকবে), (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। (ফ্যাশন ও স্টাইল করার নিমিত্তে) তাদের মাথা (চুলের গোছা) হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো! এ ধরনের নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে (এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তা ৫০০ বছরের দুরত্ব থেকে পাওয়া যায়) [৯]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ، كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (وفي رواية الحاكم: سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَاثِرِ حَتَّى يَأْتُوا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ)، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ

[৮] সহীহ বুখারী- ৫০৯৬; সহীহ মুসলিম- ২৭৪০

[৯] সহীহ মুসলিম- ২১২৮; শরহু মুসলিম, নববী- ১৭/১৯১; মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৪৬/২২

الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ

অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে শেষ যামানায় একদল পুরুষের আবির্ভাব হবে, যারা বাহনে বসার জন্য তৈরিকৃত নরম ও রেশমের কাপড়ে তৈরি গদিতে আরোহন করবে। এমনকি তাদের ঐ যানবাহন নিয়েই তারা মসজিদে সালাত পড়তে আসবে (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে)! তাদের মেয়েরা কাপড় পরিহিত হয়েও উলঙ্গ থাকবে! (ফ্যাশন ও স্টাইল করার নিমিত্তে) তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো! ওদের অভিশাপ দাও কেননা ওরা সবাই অভিশপ্ত! যদি আল্লাহ ﷻ এই উম্মতের পর অন্য কোন উম্মত সৃষ্টি করতেন তাহলে এসব নারীদেরকে তাদের পরবর্তী উম্মতের খাদেমা হিসেবে নিযুক্ত করতেন যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের (বনী ইসরাইলের) নারীদেরকে (তাদের অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানির কারণে) তাদের পরবর্তী উম্মতের খাদেমা নিযুক্ত করা হয়েছিল! [১০]

এসব হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে, বদকার নারী আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ দৃষ্টিতে নিন্দিত ও অভিশপ্ত।

এজন্যই একজন নারী শরী'আতে ইসলামীর বিধি-নিষেধ জেনে কিভাবে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও পুণ্যবতী হয়ে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারিনী হতে পারে এবং কিভাবে একটি পবিত্র ও সুন্দর পরিবার, সমাজ এবং জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে তারই নজির ও দৃষ্টান্ত পেশ করার নিমিত্তে আমাদের 'ইনবাত এডুকেশন'-এর উদ্যোগে অনলাইনে নারী বিষয়ক একটি কোর্সের আয়োজন করা হয়েছিলো। কোর্সের অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল বোনই এখান থেকে বেশ উপকৃত হয়েছে বলে আমরা আশা করি। সেই উপকারকে আরও সুবিস্তৃত করতে এই অধমের আগ্রহে ইনবাত এডুকেশনের সম্মানিত পরিচালক ও ইনবাত পাবলিকেশনের প্রকাশক সাহেব কোর্সের মোডিউলশীট কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি করে বই আকারে প্রকাশ করতে সিদ্ধান্ত নেন। এরপর বইটির নাম কি হতে পারে সেই চিন্তায় আল্লাহ ﷻ এই অধমের অন্তরে কুরআনের সূরা নিসা- ২৪, ২৫; সূরা আম্বিয়া- ৯১; সূরা নুর- ২৪ সহ কয়েকটি আয়াত মনে করিয়ে দিলেন।

যেখানে আল্লাহ পবিত্র, সতীসাধ্বী ও পতিব্রতা নারীদের কে 'মুহস্বানাত' (محصنات) শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। আমার নিকট নেককার নারীদেরকে 'আল-মুহস্বানাত–

---

[১০] মুসনাদে আহমাদ- ১১/৬৫৪; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৫৭৫৩; মুস্তাদরাকে হাকেম- ৪/৪৩৬; ফতহুর রব্বানী, আহমাদ আব্দুর রহমান আল বান্না- ১৭/৩০১

'المحصنات' শব্দ দ্বারা উপাধি দেওয়া অপেক্ষা অন্য কিছুকে উত্তম মনে হয়নি। সুতরাং প্রকাশক সাহেবের সাথে পরামর্শক্রমে বইটির নাম রাখা হয়েছে *'মুহস্বানাত (পবিত্র নারীদের পাঠশালায়)'* আলহামদুলিল্লাহ আ'লা কুল্লি হাল।

অধমের পাশাপাশি বইটি সাজাতে পুরুষদের মনস্তাত্ত্বিক, নারীদের প্রায়োগিক ও মেডিক্যাল বিষয়াদি লেখা লিখে সম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে অক্লান্ত, নিরলস ও আন্তরিক ভুমিকা রেখেছেন প্রিয় অনুজ উস্তায আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (زاد الله همته), বারিয়াহ বিনতে আতিয়ার (عفاالله عنها), সায়মা সাজ্জাদ মৌসি (كشف الله غمتها), খন্দকার মারিয়াম হুমায়ুন (حصن الله أخلاقها)। আল্লাহ ﷻ এই কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের সবাইকে এর উত্তম বিনিময় দুনিয়া ও আখিরাতে প্রদান করুন। আমীন।

এত কিছুর পরেও মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এই বইয়ের শরী'আহ সম্পর্কিত লেখালেখির যা কিছু সঠিক ও উপকারী বিষয় বিবেচিত হবে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যেসব ভুল হবে তার দায়ভার আমার ও বিতাড়িত শয়ত্বানের দিকে সম্পৃক্ত হবে!

إن أحسنت فمن الله، و إن أسأت أو أخطأت فمن نفسي، و الشيطان

আহক্কারুল ই'বাদ-

আব্দুল্লাহ আল মামুন (উ'ফিয়া আনহু)

১৫ জুমাদাল আউয়াল ১৪৪২

৩১ ডিসেম্বর ২০২০



||১ম দারস||

মুত্বাহ্হিরাহ- ১

রবকে সন্তুষ্ট করতে আমরা প্রতিনিয়ত সাধ্যমতো আমল করে যাচ্ছি। সিংহভাগ আমলের পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। তাই শরী'আহর আলোকে পবিত্রতা কীভাবে অর্জন করা যেতে পারে সেই বিষয়ে যথাসাধ্য জ্ঞানার্জন করা দরকার। পবিত্রতার অংশে নারীদের এমন অনেক বিধান রয়েছে যা খুব ভালো করে এবং খোলামেলাভাবে আমাদের জেনে নেয়া আবশ্যক।

১. হায়েয

◆ **আভিধানিক অর্থ-** প্রবহমান।

◆ **পারিভাষিক অর্থ-**

هي دماء طبيعية تخرج من الرحم كل شهر لعدة أيام يصاحبها ألم في أسفل البطن والظهر وتختلف في شدتها من فتاة إلى أخرى

প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের যোনিপথ থেকে দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন ও কালচে বর্ণের রক্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত হয়, তাকে হায়েয বলে। এবং এই সময়ে সাধারণত তার তলপেট ও পিঠ বেশ ব্যথা করে। [১]

২. হায়েযের গণনা

ইমাম আবু হানীফা ﷺ, ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী ﷺ—এর মতে হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা ৩ দিন আর সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত,

أقل الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة

[১] আল মু'জামুল ওয়াসিত্ব- ১/২১২; লিসানুল মীযান, ইবনু মানযূর- ৭/১৪২; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, মাওসীলি- ১/২৬; আল হিদায়াহ, মারগীনানী- ১/৩২; শরহুস সগীর আলা আক্বরাবিল মাসালিক ইলা মাযহাবি ইমাম মালিক, দারদীর- ১/২০৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, রমালী- ১/৩০৪; নাইলুল মাআরেব বি শারহে দালীলিত ত্বলেব, তুগরবী- ১/১০৪; মাওসূয়াতু ফিক্বহিয়্যাহ- ১৮/২৯২

বাকেরা (কুমারী) ও সাইয়্যেবাহ (অকুমারী) উভয় নারীর জন্যই হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হচ্ছে ৩ দিন আর সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে ১০ দিন। এর বেশি হলে তা ইস্তিহাযা বলে বিবেচিত হবে। [২]

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী ﵀ এ বিষয়ে বহু হাদীস উল্লেখ করেন, যেগুলোর সনদ হাসান ও দলিলযোগ্য বলে তিনি রায় প্রদান করেছেন। [৩]

সুতরাং বোঝা গেল হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা ৩ দিন আর সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন। এর উপরে যা হবে তা ইস্তিহাযা। ইস্তিহাযা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আসছে ইন শা আল্লাহ।

মেয়েদের একই মাসে দুই হায়েযের মাঝে সর্বনিম্ন পবিত্রতার সময় হচ্ছে ১৫ দিন। এই ব্যাপারে হানাফী,[৪] মালেকী,[৫] শাফে'য়ী ও হাম্বলী[৬] মাযহাবের জমহুরগণ একমত।

৩. হায়েয শেষ হয়েছে কিনা তা বোঝার উপায়

জীবনে প্রথম বার হায়েয হলে হায়েয শেষ হয়েছে কিনা তা বুঝতে হায়েযের লাল রক্ত বন্ধ হওয়া দেখতে হবে। এজন্য লজ্জাস্থানে তুলা বা ন্যাকড়া রেখে কিছুক্ষণ পরে বের করে এনে তা শুকনো অথবা রক্তবিহীন ও পরিষ্কার দেখতে পেলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে নেবে। হাদীস থেকে জানা যায়, মহিলারা আয়েশা ﵂ এর নিকট কৌটায় করে তুলা প্রেরণ করত। তাতে হলুদ রং দেখলে আয়েশা ﵂ বলতেন "তাড়াহুড়া কর না, সাদাস্রাব বা পরিষ্কার রক্ত দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।" এর দ্বারা তিনি হায়েয হতে পবিত্র হওয়া বোঝাতেন।[৭] পবিত্রতার ক্ষেত্রে কখনো কখনো সাদাস্রাবও বের হতে পারে। তবে এটা বের হওয়া জরুরি না।

যদি কোনো নারীর হায়েয বন্ধের একটি স্বাভাবিক অভ্যাস থেকে থাকে সেই অনুযায়ী হায়েয বন্ধ হলে ঐ সময়েই গোসল সেরে পবিত্র হয়ে নামায পড়ে নেবে। অর্থাৎ হায়েযের রক্ত দৃশ্যমান হওয়ার পর থেকে শুরু করে যতদিন শেষে তা সচরাচর বন্ধ হয়ে থাকে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– কারো মাসের ১০ তারিখে হায়েয শুরু হলে ১৬

---

[২] নাসবুর রয়াহ, যাঈলায়ী- ১/১৯১; আল বিনায়াহ, আইনী- ৩/৬১৬; বাদায়েউস সানায়ে, কাসানী- ১/৪০

[৩] ফাতহু বাবিল ই'নায়াহ ফি শারহি কিতাবিন নুক্বায়াহ- ১/১২৪

[৪] হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন- ১/২৮৫

[৫] আল ইখতিয়ার- ১/২৯; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনু রুশদ- ১/৫৩

[৬] মুখতাসারু কিতাবিল উম্ম- ১/৬৫-৬৬; আল আওসাত্ব ফিস সুনানি ওয়াল ইজমা, ইবনুল মুনযির- ১/২৫৫; আহকামুন নিসা, ইবনুল জাওযী- ২৭

[৭] মুআত্ত্বা মালিক- ১/৫৯; সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী তা'লীক হিসেবে এ হাদীস এনেছেন। মুসান্নাফ ইবনু আব্দুর রযযাক- ১/৩০২; হাদীস- ১১৫৯; হাদীসটির সনদ হাসান।

তারিখে শেষ হয়। আবার পরের মাসের ৭ তারিখ হায়েয শুরু হলে ১৩ তারিখ শেষ হয়। এমনটাই যদি চলমান থাকে তাহলে ঐ নারীর হায়েযের অভ্যাস ৬ দিন। এভাবে অভ্যাস অনুযায়ী যেই সময়ে হায়েয বন্ধ হবে তখন পবিত্র হয়ে নিবে। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে এই ক্ষেত্রে সাদাস্রাব আসতেই হবে এমনটা জরুরি নয়; বরং লাল রক্ত বন্ধ হলেই হায়েয শেষ হয়ে গেছে বলে ধর্তব্য হবে।

তবে অনেকেরই হায়েয বন্ধ হওয়ার স্বাভাবিক কোনো অভ্যাস থাকে না। অর্থাৎ প্রতি মাসেই হায়েযের সময়কাল কমবেশি হয়, সেক্ষেত্রে রক্ত যখনই পুরোপুরি অদৃশ্যমান হবে তখনই গোসল করে নামায আদায় করা তার জন্য আবশ্যক হবে।[৮]

৪. নিয়মতান্ত্রিকভাবে একবার হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পরে ২-৩ দিনের মধ্যে আবার রক্ত দৃশ্যমান হওয়া

এমতাবস্থায় অনেকেই একে হায়েয মনে করে সালাত ছেড়ে দেয়। অথচ এটি হায়েয হিসেবে পরিগণিত হবে না। কেননা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে যে, দুই হায়েযের মাঝে কমপক্ষে ১৫ দিনের পবিত্রতা থাকতে হবে। এর মাঝে যেই রক্ত দেখা যাবে তা ইস্তিহাযা হিসেবে পরিগনিত হবে।

৫. হায়েয এবং ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য

হায়েয ও ইস্তিহাযা একে অপর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর পার্থক্য বোঝা প্রয়োজন । কেননা এর একটির কারণে নামায ও অন্যান্য ইবাদত ছেড়ে দিতে হয় কিন্তু অপরটির কারণে নামায বা অন্যান্য ইবাদত ছাড়া যায় না। কোনো নারীর হায়েয হলে সে অপবিত্র বলে গণ্য হবে এবং সালাত, সিয়াম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবে এবং পবিত্র হওয়ার পর তার জন্য গোসল করে নেওয়া বাধ্যতামূলক হবে।

কিন্তু ইস্তিহাযা হচ্ছে সাধারণ রক্ত। এর কারণে কেউ অপবিত্র হয় না। তাই ইবাদত থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই, আবার গোসলেরও প্রয়োজন নেই বরং ওযুই যথেষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে হায়েয ও ইস্তিহাযার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে না পারলে অনেক ফরয আমলও অযথাই ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হায়েয ও ইস্তিহাযার মাঝে পার্থক্যগুলো হলো-

- **اللَّوْنُ (রং) :** হায়েযের রক্ত কালো। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত লাল।
- **الرِّقَّةُ (ঘনত্ব) :** হায়েযের রক্ত গাঢ়। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত পাতলা।

---

[৮] ফাতওয়ায়ে শামী- ১/৪৮৯-৪৯১; আল বাহরুর রায়েক- ১/৩৫৩-৩৫৫; ফাতহুল কাদীর- ১/১৭৩-১৭৪

◆ الرَّائِحَةُ (গন্ধ) : হায়েযের রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত সাধারণ রক্তের মতো দুর্গন্ধমুক্ত।

◆ التَّجَمُّدُ (জমাটবদ্ধতা) : হায়েযের রক্ত বের হওয়ার পরে জমাটবদ্ধ হয় না। কেননা তা রেহেমে জমাটবদ্ধ থাকে। অতঃপর তা গলে তরল অবস্থায় বের হয়ে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে যায় না। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত জমাটবদ্ধ হয়। কেননা তা সাধারণ রক্তের মতো উপশিরা থেকে নিঃসৃত রক্ত।

৬. রমাদানের সিয়ামরত অবস্থায় হায়েয হয়ে গেলে করণীয়

রমাদানে সিয়ামরত অবস্থায় হায়েয দেখা দিলে রোজা ছেড়ে দেবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রমাদানের সম্মানার্থে ইফতার পর্যন্ত পানাহার পরিত্যাগ করা উত্তম, তবে এটি জরুরি নয়। আবার প্রকাশ্যে পানাহার করাও উচিত নয়। তবে রমাদানের দিনের বেলা যদি কোনো নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ওই দিনের অবশিষ্ট সময় তার জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরি। পরবর্তী সময়ে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রোজার সাথে সেই দিনের রোজারও কাজা করতে হবে।[৯]

ইমাম আন-নববী ﷺ বলেন— "উম্মাহর উলামাগণ সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, যেই মহিলাদের হায়েয ও নিফাস দৃশ্যমান হয় তাদের জন্য রোজা রাখা হারাম এবং তাদের রোজা বৈধ নয়... উলামাগণ সর্বসম্মতভাবে এই বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, সেই নারীদের জন্য রমাদানে ছুটে যাওয়া রোজা কাজা আদায় করে নেওয়া ওয়াজিব। আত-তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, ইবনু জারীর, সাহাবাগণ এবং অন্যান্য বর্ণনাকারীদেরও এবিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে।"[১০]

৭. রমাদানের কাজা সিয়াম

হায়েযের কারণে ছুটে যাওয়া রমাদানের সিয়ামগুলো পরবর্তী রমাদান আসার আগে যেকোনো দিন হায়েয বা নিফাস থেকে পবিত্র থাকাবস্থায় কাজা আদায় করে নিতে হবে। তবে দ্রুত আদায় করাই উত্তম। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

---

[৯] হেদায়া- ১/২২৫; কিফায়াহ- ৩/২৮৩; ফাতহুল বারী- ২/২৮২; আহসানুল ফাতাওয়া- ৪/৪২০

[১০] আল মাজমু'- ২/৩৮৬

কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস (রমাদান) পাবে সে যেন এ মাসে রোজা রাখে। তবে তোমাদের কেউ অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দিনগুলোতে (ছুটে যাওয়া রোজার) এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে।[১১]

আম্মাজান আয়েশা ﵂ নিজের ব্যস্ততার কারণে রমাদানের ছুটে যাওয়া সিয়াম শা'বান মাসে রাখতেন। এর দ্বারা বোঝা যায় সুযোগ মতো কাজা রোজা রাখা যায়।

আবু সালামাহ ﵁ হতে বর্ণিত,

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

"আম্মাজান আয়েশা ﵂ কে বলতে শুনেছি, আমার ওপর রমাদানের যে কাজা হয়েছে তা শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না........।"[১২]

এক্ষেত্রে অল্প অল্প করে বা একসাথে সবগুলো, উভয়ভাবেই রোজা কাজা রাখা যাবে।

৮. শাওয়ালের ৬ রোজা রেখে তারপরে রমাদানের কাজা রোজা আদায়

হাদীসের নস[১৩] থাকায় হানাফীদের মত হলো এই যে, আগে শাওয়ালের রোজা রেখে এরপর যেকোন মুহূর্তে রমাদানের কাজা রোজা রাখা যাবে।[১৪]

৯. হায়েযরত অবস্থায় লাইলাতুল ক্বদরের আমল

রমাদানের শেষ দশ রাত ব্যাপক ফজিলতপূর্ণ। এই রাতগুলো আল্লাহর বান্দা-বান্দীগণ আমলে কাটিয়ে দেন লাইলাতুল ক্বদরের তালাশে। এমতাবস্থায় অনেক নারীই হায়েয বা নিফাসগ্রস্থ থাকেন, সেক্ষেত্রে তারা কি সকল প্রকার আমল ছেড়ে দেবে? উত্তর হচ্ছে– অবশ্যই না। সেই নারী অপবিত্র অবস্থায় যেসকল আমল করা যায় সেসব আমল অধিক হারে করবে। লাইলাতুল ক্বদরে বেশি বেশি দুরুদ, জিকির-আযকার, মাসনূন দু'আ, কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ, তাওবাহ-ইস্তিগফার ইত্যাদি আমলসমূহ হায়েয-নিফাসগ্রস্থ নারী করতে পারে।[১৫]

---

[১১] সূরা বাক্বারাহ- ১৮৫

[১২] সহীহ বুখারী- ১৯৫০

[১৩] প্রাগুক্ত।

[১৪] সহীহ বুখারী- ১৯৫০, রদ্দুল মুহতার- ২/২৪৩, বাহরুর রায়েক্ব- ২/৮৬, আল মাওসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ২৮/১০০

[১৫] ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৩৮-৩৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক- ১/১৬৫; হাশিয়াতুত তহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ-৭৭; আদ্দুররুল মুখতার- ১/২৯৩

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللهَ وَيُسَمِّيَانِ

ইবরাহীম নাখায়ী ﵀ থেকে বর্ণিত, "হায়েযরত নারী ও যার উপর গোসল ফরয হয়েছে উভয়ে আল্লাহর জিকির করতে পারবে এবং বিসমিল্লাহও পড়তে পারবে।"[১৬]

১০. হায়েযরত অবস্থায় কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ

হায়েযরত অবস্থায় কুরআনের মুসহাফ স্পর্শ করা যাবে না। তবে ওযু ব্যতীত, হায়েয ও জুনুবী তথা গোসল ফরয অবস্থায় কোনো আলগা কাপড় বা রুমাল দিয়ে ধরা যাবে। এই ব্যতীত গিলাফ মুড়ানো কুরআন স্পর্শ করা যাবেনা যেহেতু সেটা আলগা কাপড় নয়।[১৭]

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

"পবিত্ররা ব্যতীত কেউই এই কুরআন স্পর্শ করবে না।"[১৮]

ইমাম নববী ও ইমাম তাইমিয়া ﵀ বলেন– "পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে মতামত দিয়েছেন হযরত আলী, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সালমান, আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵃ সহ প্রমুখ সাহাবি এবং অন্য সাহাবিদের এর বিপরীত কোনো অভিমত নেই।"[১৯] অনুরূপভাবে এ বিষয়ে রয়েছে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর বিন হাযম বলেন, রাসূল ﷺ আমর বিন হাযম এর কাছে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন– "পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন কেউ স্পর্শ করবে না"।[২০]

---

[১৬] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস- ১৩০৫, সুনানে দারেমী- ৯৮৯

[১৭] আদ্দুররুল মুখতার- ১/৩২০; তাহতাবি- ১৪৩-১৪৪; আলমুহীতুল বুরহানী- ১/৪০২; রদ্দুল মুহতার- ১/২৯৩; আলবাহরুর রায়েক- ১/২০১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৩৯

[১৮] সূরা ওয়াকিয়াহ- ৭৯

[১৯] শরহুল মুহাজ্জাব- ২/৮০; মাজমুউল ফাতাওয়া- ২১/২৬৬

[২০] মুয়াত্তা মালিক- ৬৮০; কানযুল উম্মাল- ২৮৩০; মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার- ২০৯; আল মুজামুল কাবীর- ১৩২১৭; আল মুজামুস সাগীর- ১১৬২; সুনানে দারেমী- ২২৬৬

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يمس القرآن إلا طاهر

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।" [২১]

১১. হায়েযরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের আয়াত লেখা

হায়েযরত অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত ও তার পূর্ণ কোনো আয়াত লেখা কোনোটিই জায়েয নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

ঋতুবর্তী মহিলা এবং গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি কুরআন পড়বে না। [২২]

عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان

ইবরাহীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– "হায়েয এবং গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করতে পারবে, এবং তাঁর নাম নিতে পারবে। [২৩]

তবে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বা 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'উন' তিন কুল, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি ইত্যাদি বা কুরআনের অন্যান্য বাক্যাংশ যা সাধারণত দু'আ হিসেবে পঠিত হয়; কেবল সেই আয়াতগুলোই জিকিরস্বরূপ (আল্লাহর স্মরণে) পড়তে পারবে।

আর একান্ত প্রয়োজনে কুরআনের আয়াত লিখতে হলে আয়াতের লিখিত অংশে হাত না লাগিয়ে লেখা যেতে পারে।[২৪]

১২. হায়েযরত অবস্থায় হজ্জ/উমরা

এমতাবস্থায় নফল কিংবা ফরয কোনো তাওয়াফের বিধান পালন করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে হজ্জ ও উমরাহর অন্যান্য বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে পারবে। যেমন- সাঈ করা, উকূফে আরাফাহ, উকূফে মুযদালিফা, কংকর নিক্ষেপ ইত্যাদি। এসবের জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।[২৫]

---

[২১] মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ৫১২

[২২] সুনানে তিরমিযী- ১৩১; সুনানে দারেমী- ৯৯১; মুসনাদুর রাবী- ১১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১০৯০; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৩৮২৩; আল ইলাল, ইবনে আবী হাতিম- ১/৪৯

[২৩] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১৩০৫; সুনানে দারেমী- ৯৮৯

[২৪] ফাতহুল কাদীর, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া

[২৫] আল ফাতাওয়া আত তাতারখানিয়াহ- ১/৪৮২, মাসআলাহ- ১২৮৮

আম্মাজান আয়েশা ﵂ বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ

বিদায় হজ্জে আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাথে হজ্জের জন্য বের হয়েছিলাম...... মক্কায় আসার পরে আমি হায়েযগ্রস্থ ছিলাম তাই আমি বাইতুল্লাহতে তাওয়াফ করিনি এবং সাফা-মারওয়াতেও সাঈ করিনি। এব্যাপারে আমি নবীজির নিকট অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি আমাকে বললেন–"মাথা উঠাও, চুল আঁচড়াও এবং হজ্জের অন্যান্য বিধান পালন করো (অর্থাৎ ইহরাম বাঁধো)...."

আরেক বর্ণনায় এসেছে নবীজি ﷺ একথা শুনে বললেন-

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

হাজিগণ যে কাজগুলো করে তুমিও তা করতে থাক। শুধু বাইতুল্লাহর তাওয়াফ পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত করবে না।[২৬]

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত হাদীসে "সাফা ও মারওয়াহতেও সাঈ করিনি" এই বাক্যটা কি আদৌ আয়েশা ﵂-এর বর্ণিত বাক্য নাকি পরবর্তীতে কেউ সংযুক্ত করেছেন এনিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে কেননা অন্যান্য অনেক বর্ণনাতে এই বাক্যটুকু নেই। এজন্যই অনেক ফক্বীহগণ এর ওপর ফতোয়া দেননি।[২৭] এই বিষয়ে ফিক্বহে হানাফীর কিছু মাসআলা জেনে রাখা জরুরি যার অধিকাংশই ইখতিলাফবিহীন–

মাসআলা ১: হায়েযগ্রস্থ নারীর জন্য ইহরামের আগে গোসল করা মুস্তাহাব। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো নারী হায়েয বা নিফাস অবস্থায় মীকাতে পৌঁছলে গোসল করবে। এরপর ইহরাম গ্রহণ করবে। অতপর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের যাবতীয় কাজ করবে।[২৮]

মাসআলা ২: হায়েয শেষ হওয়ার পর গোসল করে তাওয়াফ করতে হবে। হায়েযের কারণে তাওয়াফ বিলম্বিত হলে কোনো গোনাহ হবে না। সুতরাং ওষুধ-বড়ি খেয়ে হায়েয বন্ধ রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা বা মনোক্ষুণ্ন হওয়ারও কোনো কারণ নেই। তবে হায়েয বন্ধ হওয়ার আগেই ফেরত ফ্লাইটের তারিখ হয়ে

[২৬] সহীহ বুখারী- ১৫৫৬; সহীহ মুসলিম- ১২১১

[২৭] ফাতহুল বারী- ৩/৫৮৯, হাদীস- ১৫৬৭; আওজাযুল মাসালেক শরহে মুয়াত্তা ইমাম মালেক- ১২/৪২৭, হাদীস- ৯১৬; আত তুক্বসা লিমা ফী মুয়াত্তা, ইবনু আব্দিল বার- ১০৩

[২৮] সুনানে আবু দাউদ- ১/২৪৩; গুনিয়াতুন নাসিক পৃষ্ঠা- ৬৯

গেলে ওষুধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করে তাওয়াফ করা যাবে। যদি শুরু থেকেই ওষুধ-বড়ি খেয়ে পিরিয়ড বন্ধ রেখে কেউ হজ্জের সমস্ত কাজ করেন, তাতেও শরি'আতের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই।[২৯]

মাসআলা ৩: যদি কোনো নারী হায়েয বা নিফাস অবস্থায় থাকার কারণে তাওয়াফে যিয়ারত করতে না পারেন, আর তার দেশে ফেরার সময় হয়ে যায় ও কোনোভাবেই তা বাতিল বা বিলম্ব করা সম্ভব না হয় তবে এই অপারগতার কারণে সে হায়েয অবস্থাতেই তাওয়াফ করে নেবে। আর এজন্য দম হিসেবে একটি উট বা গরু জবাই করবে। সেই সাথে আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে ইস্তিগফারও করবে।

মোটকথা, কোনো অবস্থাতেই তাওয়াফে যিয়ারত না করে দেশে ফেরা যাবে না। অন্যথায় তাকে আবার ক্বাবায় ফিরে এসে তাওয়াফ করতে হবে। যতদিন সে তাওয়াফ না করবে ততদিন স্বামীর সাথে মিলামেশা করতে পারবে না।[৩০]

মাসআলা ৪: হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষেধ। হজ্জের ফরয তাওয়াফের সময় হায়েযগ্রস্থ হলে ফরয তাওয়াফও করতে পারবে না। যদি কোনো নারী ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগে এমন সময় পবিত্র হয় যখন গোসল করে তাওয়াফ করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে তখনই গোসল করে তাওয়াফ করতে হবে।

অলসতাবশত কিংবা অন্য কোনো কারণে তাওয়াফ না করলে দম দিতে হবে। কিন্তু যদি সূর্যাস্তের পূর্বে গোসল ও তাওয়াফ করার মতো সময় না থাকে, তাহলে দেরি হওয়ার কারণে দম দিতে হবে না।[৩১]

মাসআলা ৫: হায়েয অবস্থায় থাকার কারণে বিদায়ী তাওয়াফ না করতে পারলে সমস্যা নেই। এ কারণে দমও ওয়াজিব হবে না যেহেতু বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব নয়।[৩২]

মাসআলা ৬: হায়েযগ্রস্থ ও জুনুবীর (যার উপর সহবাস বা বীর্যপাতজনিত কারণে গোসল ফরয হয়েছে) জন্য বাইতুল্লাহ শরীফসহ যেকোনো মাসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

إِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ

কোনো ঋতুবর্তী এবং জুনুব ব্যক্তির জন্য মসজিদে অবস্থান করা আমি বৈধ করিনি।[৩৩]

---

[২৯] ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া- ১৫/৪৯১; ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ১/৪৭২; ফাতহুল কাদীর- ২/৩৩৭; ফতোয়ায়ে রহিমিয়া- ৮/৮৭; কিতাবুল মাসায়েল- ৩/৪০৩

[৩০] রদ্দুল মুহতার- ২/৫১৮-৫১৯; মাআরিফুস সুনান- ৬/৩৫৭-৩৫৮

[৩১] রদ্দুল মুহতার- ২/৫১৯

[৩২] মানাসিক, পৃষ্ঠা- ২৫২

[৩৩] সুনানে আবু দাউদ- ১/৩০, হাদীস- ২৩২; সুনান ইবনু মাজাহ- ৬৪৫; তারীখুল কাবীর, বুখারী- ২,৬/৬৭,১৮৩;

১৩. সুফরাহ ও কুদরাহ-এরর বিধান

'সুফরাহ' বা হলুদ বর্ণের স্রাব হচ্ছে নারীর রেহেম (যোনি) থেকে নির্গত হওয়া পুঁজের মতো তরল পদার্থ। এতে হলুদ বর্ণ অধিক প্রতিভাত হয়। অপরদিকে 'কুদরাহ' হচ্ছে নারীর রেহেম থেকে নির্গত হওয়া মেটে বর্ণের তরল পদার্থ। ঋতুকালীন নারীর রেহেম থেকে সুফরাহ অথবা কুদরাহ যা-ই বের হোক না কেন তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং তার জন্য হায়েযের হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এ জাতীয় পদার্থ ঋতুকালীন ব্যতীত অন্য সময় বের হয়ে আসলে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তখন সেই নারী নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করবে এবং ওযু করে প্রতি ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে। এটাই জমহুর ফুক্বাহাদের মত। তবে ইমাম মালেক ﵀ সর্বাবস্থায় একে হায়েয হিসেবে গণ্য করেছেন। উম্মে আতিয়্যাহ ﵂ বলেন,

كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا

আমরা পবিত্র হওয়ার পর 'সুফরাহ' ও 'কুদরাহ' কে কিছুই গণ্য করতাম না। [৩৪]

অর্থাৎ, হায়েয হিসেবে গণ্য করতেন না। হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ ﵀ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মান সহীহ। ইমাম বুখারী ﵀ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি (পবিত্র হওয়ার পর) বাক্যটি বর্ণনা করেন নি।

এ জাতীয় হাদীসকে মারফু' হাদীস বলা হয়। কারণ, এতে নবী ﷺ–এর সমর্থন বোঝা যায়। উম্মে 'আতিয়্যাহ ﵂–এর কথার অর্থ হচ্ছে পবিত্র অবস্থায় সুফরাহ বা কুদরাহ দেখতে পেলেও তাকে হায়েয গণ্য করা হতো না। কিন্তু হায়েয অবস্থায় বা হায়েযের নির্দিষ্ট সময় যদি সুফরাহ বা কুদরাহ নির্গত হয় তাহলে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে হায়েযের বিধান প্রযোজ্য হবে।

১৪. হায়েযরত অবস্থায় কাপড়, প্যাড, টেম্পন বা ডিভা কাপ ইত্যাদি ব্যবহার

হায়েযের রক্ত নাজাস (অপরিষ্কার) এবং এটি যদি কোনো নারীর পোশাকে লাগে, তবে সেটা ধুয়ে ফেলতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় নারীগণ হায়েয চলাকালীন বিশেষ কাপড় পরে নিতেন। উম্মে সালামাহ ﵂ থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলাম তখন আমার হায়েয দেখা দিলো, আমি তাঁর কাছ থেকে সরে গেলাম এবং হায়েযের সময় আমি যে কাপড় পরিধান করতাম তা পরিধান করে নিলাম..."[৩৫] অর্থাৎ, হায়েয হলে কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করা যাবে, যেহেতু নারীদের

---

[৩৪] সহীহ বুখারী- ৩২৬; উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী- ৩/৪৫৯; সুনানে আবী দাউদ- ৩০৭; সুনান ইবনু মাজাহ- ৬৪৭; সুনান নাসায়ী- ৩৬৮

[৩৫] সহীহ বুখারী- ৩১১

মাঝে এগুলোর ব্যবহার নববী যুগ থেকেই চলে আসছে। কিন্তু যুগের সাথে সাথে স্যানিটারি প্যাডের পাশাপাশি আরও নিত্যনতুন পণ্য বাজারে উপস্থিত রয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের জেনে নেওয়া জরুরি যে টেম্পন বা ডিভা কাপ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে কিনা; যা সাধারণত যোনিপথের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত উপরোক্ত বস্তুগুলো ব্যবহার করা জায়েয এবং এটি অনুমোদিত নয় তা নির্দেশ করার মতো কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এগুলো অনুমোদিত নয় তা বলা ঠিক হবে না। বরং এমন প্রমাণ রয়েছে যা এর জায়েয হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। যেমন রক্তের প্রবাহ পরীক্ষা করতে যোনিপথের ভিতরে তুলো প্রবেশ করানোর অনুমতি হাদীসে রয়েছে।

হামনা বিনতে জাহশ ﵂ থেকে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় হায়েযগ্রস্থ হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর নিকট এসে বললেন, "আমার রক্তের শক্তিশালী ও দীর্ঘ প্রবাহ রয়েছে।" তিনি তাকে বললেন, "তুলো দিয়ে বন্ধ কর..."

১৫. সিয়ামের জন্য ওষুধ সেবনের মাধ্যমে হায়েয আটকে রাখা

হায়েযগ্রস্থ নারীর জন্য উত্তম হলো নিজের স্বাভাবিক অবস্থার ওপর থাকা এবং আল্লাহ ﷻ তার জন্য যেই ফয়সালা করেছেন সেটার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। মূলত এমন কিছু ব্যবহার না করাই উত্তম, যার দ্বারা হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। বরং হায়েয অবস্থায় রোজা ছেড়ে দেওয়া অতঃপর রোজাগুলোর কাজা আদায় করে নেয়াই উত্তম। তবে যদি কেউ ওষুধ সেবনের মাধ্যমে হায়েয বন্ধ করে, তাহলেও তার রোজা হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি রমাদান চলে আসে, আর রক্তপ্রবাহ শুরু হয়ে যাওয়ার পর ওষুধ খেয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে হানাফী মতানুযায়ী হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা কমপক্ষে ৩ দিন হওয়ায় হায়েয শুরুর পর থেকে ৩ দিন পর্যন্ত রোজা রাখতে পারবে না, যেহেতু তার হায়েয শুরু হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ বুঝা গেল, হায়েয শুরু হতেই ওষুধ খেয়ে বন্ধ করে ফেললেও ৩ দিন পর্যন্ত হায়েয জারি আছে বলে ধর্তব্য হবে।[৩৬] এরপর থেকে রোজা রাখা আবশ্যক।

তবে হাম্বলী মাযহাব মতে হায়েযের সর্বনিম্ন কোনো সময়সীমা নেই। তাই এ অবস্থায় ৩ দিন পর্যন্ত রোজা থেকে বিরত থাকতে হয় না।

[৩৬] কিতাবুল ফাতওয়া- ৩/৪০৫; আপকে মাসায়েল- ৩/ ২০৭; খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ১/২৫১; হিদায়াহ- ১৬২; বাহরুর রায়েক- ১,২/১৯১,৪৪৯; রদ্দুল মুহতার- ১/৪৭৬; ফতোয়ায়ে হক্কানি- ৪/১৫৮; জামিউ আহকামিন নিসা- ১/১৯৮; ফাতাওয়া রহীমিয়া- ৮/১৩৬

১৬. হায়েযরত অবস্থায় দৈহিক মিলন

এরূপ করা কাবীরা গুনাহ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন,

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাস করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন করো তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।[৩৭]

হাদীসে এসেছে,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

যে ব্যক্তি ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে কিংবা গণক ঠাকুরের নিকটে যায়, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (কুরআন) অবিশ্বাস করলো।[৩৮]

এখানে যে কুফরের (অবিশ্বাসের) কথা এসেছে তা মূলত বাস্তবে কুফর অর্থে আসেনি। তবে হায়েযগ্রস্থ নারীর সাথে সহবাসের বিষয়টি যে কত ভয়াবহ গুনাহ তা বোঝানোর জন্য নবী ﷺ কুফর শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ একে কুফরে আকবার তথা বড় কুফর না বলে কুফরে আসগর তথা ছোট কুফর বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৯] সুতরাং এই গুনাহ হয়ে গেলে খাস অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে।

◆ **কাফফারা-** হায়েযের শুরুর দিকে সহবাস হলে এক দীনার আর শেষ দিকে হলে অর্ধ দীনার সদকা করার কথা কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে তাওবা-ইস্তিগফারের পাশাপাশি উপরোক্ত নিয়মে সদকা করে কাফফারা আদায় করা

---

[৩৭] সূরা বাকারা- ২২২

[৩৮] জামে তিরমিযী- ১৩৫; সুনান ইবনু মাজাহ- ৬৩৯; সুনান আবী দাউদ- ৩৯০৪, এর সনদ সহীহ।

[৩৯] তুহফাতুল আহওয়াযী'- ১/৪১৯, মাদারেজুস সালেকীন- ১/৩৩৫-৩৩৬

জরুরি। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম ﷺ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন,

الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ

যে নিজের ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলে, সে যেন এক অথবা অর্ধ দীনার সদকা করে। [৪০]

কোনো কোনো আলিম হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো, হাদীসটির বর্ণনাকারীরা সকলেই নির্ভরযোগ্য। সুতরাং দলীল হিসেবে হাদীসটি গ্রহণ করা যাবে। প্রকাশ থাকে যে, দীনার একটি স্বর্ণমুদ্রা। যা বর্তমান হিসেবে ৪.৩৭৪ গ্রাম সমপরিমাণ স্বর্ণ।

১৭. দৈহিক মিলনরত অবস্থায় হায়েয

দৈহিক মিলনরত অবস্থায় হায়েয শুরু হলে ঐ অবস্থাতেই মিলন থেকে বিরত হয়ে যেতে হবে। যদি পুরুষের ইনযাল তথা বীর্য নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর্যায়ে এসে পড়ে অথবা যদি যৌন চাহিদার ওপর সবর করা কঠিন হয় তাহলে ওই অবস্থায় যোনিদ্বারে সহবাস না করে গুহ্যদ্বার ব্যতীত স্ত্রী অন্য কোনো অঙ্গে ঘর্ষণ করে স্বামীর বীর্য নিক্ষেপ করে দিতে পারবে। বিশেষ করে হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত অংশ বাদ দিয়ে অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা স্বামীর যৌনস্পৃহা নিবারণ করা যাবে। যেমন: হাত, স্তন, দেহের বিভিন্ন খাঁজ ইত্যাদি।[৪১] নবী ﷺ—কে আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ﷺ জিজ্ঞাস করলেন (মুয়াজ ইবনু জাবাল ﷺ সহ আরও বেশ কিছু সাহাবি থেকেও একই বর্ণনা রয়েছে),

ما يحل امرأتي وهي حائض؟

হায়েয অবস্থায় আমার স্ত্রীর কোন অংশ আমার জন্য (যৌন চাহিদা নিবারণের ক্ষেত্রে) হালাল?

তিনি ﷺ উত্তরে বলেন,

لك ما فوق الإزار

তুমি তার ইযারের ওপরের অংশ (নাভীর ওপর) উপভোগ করতে পারবে। [৪২]

---

[৪০] সুনান আবু দাউদ- ২৬৪

[৪১] আদ্দুররুল মুখতার- ১/২৯২

[৪২] সুনান দারেমী- ১/২৪১-২৪২; মুসনাদে আহমাদ- ৪/৩৪২; সুনান আবু দাউদ- ২১২,২১৩; জামে তিরমিযী- ১/৮৯, হাদীস- ১৩৩; সুনানুল কুবরা- ১/৩১২, হাদীস- ১৩৯৪; আল মুখতারাহ, জিয়া আল মাক্বদেসী- ৯/৪১, হাদীস- ৩৯০; আবু দাউদের ব্যাখ্যাকার আবু যুর'আহ আল ইরাক্বী এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

নবী ﷺ আরও বলেন,

اصنعوا كل شيء إلا النكاح

(হায়েয-নিফাস অবস্থায় বিবির সাথে) সহবাস ব্যতীত সবই করতে পারো। [৪৩]

এক্ষেত্রে স্ত্রীর নাভীর নিম্নাংশে কাপড় না থাকলেও হাত অথবা অন্য কোনো অঙ্গ দ্বারা স্বামীর যৌন চাহিদা মেটানো যাবে। তবে স্বামী সরাসরি যোনিতে স্পর্শ করবে না।

[৪৩] সহীহ মুসলিম- ৩০২



||২য় দারস||

মেডিকেলঃ হায়েয, নিফাস ইত্যাদি

১. হায়েয

বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করলে হরমোনজনিত পরিবর্তনের কারণে শরীরে অনেক পরিবর্তন আসে। স্তন বড় হওয়া, অবাঞ্ছিত লোম গজানো, কণ্ঠস্বর পরিবর্তন, রক্তস্রাব হওয়া সহ বিভিন্ন পরিবর্তন এসময়ে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি মেয়েরই বয়ঃসন্ধিকালে মাসিক চক্র শুরু হয়। মাসিক সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের স্পষ্ট ধারণা রাখা উচিত; যেন আমরা বুঝতে পারি কোনটি আমাদের শরীরে স্বাভাবিক আর কোন লক্ষণটি অস্বাভাবিক, যাতে বিচলিত না হয়ে আমরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

◈ হায়েয, মাসিক বা ঋতুচক্র কী?

বয়ঃসন্ধিকালে পৌছানোর পর প্রতি মাসে হরমোনের প্রভাবে মেয়েদের যোনিপথ দিয়ে যে রক্তস্রাব হয় তাকে ঋতুস্রাব বা মাসিক বলে।

◈ ঋতুচক্রের তিনটি ধাপ-

◈ **মেন্সট্রুয়াল ফেজ:** ৪-৭ দিন স্থায়ী হয়। এই ফেজে যোনিপথ দিয়ে রক্ত বের হয়। ৪-৭ দিন স্থায়ী এই রক্তপাতের সময় ভেঙ্গে যাওয়া রক্তকনিকা ছাড়াও শ্বেত কনিকা, জরায়ু-মুখের মিউকাস, জরায়ুর নিঃসৃত আবরণী, ব্যাকটেরিয়া, প্লাজমিন, প্রস্টাগ্লানডিন এবং অনিষিক্ত ডিম্বাণু মাসিকের রক্তের সাথে বের হয়ে থাকে। ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন হরমোনের যৌথ ক্রিয়ায় এই পর্বটি ঘটে।

◈ **প্রলিফারেটিভ ফেজ:** ৮-১০ দিন স্থায়ী হয়। শুধু ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে এটি হয়। এই সময় জরায়ু নিষিক্ত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

◈ **সেক্রেটরি ফেজ:** ১১-১৪ দিন স্থায়ী হয়। এই ফেজ সবচেয়ে দীর্ঘ। একে প্রজেস্টেরন বা লুটিয়াল ফেজ-ও বলা হয়। এটিও ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন উভয় হরমোনের যৌথ ক্রিয়ায় হয়ে থাকে। এই সময় নিষিক্ত ডিম্বাণু বৃদ্ধির জন্য জরায়ু সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। ডিম্বাশয়ের কোনো ডিম্বাণু শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত না হলে জরায়ু আবার মেন্সট্রুয়াল ফেজে চলে যায়। এভাবেই পূর্ণ বয়স্ক মেয়েদের ঋতুচক্র চলতে থাকে।

প্রতি মাসে মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত পরিণত ডিম্বাণুর দুইটি পরিণতি হতে পারে-

- মাসিক বা ঋতুস্রাব
- গর্ভধারণ

ডিম্বাণু শুক্রাণুর মাধ্যমে নিষিক্ত না হলে তা জরায়ুর স্তরসহ হায়েযের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। আর নিষিক্ত হয়ে গেলে নারী গর্ভবতী হয়।

২. স্বাভাবিক মাসিক

- মাসিকের রক্তে গন্ধ থাকবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু না।
- অভুলেশনের সময় সাধারণত ব্যথা হয়। জরায়ুর সংকোচন ও প্রসারণের কারণে হায়েযের প্রথম দু-তিন দিন সহনীয় মাত্রায় ব্যথা থাকতে পারে। কোনো কাজই করতে পারছে না এমন ব্যথা যদি না হয়, তাহলে ভাবনার কোনো কারণ নেই। এটা ভালো লক্ষণ।
- বয়ঃসন্ধিকালে মাসিকের শুরুর দিকে অনেকের ক্ষেত্রে ৪-৫ মাস অনিয়মিত থাকে, এটা স্বাভাবিক।
- মেনোপজ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি বয়সে নারীর মাসিক স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া ফলে গর্ভধারণের ক্ষমতা হারানো। আমাদের ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের মাঝে নারীদের মেনোপজ হয়ে থাকে। মেনোপজের ১ বছর আগে থেকে অনিয়মিত মাসিক হতে পারে। এটা স্বাভাবিক তাই বিচলিত হওয়ার কিছু নেই।

৩. অস্বাভাবিক হায়েয বা মাসিক চলাকালীন সমস্যা

মাসিকের সময় সামান্য যন্ত্রণা, প্রিমেনস্ট্রিয়াল সিন্ড্রোম (পিএমএস) অর্থাৎ মাসিকের পূর্ব-লক্ষণ, খিঁচ লাগা এবং শরীরের ব্যথা ব্যতীতও আরো বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন-

মেনোরোজিয়া

মাসিক চলাকালীন সময়ে পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে যদি ভারী রক্তপাত হয় তাহলে সেটাকে মেনোরেজিয়া বলে। ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরনের মতো হরমোন স্তরের ভারসাম্যহীনতার কারণে মেনোরোজিয়া হয়। যোনিতে সংক্রমণ, প্রদাহযুক্ত সার্ভিক্স, হাইপোথাইরয়েডিজম, গর্ভাশয়ে ফাইব্রয়েড ইত্যাদি অবস্থার কারণেও এমনটি হতে পারে।

◈ **আমেনোরিয়া**

একে অনুপস্থিত মাসিকও বলা হয়। বিভিন্ন কারণে একজনের মাসিক বন্ধ থাকতে পারে। প্রাথমিক আমেনোরিয়া হয় যখন ১৬ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরও ঋতুস্রাব না হয়। এটি বয়ঃসন্ধিকাল আগমনে বিলম্ব, প্রজননতন্ত্রের জন্মগত ত্রুটি বা পিটুইটারি গ্রন্থিতে সমস্যার কারণে হতে পারে। সেকেন্ডারি আমেনোরিয়া হাইপারথাইরয়েডিজম, অ্যানোরেক্সিয়া, ডিম্বাশয়ে সংক্রামক রোগ, গর্ভাবস্থা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ অথবা আকস্মিক ওজন লাভ বা কমার কারণে হতে পারে।

◈ **ডেসমেনোরিয়া**

গর্ভাশয় প্রসারিত এবং সংকুচিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিক সহনীয় মাত্রায় ব্যথা অনুভূত হতে পারে। কিন্তু ব্যাথার মাত্রা যদি মাত্রাধিক্য হয় তাহলে তা ডেসমেনোরিয়ার লক্ষণ। এটি পেলভিসে ব্যথা, ফাইব্রয়েড বা এন্ডোমেট্রিওসিস (জরায়ুতে টিস্যুর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি)- এর প্রদাহের কারণে হতে পারে।

এই অস্বাভাবিক লক্ষণগুলো দেখা গেলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়াও মাসিক শুরুর ২-৩ বছর পর, বিশেষত ১৭-৩০ বছরের মধ্যে যদি তা অনিয়মিত হয় এবং সেই সাথে নিম্নের যেকোনো একটি বা সবগুলো লক্ষণ যদি দেখা যায়-

- ওজন বাড়া
- চুল পড়া
- পেটে ব্যথা

তাহলে দ্রুত একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

৪. হায়েযের সময় স্যানিটারি প্যাড, টেম্পন, মেন্সট্রুয়াল/ডিভা কাপ ইত্যাদি ব্যবহার

এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সংক্রমণ এবং ব্যাকটেরিয়া এড়াতে প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর প্যাড পরিবর্তন করতে হবে। টেম্পনের ক্ষেত্রে আট ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তা ব্যবহার করলে ব্যাকটিরিয়া দ্বারা আক্রান্ত অথবা বিষক্রিয়া (টক্সিক শক সিন্ড্রোম) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটি প্রতিরোধের জন্য আট ঘণ্টার বেশি সময় ধরে টেম্পন পরিধান করা অনুত্তম। স্পঞ্জ এবং মেনস্ট্রুয়াল কাপ আপনার প্রবাহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে দিনে এক বা দুবার পরিবর্তন করা যেতে পারে।

◆ **সতর্কতা**- বাচ্চা জন্মের পর অর্থাৎ নিফাস চলাকালীন টেম্পন ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তখন ইনফেকশনের ঝুঁকি বেশি থাকে।

◈ **স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়-**

বাজারে এখন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, বিভিন্ন ধরনের স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড পাওয়া যায়। যে ধরনেরই হোক না কেন তা কোনোভাবেই দীর্ঘক্ষণ পরে থাকা উচিত নয়। পিরিয়ডের প্রথম দু-তিন দিন একটু বেশি রক্তক্ষরণ হয়, তাই দুই ঘণ্টা পরপর প্যাড পরীক্ষা করে দেখা উচিত। যদি প্যাড শুকনো না থাকে অর্থাৎ ওপরের অংশে রক্ত ভেসে আসতে দেখা যায় তাহলে সাথে সাথে তা পরিবর্তন করা উচিত এবং কোনোভাবেই চার থেকে ছয় ঘণ্টার বেশি একটি প্যাড পরে থাকা উচিত নয়। কিন্তু চতুর্থ বা পঞ্চম দিন থেকে রক্তস্রাবের পরিমাণ কিছুটা কমে আসে। এসময় অনেকেই আছেন যারা একটি স্যানিটারি ন্যাপকিন কম ব্লিডিং হয়েছে ভেবে দীর্ঘসময় ধরে ব্যবহার করেন। এতে করে সেই রক্ত দ্রুত শুকিয়ে সেখানে জীবাণুর আক্রমণ হতে পারে যা যোনিপথের সংস্পর্শে এসে চুলকানি, ফোঁড়া, যৌনাঙ্গের নানান রকম অসুখ ও ফাঙ্গাল ইনফেকশন ইত্যাদি সৃষ্টি করে থাকে। অনেক লোভনীয় বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে মেয়েরা চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে স্যানিটারি ন্যাপকিন পরে থাকে। কিন্তু এধরনের প্যাড দীর্ঘসময় শুকনো রাখার জন্য 'সেলুলোজ জেল' নামক উপাদান ব্যবহার করা হয় যা জরায়ুমুখের ক্যান্সারের জন্য দায়ী। তাই এ বিষয়ে নিজ দায়িত্বে সচেতন হতে হবে।

৫. হায়েযের সময় করণীয়

- এ সময়ে মেয়েদের পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার। যেমন: দুধ, ডিম, শাকসবজি ইত্যাদি অধিক পরিমাণে খেতে হবে।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে।
- অনেক মেয়েরাই এসময় সাধারণ টুকরা কাপড় ব্যবহার করে থাকেন, যা খুবই অস্বাস্থ্যকর। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করাই উত্তম।
- ন্যাপকিন ৪-৬ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- মাসিকের সময় তীব্র ব্যথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, অস্বাস্থ্যকরভাবে ন্যাপকিন ব্যবহার করলে ভবিষ্যতে জরায়ুর ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিল রোগের ঝুঁকি বাড়ে। আর এ সময় পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ না করলে দেখা দিতে পারে রক্তস্বল্পতাসহ নানা সমস্যা। তাই নিজ থেকে শুরু করে পরিবারের অন্যান্য নারী সদস্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে।

❖ স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার শেষে সতর্কতা-

স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার শেষে ডিস্পোজাল ব্যাগ ব্যবহার করে অথবা কাগজে মুড়ে পলিথিন ব্যাগে করে নির্দিষ্ট স্থানে লোকচক্ষুর আড়ালে ফেলা, সম্ভব হলে পুঁতে ফেলা বা পুঁড়িয়ে ফেলা উচিত, কারণ-

- মাসিক ও হিজামার রক্ত কালোজাদুর অন্যতম উপকরণ হতে পারে;
- পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থে এবং পথচারীদের যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য;
- নিজের হায়েযের রক্ত কোনো মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়ে যাক এটা রুচিশীল কেউই পছন্দ করবে না;
- শৌচালয়ের কমোড বা লো-প্যানে ফেলা যাবে না। কেননা এতে পয়নিষ্কাশনের রাস্তা আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. মাসিক বন্ধ রাখার ওষুধ সেবন

মাসিকের মাধ্যমে মূলত ডিম্বাণুর সাথে জরায়ুর যেই নরম আস্তরণ ভ্রূণকে ধারণ করে রাখে তা বের হয়ে আসে। প্রোজেস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে এমনটি হয়। কিন্তু পিল খেলে তা প্রোজেস্টেরন হরমোনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে জরায়ুর আস্তরণ পুরু হতে থাকে। কোনো ভ্রূণ না থাকা সত্ত্বেও আস্তরণ ভিতরেই থেকে যাচ্ছে, যা অস্বাভাবিক এবং পরবর্তীতে তা বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এসব পিল জাতীয় ওষুধ সেবনের ফলে বেশ কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে-

- মাসিক অনিয়মিত হওয়া;
- জরায়ুর আস্তরণ ভারী হতে থাকা;
- ব্রেস্ট টেন্ডারনেস বা স্তনে মৃদু প্রদাহ;
- বমি বমি ভাব;
- মন-মেজাজ হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে যাওয়া;
- যাদের মাইগ্রেনের সমস্যা আছে তা আরও বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

আল্লাহ ﷻ যে প্রক্রিয়াকে সহজ ও স্বাভাবিক করেছেন, সেটাকে বাধাগ্রস্ত করে অস্বাভাবিক করে তোলা নিষ্প্রয়োজন।

৭. কখন একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত

- ১৬ বছর বয়সেও মাসিক শুরু না হলে;
- স্তন বিকশিত হয়নি বা স্তন বিকাশের ৩ বছরের মধ্যে মাসিক শুরু হয়নি;
- মাসিক ৯০ দিনের জন্য হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে;

- অনিয়মিত মাসিকচক্র;
- সাত দিন ধরে ভারী রক্তপাত হলে;
- প্রচুর রক্তপাত হয় এবং প্রতি দুই ঘণ্টার মধ্যে একাধিক প্যাড বা টেম্পন ব্যবহার করতে হয় এমন অবস্থা হলে;
- দুই মাসিকের মধ্যকার সময়ে মাঝে মাঝেই রক্তপাত হলে;
- মাসিক চলাকালীন গুরুতর খিচ এবং ব্যথা অনুভূত করলে;
- টেম্পন ব্যবহার করার পরে জ্বর হলে।

৮. মেনোপজ

একজন নারী মেনোপজে পৌঁছে অর্থাৎ, নারীর মাসিক বন্ধ হয় মূলত কিছু হরমোনজনিত পরিবর্তনের কারণে। এই বয়সে কিছু ফিমেল হরমোন কমতে থাকে ফলে তার মাসিক বন্ধ হয় সাথে সাথে কিছু সাধারণ সমস্যা দেখা দেয়। যেমন: আকস্মিকভাবে শরীরের উপরিভাগে গরম অনুভূত হওয়া (hot flush), রাতের বেলায় ঘাম হওয়া (Night Sweats), ঘুম না হওয়া, দুশ্চিন্তা হওয়া, মনমরা ভাব এবং যৌনতায় বা যৌন মিলনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এসব ঘটনা স্বাভাবিক। মেনোপজে পৌঁছলে এই সমস্যাগুলোকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া, অধিক চিন্তিত না হওয়া এবং স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

যেসব ঘরোয়া ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

- প্রতিদিন ব্যায়াম করা;
- ঢিলেঢালা, সুতির আরামদায়ক পোশাক পরিধান করা, অতিরিক্ত গরমে না থাকা;
- ভিটামিন যুক্ত খাবার খাওয়া, প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা;
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, ওজন বেড়ে গেলে ওজন কমানোর বিষয়ে মনোযোগী হওয়া;
- দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত চাপ না নেওয়া।

ত্রিশের পর থেকেই মেয়েদের খাবারে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। মেনোপজের কারণে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়। তাই এ সময় খাবারের ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে। আর মাঝ বয়সে সব ধরনের খাবারও খাওয়া যায় না। তাই নিয়ম করে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সও খেতে হবে।

হট ফ্লাশ বা নাইট সোয়েট, বিষণ্ণতা, ঘুমজনিত সমস্যা যদি বেশি দিন চলতে থাকে তাহলে হরমোন ট্রিটমেন্ট করানো যায়। ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন ফিমেল হরমোনগুলো কম ক্ষরণ বা ক্ষরণ না হওয়ার কারণেই মেনোপজ হয়। এই

হরমোনগুলো প্রতিস্থাপন করা হলেই সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়। তবে এটি যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ এবং খরচ সাপেক্ষ একটি চিকিৎসা প্রক্রিয়া। এটা সবার দরকারও হয় না। মেনোপজের শুরুতেই ঘরোয়া ব্যবস্থাগুলো মেনে চললেই ইন শা আল্লাহ সমস্যা অনেকখানি কমে আসবে। ঋতুস্রাব নারী-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কারণ এটি তার শরীরকে গর্ভধারণ করতে এবং শিশুকে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত করে। তাই মাসিকচক্র কীভাবে নারীত্বের পথযাত্রা শুরু করে সেই বিষয়ে অবগত হওয়া এবং সুরক্ষিত থাকার জন্য কোন কোন কাজ আমাদের করা উচিত সেগুলো সম্পর্কে আমাদের সুন্দর ও স্পষ্ট ধারণা রাখা খুবই গুরত্বপূর্ণ।

৯. নিফাস

সন্তান প্রসবের পর যোনিপথে যে রক্তস্রাব দেখা যায় একে lochia বা নিফাস বলে। এতে রক্ত, রক্ত কোষ, জরায়ুর অভ্যন্তরীণ আস্তরণ, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। নিফাসের এই সময়টা কারো কারো ক্ষেত্রে ৩০ দিনের অধিক হয়ে থাকে। তবে এর কমও হতে পারে। নিফাসের প্রথম ২৪ ঘণ্টা থেকে ৪র্থ দিন পর্যন্ত মায়ের দিকে খুব খেয়াল রাখা জরুরি। আমাদের দেশে পোস্ট-পার্টাম হেমোরেজ বা প্রসব পরবর্তী রক্তপাতের কারণে বছরে প্রায় ২৯% মা মৃত্যুবরণ করে।[১] বাসায় ডেলিভারির সময় দাঈরা সাধারণত এ ব্যাপারগুলো খেয়াল করে না।

লক্ষণীয় বিষয়, বাচ্চা বের হবার পর প্লাসেন্টা (গর্ভফুল) আলাদা হয়, ফলে রক্তনালীগুলো উন্মুক্ত হয়ে রক্তক্ষরণ হয়। সেসময় অক্সিটোসিন হরমোন নিঃসৃত হলে রক্তপাত আস্তে আস্তে কমে যায়। এছাড়া বাচ্চা জন্মের সময় যোনিপথ ছিঁড়ে গেলে, এপিসিওটোমি বা সন্তান বের করে আনতে অনেক সময় যোনিপথের পার্শ্ব কাটা লাগতে পারে। সেখান থেকেও রক্তপাত হতে পারে।

১০. নিফাস চলাকালীন লক্ষণীয়

◆ সন্তান প্রসবের পর বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানোর প্রাকৃতিকভাবে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন বাড়ানো যায়। তাই শিশু জন্ম নেওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত। এতে মায়ের শরীরে অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয় যা রক্তনালী সংকোচন করে রক্তপাত কমায়। সেই সাথে শালদুধ বা ক্লোস্ট্রাম বাচ্চার মস্তিষ্ক গঠন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত জরুরি।

◆ নিফাসের সময় এবডোমিনাল ম্যাসাজ বা তলপেট মালিশ করা যেতে পারে।

[১] http://bangladesh.blogs.wm.edu/maternal-health/postpartum-hemorrhage/

◈ বিশেষত, বাসায় ডেলিভারি হলে এ বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করা উচিত। নিফাসের রক্তের পরিমাণ মাসিকের চেয়ে একটু বেশি হবে। তবে মাত্রাতিরিক্ত হলে অবশ্যই ডাক্তারকে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ঘণ্টায় কয়টি করে প্যাড লাগছে। নিফাসের ক্ষেত্রে প্রতিঘণ্টায় ৪ থেকে ৫ টা প্যাডের অধিক লেগে গেলে তা অস্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

◈ নিফাসের প্রথম ৩ দিন গাঢ় লাল রঙের রক্তপ্রবাহ হয়। ৪র্থ দিন থেকে রঙের গাঢ়তা কিছুটা কমবে আর ১৪ তম দিনে হালকা রঙ ধারন করবে। ১৪ দিন পার হয়েও রঙ গাঢ় রয়ে গেলে ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে হবে। নিফাসের সময়সীমা সর্বোচ্চ ৬ সপ্তাহ। ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত এ লক্ষণগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত।

◈ ৪র্থ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও ১ম দিনের মতো মাত্রারিক্ত গাঢ় লাল রক্তপ্রবাহ দেখলে এবং এর সাথে নিম্নের ৩টি লক্ষণের যেকোনো একটি থাকলেই ডাক্তার দেখাতে হবে-

১। দুর্গন্ধময় ডিসচার্জ

২। তীব্র ব্যথা

৩। জ্বর

এই ৩টি জরায়ুর ইনফেকশনের লক্ষণ। তাই অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে, অবহেলা করা চলবে না।

১১. সাদাস্রাব

লিউকোরিয়া বা সাদাস্রাব হচ্ছে নারীদের একটি বিশেষ সমস্যা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদাস্রাব শারীরবৃত্তীয়, যার কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে স্রাবের রঙ অস্বাভাবিক ও প্রচুর পরিমাণে হলে, এতে রক্তের দাগ ও দুর্গন্ধ থাকলে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে।

সাধারণত, স্বাভাবিক স্রাব পাতলা এবং সামান্য চটচটে হয়। এটা অনেকটা সর্দির মত। সাধারণত যোনিপথে সাদাস্রাবের পরিমাণ ডিম্বস্ফূটন এবং মানসিক চাপের কারণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মাসিকচক্রেও তারতম্য হতে পারে।

আবার বয়ঃসন্ধিকালে রক্ত চলাচল বেড়ে যাওয়ার কারণে এর নিঃসরণ বেশি হতে পারে। এছাড়া, স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কারণে, যৌনমিলনকালে, যৌন আবেগে, গর্ভাবস্থায়, শরীরের রাসায়নিক সমতা বজায় রাখতে এবং যোনির কোষগুলোকে সচল রাখতে ইস্ট্রোজেন (oestrogen) হরমোনের প্রভাবে সাদাস্রাবের নিঃসরণ হতে পারে। মেয়ে শিশুর জন্মের প্রথম ৭-১০ দিনের মধ্যেও সাদাস্রাবে চাপ দিতে পারে। মায়ের

শরীরে যদি অত্যাধিক হরমোন থাকে সেক্ষেত্রেও সাদাস্রাব হতে পারে। ওভুলেশন বা ডিম্বাণু নিঃসরণকালে জন্ম বিরতিকরণ পিল ব্যবহার করলেও এমনটি হয়ে থাকে।

◈ স্বাভাবিক সাদাস্রাব

- মাসিকের আগে, মাসিক চলাকালীন ও মাসিকের শেষে সাদাস্রাব হয়ে থাকে, এটা স্বাভাবিক;
- সাদাস্রাব জেলীর মতো থকথকে তরল হয়ে থাকে, কিন্তু থকথকে দইয়ের মতো না। এর কোনো বাজে গন্ধ নেই এবং তা বর্ণহীন;
- সাদাস্রাবের সাথে চুলকানি থাকবে না;
- সাদাস্রাবের সাথে দুর্বলতার কোনো সম্পর্ক নেই।

◈ অস্বাভাবিক সাদাস্রাব

- মাসিক ছাড়া অন্য সময় চুলাকানি;
- স্রাব সবুজাভ বা হলুদাভ রঙের হলে;
- মাছের মতো আঁশটে দুর্গন্ধ;
- দইয়ের মতো থকথকে হলে তা অস্বাভাবিক।

পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম ও পুষ্টির অভাবের কারণে সাদাস্রাবের সমস্যা হতে পারে। তাই বিশ্রাম নেওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, সবুজ সবজি ও ফলমূল খেতে হবে।

সাদাস্রাব পরিচ্ছন্নতার সাথে সম্পৃক্ত। তাই যোনিপথ পরিষ্কার রাখা বাঞ্ছনীয়। তাই পিরিয়ডের কাপড়, পায়জামা, অন্তর্বাস নিয়মিত জীবাণুনাশক পদার্থ (যেমন:- ডেটল, স্যাভলন ইত্যাদি) দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত।

১২. লোমকর্তন

বগলের ও গোপনাঙ্গের অবাঞ্ছিত লোমকর্তনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরি–

- দেহের অবাঞ্ছিত লোমকর্তনের ক্ষেত্রে ক্যামিকেল জাতীয় দ্রব্য পরিহার করা উচিত;
- রেজার ব্যবহার করলে তা ব্যবহারের পূর্বে জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে;
- হেয়ার রিমুভাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরপর অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ত্বকের কালচে ও শুষ্ক ভাব দূর করতে সহায়ক



||৩য় দারস||

মুত্বাহ্হিরাহ-২

১. নিফাস

সন্তান প্রসবের পর স্ত্রীলোকের জরায়ু থেকে যে রক্ত বের হয় তাকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় 'নিফাস' বলা হয়।[১]

২. নিফাস গণনা এবং নিফাস অবস্থায় ইবাদত

নিফাসের সময়কাল বা মেয়াদ হলো, সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন। আর সর্বনিম্ন কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই অর্থাৎ চল্লিশদিনের পূর্বে যখনই রক্ত অদৃশ্য হবে তখনই নিফাস শেষ বলে গণ্য হবে। সন্তান প্রসবের পর যদি কোনো স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব না হয় তবুও তার জন্য গোসল করা ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রসব হবার সাথে সাথেই গোসল আবশ্যক হয় না। বরং নিফাসের রক্ত বন্ধ হবার পর গোসল করা আবশ্যক হয়। তবে এমনি গোসল করে পরিষ্কার হতে চাইলে সেটি ভিন্ন বিষয়।

চল্লিশ দিনের বেশি রক্তস্রাব হলে প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিন নিফাসের সময় গণ্য হবে এবং বাকিদিনগুলো ইস্তিহাযা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি দ্বিতীয়, তৃতীয়... সন্তান হয় এবং নিফাসের সময়কালের নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে সেক্ষেত্রে তার অভ্যাসের দিনগুলো নিফাসের দিন হিসেবে ধরা হবে। বাকি দিনগুলো ইস্তিহাযা হিসেবে পরিগণিত হবে। [২]

* ঋতুস্রাবের সময় নারীদের যে সকল বিধি-নিষেধ পালন করতে হয় নিফাসের সময়েও অনুরূপ করতে হবে।[৩]

[১] হিদায়াহ- ১/৬৯

[২] ফতওয়ায়ে আলমগীরী- ১/৩৭; রদ্দুল মুহতার- ১/৪৯৬-৪৯৮

[৩] বাহরুর রায়িক- ২/১৭৪; রদ্দুল মুহতার- ১/৪৯৬-৪৯৮

হযরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূল ﷺ নিফাসগ্রস্থ নারীদের জন্য নিফাসের মেয়াদ সাব্যস্ত করেছেন চল্লিশ দিন। তবে যদি কেউ এর আগে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা।"[৪]

উসমান ইবনে আবুল 'আস ﷺ বলেন, "নিফাসগ্রস্থ নারীদের সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন। তবে যদি এর আগেই কেউ পবিত্র হয়ে যায়, (তাহলে পবিত্রতার বিধান শুরু হয়ে যাবে) অন্যথায় চল্লিশ দিন পর নামায শুরু করতে বিলম্ব করা যাবে না।"[৫]

৩. প্রসবের পূর্বে পানি নির্গত হওয়া

গর্ভবতী অবস্থায় সন্তান প্রসব হওয়ার পূর্বমুহূর্তে অনেকেরই ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় যোনিপথ থেকে পানি বের হয় ফলে শরীর ও কাপড় নাপাক হয়ে যায়। এতে সেই নারীর ওপর গোসল ফরয হবে না, তবে ওযু করে নিতে হবে এবং নির্গত পানি থেকে শরীর ও কাপড় পবিত্র করে নামায পড়তে হবে। কেননা সেগুলো নাপাক।[৬]

৪. সিজারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব

সন্তান স্বাভাবিক নিয়মে ভূমিষ্ঠ হোক বা সিজারের মাধ্যমেই হোক, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নারীর যে রক্তস্রাব আসে তা নিফাস বলেই গণ্য হবে, হায়েয বা ইস্তিহাযা হিসেবে নয়। তাই চল্লিশ দিনের ভিতরে স্রাব বন্ধ না হলে এই সময়ে সহবাস হারাম এবং তার নামায বন্ধ থাকবে। আর চল্লিশ দিনের ভিতরে যেদিন-ই স্রাব বন্ধ হবে সেদিন থেকে গোসল করার পর সবকিছু বৈধ হবে।

তবে সিজারের মাধ্যমে শিশু ভুমিষ্ট হওয়ার পর যদি নারীর জরায়ু থেকে কোনো রক্তস্রাব না আসে এবং নিফাসের কোনো আলামত পাওয়া না যায় বরং পেট/নাভী/গুহ্যদ্বার থেকে রক্ত বের হয় তবে তা হায়েয/নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু সেই রক্ত ঝরা বন্ধ হলে গোসল করা মুস্তাহাব।[৭]

৫. গর্ভপাতের পর রক্তস্রাব

কারো যদি অসময়ে গর্ভপাত হয় যাতে একটি গোশতের টুকরা বের হয়েছে, কোনো অঙ্গ প্রকাশ পায়নি এক্ষেত্রে গর্ভপাত পরবর্তী রক্ত নিফাস নয়; বরং এই স্রাব শুরু

[৪] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস- ৬৪৯; আলমুজামুল আওসাত, হাদীস- ৮৩১১; সুনানে দারাকুতনী, হাদীস- ৮৫২; সুনানে কুবরা, হাদীস- ১৬১৯

[৫] মুসনাদে দারেমী- ৫/১৮৫ (১০৩৭), এই রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।

[৬] আদ্দুররুল মুখতার- ১/১৫৯; ইমদাদুল ফাতাওয়া- ১/১০৭

[৭] বাহরুর রায়েক- ১/৩৪৫; আল বিনায়াহ- ১/৬৪৩; আল ফাতাওয়া আল উলুলজিয়া- ১/৫৭; আল ফাতাওয়া আস সিরাজিয়াহ- ৪৯

হওয়ার আগে ১৫ দিন পবিত্র অবস্থায় কাটলে তা হায়েযের রক্ত হিসেবে গণ্য হবে। তবে যদি স্রাব তিনদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত না হয় তাহলে তা ইস্তিহাযার রক্ত হিসাবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় হায়েয মনে করে ছেড়ে দেওয়া নামাযগুলো কাজা করে নিতে হবে।[৮]

৬. গর্ভ নষ্ট হওয়ার কারণে ডিএনসি করার পরে রক্তস্রাব

গর্ভ নষ্ট হওয়ার কারণে যখন ডিএনসি করা হয় এরপর অনেকেরই রক্তস্রাব দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সেটা কি ইস্তিহাযা নাকি নিফাস এবং এরজন্য সালাত থেকে দূরে থাকতে হবে কিনা? কারও যদি প্রতিমাসে ৮ দিন হায়েযের কারণে অপবিত্র থাকার অভ্যাস থাকে কিন্তু ডিএনসি করার পর থেকে ৮ দিনের অধিক স্রাব চলতে থাকে সেক্ষেত্রে ডিএনসির পর ৮ দিন পর্যন্ত হায়েয ধর্তব্য হবে। এরপর থেকে ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে। তাই প্রথম ৮ দিনের পর থেকে স্রাব থাকলেও নিয়মিত নামায পড়তে হবে। প্রকাশ থাকে যে, নষ্ট ভ্রূণে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না হলে ডিএনসি পরবর্তী স্রাব হায়েয হিসেবে ধর্তব্য হবে। যদি নষ্ট ভ্রূণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে তাহলে এ স্রাব নিফাস হিসেবে গণ্য হবে।[৯]

৭. হায়েয, নিফাস, জুনুব থেকে পবিত্রতা অর্জন

প্রথমেই হায়েয, নিফাসের রক্ত বা দৈহিক মিলনজনিত নাপাকি ধুয়ে নিতে হবে। এরপর ফরয গোসলের নিয়মানুযায়ী গোসল করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

হায়েয দেখা দিলে নামায ছেড়ে দাও। আর হায়েযের সময় শেষ হয়ে গেলে (গোসলের মাধ্যমে) রক্ত ধুয়ে নাও এবং নামায আদায় কর। [১০]

৮. ফরয গোসলের সঠিক নিয়ম

- ফরয গোসলের জন্য প্রথমত মনে মনে নিয়ত করতে হবে।
- এরপর প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধুয়ে নিতে হবে।

---

[৮] আলবাহরুর রায়েক- ১/২১৯; বাদায়েউস সানায়ে- ১/১৬১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৩৭; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া- ১/৩৯৪; রদ্দুল মুহতার- ১/৩০২; ইমদাদুল ফাতাওয়া- ১/৪৫; নাফউল মুফতী ওয়াস সায়িল ফী জামিয়িল মুতাফাররিক্বাতিল মাসায়িল (ফতোয়ায়ে লাখনৌভী)- ৪১৮; কুনইয়াতুল মুনইয়াহ- ১১৬

[৯] নাফউল মুফতী ওয়াস সায়িল ফী জামিয়িল মুতাফাররিক্বাতিল মাসায়িল (ফতোয়ায়ে লাখনৌভী)- ৪১৮; কুনইয়াতুল মুনইয়াহ- ১১৬; আলমুহীতুল বুরহানী- ১/৪৭০; আলবাহরুর রায়েক- ১/২১৯; ফাতহুল কাদীর- ১/১৬৫-১৬৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া- ১/৫৪২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৩৭; আদ্দুররুল মুখতার- ১/৩০২

[১০] সহীহ বুখারী- ৩৩১

- ডানহাতে পানি নিয়ে বামহাত দিয়ে লজ্জাস্থান এবং তার আশপাশ ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। শরীরের অন্য কোনো স্থানে নাপাকি লেগে থাকলে সেটাও ধুয়ে নিতে হবে।
- এবার বাম হাতকে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।
- তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযু শুরু করতে হবে, অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে পানি নিয়ে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া, তিনবার কুলি করা, তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া, কপালের শুরু হতে দুই কানের লতি ও থুঁতনির নিচ পর্যন্ত ধোয়া, প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়া, আঙুলে আংটি থাকলে বা কানে-নাকে গহনা থাকলে তা নেড়ে-চেড়ে উক্ত স্থান ভিজিয়ে নেওয়া, অজু-গোসল করার সময় নাক-কানের অলংকারের ছিদ্রে পানি পৌঁছানো জরুরি।[১১] অতঃপর সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। কেবল দুই পা ধোয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অতঃপর প্রথমে মাথায় তিনবার (৩ অঞ্জলি) পানি ঢেলে ভালোভাবে খিলাল করে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। এবার সমস্ত শরীর ধোয়ার জন্য প্রথমে ৩ বার ডানে তারপরে ৩ বার বামে পানি ঢেলে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, যেন শরীরের কোনো অংশ বা কোনো লোমও শুকনো না থাকে। গোসল এমনভাবে করতে হবে যাতে বগল, দেহের খাঁজ, নাভী ও কানের ছিদ্র পর্যন্ত পানি দ্বারা ভিজে যায়। অতঃপর আবার সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে।
- সবার শেষে একটু অন্য জায়গায় সরে এসে দুই পা ৩ বার ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে-

- নারীদের মাথা ভালোভাবে ভিজঁতে হবে। গোসলের সময় মেয়েদের মাথার খোপা খোলা জরুরি নয়। কেবল চুলের গোড়ায় তিনবার তিন চুল্লু পানি পৌঁছাতে হবে।
- এই নিয়মে গোসলের পর নতুন করে আর ওযুর দরকার নেই, যদি ওযু না ভাঙে। ওযুসমেত ফরয গোসল করার পর কোনো ইবাদত না করে ওযু না ভাঙা সত্ত্বেও পুনরায় ওযু করা মাকরূহ। কেননা হযরত আয়েশা ﵂ বলেন, "নবী মুহাম্মাদ ﷺ ফরয গোসলের পর আর ওযু করতেন না।"[১২]
- রাসূল ﷺ এক মুদ্দ (৬২৫ গ্রাম) পানি দিয়ে ওযু এবং অনধিক পাঁচ মুদ্দ (৩১২৫ গ্রাম) বা প্রায় সোয়া তিন লিটার পানি দিয়ে গোসল করতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বস্তু অপচয় করা ঠিক নয়।

---

[১১] আল মুহীতুল বুরহানী- ১/৮০

[১২] তিরমিযী- ১০৩, মিশকাত- ৪০৯

■ নারী হোক কিংবা পুরুষ, সকলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দার মধ্যে গোসল করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

■ উল্লেখ্য যে, আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন– আসমা ؓ একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ–এর কাছে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা পানি ও বরই পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে রগড়ে নেবে যাতে করে সমস্ত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর গায়ে পানি ঢালবে। এরপর একটি সুগন্ধিযুক্ত কাপড় নিয়ে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে।"

আসমা ؓ বললেন, –"তা দিয়ে কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে?" তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে।" অতঃপর আয়েশা ؓ তাঁকে চুপিচুপি বলে দিলেন, "রক্ত বের হবার জায়গায় তা ঝুলিয়ে দেবে"। অতঃপর জানাবাতের (সহবাসজনিত অপবিত্রতা) গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞাস করা হয়। এতে তিনি বললেন, "পানি দ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালো করে রগড়ে নেবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর গায়ে পানি ঢেলে দেবে।" তখন আয়েশা ؓ বলেন–"আনসারদের মহিলারা কতই না উত্তম! দ্বীনি জ্ঞানে প্রজ্ঞা অর্জনে লজ্জাবোধ তাদের জন্য বাধা হয় না।"[১৩]

■ নাপাক কাপড় পরিধান অবস্থাতেই গোসল করার ক্ষেত্রে যদি যথেষ্ট পরিমাণ পানি কাপড়ের ওপর ঢেলে কাপড় এমনভাবে কঁচলে ধুয়ে নেওয়া হয়, যার ফলে কাপড় থেকে নাপাকি দূর হয়ে গিয়েছে এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা করা যায় তাহলে এর দ্বারা কাপড়টি পাক হয়ে যাবে। আর দৃশ্যমান কোনো নাপাকি থাকলে কঁচলে ধুয়ে ওই নাপাকি দূর করে নিতে হবে। উল্লেখ্য, শরীর বা কাপড়ের কোনো অংশে নাপাকি লেগে থাকলে তা গোসলের আগেই পৃথকভাবে ধুয়ে পবিত্র করে নেওয়া উচিত।[১৪]

৯. হায়েয-নিফাসরত অবস্থায় দৈনন্দিন কাজ

হায়েয-নিফাস নিয়ে মানুষের মাঝে নানামুখী ধারণা রয়েছে। গ্রামগঞ্জে এমনকি শহরেও অনেকের এমন ধারণা রয়েছে যে হায়েযগ্রস্থ নারীর জন্য রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ ঠিক নয়, হায়েযরত অবস্থায় আচার বানালে বা স্পর্শ করলে আচার নষ্ট হয়ে যায়–এমনই আরও নানা রকমের উদ্ভট চিন্তাধারা। এসব ভিত্তিহীন। হায়েযগ্রস্থ নারী উল্লিখিত সকল কাজই করতে পারবে এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে

[১৩] সহীহ মুসলিম- ৩৩২

[১৪] আদ্দুররুল মুখতার- ১/৩৩৩; শরহুল মুনইয়া- ১৮৩; আলবাহরুর রায়েক- ১/২৩৮; আননাহরুল ফায়েক- ১/১৫০

এক্ষেত্রে ওযু করে এসব কাজ করা সর্বোত্তম।[১৫] এ বিষয়ে সমাজে যা কিছু প্রচলিত রয়েছে সেগুলো কু-সংস্কার এবং হিন্দুদের কুপ্রথা বৈ কিছুই নয়। এছাড়া ইহুদিরাও মহিলাদের হায়েযগ্রস্থ অবস্থায় তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না এবং এক সাথে ঘুমাতও না। যেমনটি আনাস ﷺ-এর একটি হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১৬]

এই অবস্থায় নবী ﷺ এর পত্নীগণ ও অন্যান্য মহিলা সাহাবীগণ উপরোক্ত সকল কাজই করতেন, এতে কোনো বাঁধাও দেওয়া হয়নি। ইমাম বুখারী ﷺ তাঁর সহীহ বুখারীতে হায়েয অধ্যায়ে ২৯৫ নং হাদীস থেকে ধারাবাহিকভাবে বহু হাদীস এসকল কু-সংস্কারের অপনোদনের জন্য নিয়ে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হায়েযগ্রস্থ নারীর ব্যাপারে বলেন,

إن حيضتك ليست في يدك

তোমার হায়েয তো তোমার হাতে (লেগে) নেই।[১৭]

আম্মাজান আয়েশা ﷺ বলেন,

كنت أرجل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض

আমি হায়েযগ্রস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাথা চিরুনী দিয়ে আঁচড়াতাম![১৮]

হায়েয অবস্থায় নবীজি ﷺ তার স্ত্রীদের সহিত একসাথে খেতেন ও পান করতেন। তাঁদের ঝুটাও খেতেন ও পান করতেন। এমনকি খাদ্যের যে স্থানে হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীর মুখ লেগেছে নবীজি ﷺ সেখানেই তাঁর মুবারক মুখ লাগাতেন। এবং তিনি তাঁর হায়েযগ্রস্থ স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় ঘুমাতেন।[১৯]

১০. ইস্তিহাযা এবং তার হুকুম

হায়েয ও নিফাসের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে নারীর জরায়ু থেকে যেই রক্ত লাগাতার বের হতে থাকে তাকে ইস্তিহাযা বলে। ইস্তিহাযাকালীন নামায-রোজা সবকিছুই করতে পারবে।

---

[১৫] রাদ্দুল মুহতার- ১/৪৮৬; হাশিয়ায়ে ত্বহত্বাবী আলা মারাক্বিল ফালাহ- ১১৬, ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া- ১/২২২

[১৬] সুনানে নাসায়ী- ১/১৫২,১৮৭; হাদীসটির মান সহীহ।

[১৭] সহীহ মুসলিম- ১১ থেকে ১৩; আবু দাউদ- ২৬২; তিরমিযী- ১৩৪; নাসায়ী- ৩৮১ থেকে ৩৮২

[১৮] সহীহ বুখারী- ২৯৫, ২০২৯, ৫৮৮১; সহীহ মুসলিম- ৬৭১; আবু দাউদ- ২৪৬৮; তিরমিযী- ৮০৪; সুনানে নাসায়ী- ৩৮৭; ইবনে মাজাহ- ১৭৭৫; মুয়াত্ত্বা মালেক- ৬০; মুয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ- ৫৩

[১৯] সহীহ বুখারী- ২৯৮, ৩২২, ৩২৩, ১৯২৯; সহীহ মুসলিম- ৫, ২৯৬, ৩০০; নাসায়ী- ৩৬৯; নাসায়ী- ২৭৯, ২৮৩, ৩৭৭; সুনানুল কুবরা- ১/৩১১, হাদীস- ১৩৯০; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ- ১/৫৮ হাদীস- ১১০; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৪/১০৮, ১৯৪, হাদীস- ১২৯৩, ১৩৬০

এবং এই সময়ে সহবাসেও কোনো বাধা নেই।[২০] এক্ষেত্রে মুস্তাহাযা নারী সালাত আদায়ের আগে প্রতি ওয়াক্তের জন্য পুনরায় ওযু করে নেবে।[২১]

১১. ঘন ঘন সাদাস্রাব নির্গত হওয়া

যদি কারো ক্ষেত্রে সাদাস্রাব লাগাতার নির্গত হতে থাকে; এবং এতটুকু সময় পাওয়া না যায় যার মাঝে ফরয নামাযটুকু আদায় করে নেওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে শরঈ পরিভাষায় তাকে মুস্তাহাযা মহিলার হুকুমে ধরা হবে। অর্থাৎ, তাকে মা'যূর বা অক্ষম বলে গণ্য করা হবে। মুস্তাহাযা বা মা'যূর ব্যাক্তির মত প্রতি ওয়াক্তে সে ওযু করবে এবং ওযুর পূর্বে স্রাব ধুয়ে নেবে। এ ওযু দিয়ে ফরয বা নফল যত রাকাত নামায পড়তে চায় পড়ে নিতে পারবে, কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে। এ সময় স্রাব নির্গত হতে থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু পরবর্তী নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলেই পূর্বের ওযুটি ভঙ্গ হবে এবং পুনরায় নতুন করে ওযু করে নামায পড়তে হবে। তবে সাদাস্রাব লাগাতার না হলে সে মা'যূর না। তাই সেক্ষেত্রে ওযু করে নামায পড়ে নেবে। এবং এমতাবস্থায় নামায পড়ার সময় স্রাব বের হলে পুনরায় অজু করে নামায পড়ে নেবে। (টীকা ২০ ও ২১ দ্রষ্টব্য)

যেসব নারী এরকম রোগে আক্রান্ত, ওযু যাতে নষ্ট না হয় তাই তারা যদি টিস্যু বা তুলা স্রাব আসার রাস্তায় এমনভাবে রাখে, যাতে স্রাব বাইরে আসতে না পারে, তাহলে এমতাবস্থায় সব ইবাদত আদায় করতে পারবে। এটিই রোগীর জন্য উত্তম পন্থা। তবে তুলা বা টিস্যু পেপারের বহিরাংশ যদি ভিজে যায় তাহলে অজু নষ্ট হয়ে যাবে।[২২]

১২. নারীদের স্বপ্নদোষ

অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে যে, নারীদের স্বপ্নদোষ হয় কিনা। উত্তর হচ্ছে, জি নারীদেরও স্বপ্নদোষ হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা ﵂ বলেন, আবু তালহা ﵁–এর স্ত্রী উম্মে সুলাইম ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর নিকট এসে আরজ করলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ "تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ ﷻ হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের

---

[২০] আল মাবসূত- ৩/২০৪; শরহে বিকায়া- ১/১১৩

[২১] ফতহুল ক্বদীর- ১/১৭৯

[২২] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া- ১/১০

যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন কি তার উপর গোসল করা জরুরি?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- "হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে।" (এ কথা শুনে) উম্মু সালামা ؓ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারীদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়?" তিনি বললেন, "তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক! তাহলে তার সন্তান কেমন করে তার সদৃশ হয়?" [২৩]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন যে,

مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ

সাধারণত পুরুষের বীর্য হয় গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য হয় পাতলা ও হলদে [২৪]

এ হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়-

- ছেলেদের মতো মেয়েদেরও স্বপ্নদোষ হয়;
- স্বপ্নদোষ হলে ছেলে-মেয়ে উভয়ের ওপর গোসল করা ফরয হয়;
- ছেলেদের বীর্য গাঢ় ও সাদা হয় আর মেয়েদের বীর্য পাতলা ও হলদে হয়।

১৩. স্বপ্ন দেখার পরও কোনো পানি দৃশ্যমান না হওয়া

যদি কেউ স্বপ্ন দেখে এবং এর ফলে অন্তরে খায়েশও জাগে কিন্তু কোনো পানি দৃশ্যমান না হয় তাহলে এক্ষেত্রে গোসল ফরয হবে না। তবে পানি দেখলে বা কাপড়ে দাগ দৃশ্যমান হলে গোসল ফরয হবে, স্বপ্নের কথা মনে থাকুক বা না থাকুক।

আম্মাজান আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠার পর ভেঁজা অনুভব করে, কিন্তু তার স্বপ্নের কথা স্মরণ নেই তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন– হ্যাঁ, তাকে গোসল করতে হবে। আর ওই ব্যক্তি, যার স্বপ্নের কথা স্মরণ আছে কিন্তু সে কাপড়ে বা শরীরে কোনো ভেঁজা পায়নি, তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন– না, তার জন্য গোসল করা জরুরি নয়।"[২৫]

১৪. অবাঞ্ছিত লোম

মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে চুল বা পশম গঁজায়। কিছু চুল বা পশম প্রয়োজনীয় এবং মানব সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যেমন- মাথার চুল, ভ্রু, চোখের পাঁপড়ি, পুরুষদের দাড়ি

[২৩] সহীহ বুখারী- ১/৪২; সহীহ মুসলিম- ৫৯৯

[২৪] সহীহ মুসলিম- ৩১১

[২৫] জামে তিরমিযী- ১১৩; সুনানে আবু দাউদ- ২৪০

ইত্যাদি। অপরদিকে দেহের কিছু পশম রয়েছে যা অবাঞ্ছিত। সেসব অবাঞ্ছিত লোম ৪০ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও পরিষ্কার না করা মাকরুহ তাহরীমী।[২৬]

সাহাবি আনাস ﵁ বলেন,

وُقِتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً

গোঁফ ছোট রাখা, নখ কাঁটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভীর নিচের লোম চেঁছে ফেলার জন্যে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যেন, আমরা চল্লিশ দিনের অধিক সময় বিলম্ব না করি।[২৭]

◆ **যে সকল স্থানের লোম কর্তন করতে হয়-** গোপনাঙ্গের লোম, বগলের লোম কর্তন করতে হয়। নারীদের ক্ষেত্রে মুখে যদি গোঁফ, দাড়ি বা ঠোঁটের নিচে নিম দাড়ি গজায় তা উপড়িয়ে ফেলা মালেকী মাযহাবে ওয়াজিব। আর হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে এসব উপরে ফেলা মুস্তাহাব (উৎসাহিত),[২৮] যেহেতু নারীদের মুখের গোঁফ-দাড়ি পুরুষদের সাদৃশ্যতা বহন করে।

ইমাম নববী ﵀ বলেন—"কোনো নারীর যদি দাড়ি বা গোঁফ গজায় তাহলে সেক্ষেত্রে ওইগুলো তুলে ফেলা হারাম নয়। বরং আমাদের দৃষ্টিতে সেটা মুস্তাহাব।"

মেয়েদের হাত পায়ের লোম উপড়ে ফেলা হানাফী-হাম্বলী মাযহাবে জায়েয। মালেকী মাযহাব মতে তা ওয়াজিব।[২৯] তবে ভ্রু চেঁছে চিকন করা নারীদের জন্য জায়েয নেই। পরবর্তীতে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইন শা আল্লাহ।

◆ **নাভীর নিচের অবাঞ্ছিত লোমের সীমানা-** পায়ের পাতার ওপর ভর করে বসা অবস্থায় নাভী থেকে চার-পাঁচ আঙুল পরিমাণ নিচে যে ভাঁজ বা রেখা দেখা যায় সেখান থেকেই অবাঞ্ছিত লোমের সীমানা শুরু। ওই ভাঁজ থেকে দুই উরুর সংযোগস্থল পর্যন্ত ডান-বামের লোম, গোপনাঙ্গের চারপাশের লোম, মলদ্বার পর্যন্ত উদ্গত হওয়া লোম এবং প্রয়োজনে মলদ্বারের আশপাশের লোম অবাঞ্ছিত লোমের অন্তর্ভুক্ত।

---

[২৬] সহীহ মুসলিম- ১/১২৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ৫/৩৫৭, ফাতাওয়া হক্কানিয়া- ২/৪৬৫, ফাতাওয়ায়ে মাদানিয়া- ৩/৪৮১

[২৭] মুসলিম- ২৫৮

[২৮] হাশিয়ায়ে আ'দাউই আলা শারহির রিসালাহ- ২/৪০৯; ইবনে আবেদীন- ৫/২৩৯; আল মাজমূ- ১/২৯০,৩৭৮; আদাবুশ শারই'য়াহ- ৩/৩৫৫; আল মুগনী- ১/৯৪; কাশশাফুল ক্বিনা'- ১/৮২; রওদুল মুরবি'- ১/১৬৫; মাওসূয়াহ ফিকহিয়্যাহ- ১৮/১০০

[২৯] হাশিয়ায়ে আ'দাউই আলা শারহির রিসালাহ- ২/৪০৯; আস ছামারুদ দানী- ৫০০; মাওসূয়াহ ফিকহিয়্যাহ- ১৮/১০০

১৫. লোম পরিষ্কার করার ইসলাম সম্মত উপায়

আসল উদ্দেশ্য যেহেতু লোম পরিষ্কার করা তাই যেসব উপায় গ্রহণের মাধ্যমে লোম পরিষ্কার হবে, সেই সকল উপায়ই গ্রহণ করা জায়েয আছে। সুতরাং রেজার, ব্লেড, ক্ষুর, কাঁচি, ক্রীম, পাউডার সবই ব্যবহার করা জায়েয। অবশ্য পুরুষের জন্য এক্ষেত্রে ব্লেড বা ক্ষুর ব্যবহার করাই উত্তম।[৩০]

উল্লেখ্য, নারীদের ক্ষেত্রে বগল বা যৌনাঙ্গের চারপাশের লোম কর্তনের সময় মাথায় রাখা উচিত যে, নারীদের চামড়া এমনিতেই মোলায়েম। এর ওপর যখন সেসব স্থানে বারবার রেজার বা ব্লেড লাগানো হয় এতে সেই স্থানগুলোর চামড়া ক্রমশই কালো হতে থাকে যা নারী-সৌন্দর্য হ্রাস করে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে যেমনটি পূর্ববর্তী মেডিকেল দারসে উল্লেখিত হয়েছে।

১৬. দৈহিক মিলনের পর ফরয গোসল

দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশের দ্বারা উভয়ের উপর গোসল ফরয হয়ে যায়। এতে বীর্যপাত হোক কিংবা না হোক।[৩১] আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ

"যখন কেউ তার স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝে উপনীত হবে এবং তার সাথে মিলিত হবে তখন তার ওপর গোসল ফরয হয়ে যাবে।" মাত্বার এর হাদীসে "যদিও বীর্য নির্গত না করে"- বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে।[৩২]

১৭. চুমু কিংবা স্পর্শের কারণে স্রাব নির্গত হওয়া

সামান্য চুমু খাওয়ার পর বা একে অপরকে স্পর্শ করার পর যদি পুরুষের সজোরে বীর্য নিক্ষেপ হয়ে থাকে তাহলে তার গোসল ফরয হবে কিন্তু স্ত্রীর নয়। আর যদি এই কারণে ওদী (الودي) ও মযী (المذي) তথা হালকা পানি বা সাদাস্রাব বের হয় তাহলে

---

[৩০] কিতাবুল ফিকহ আ'লাল মাযাহিবিল আরবাআ'- ২/৪৫; আল মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যা কুয়েতিয়্যাহ- ৩/২১৬-২১৭, মরদূকে লেবাস আউর বালূঁকে শরঈ আহকাম- ৮১

[৩১] সহীহ বুখারী- ২৯১, সহীহ মুসলিম- ৩৪৩

[৩২] সহীহ মুসলিম- ৩৪৮

ওযু করে নিলেই যথেষ্ট হবে আর ওই অংশ ধুয়ে ফেলতে হবে।[৩৩] ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,

هُوَ الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ, وَأَمَّا الْمَنِيُّ, فَفِيهِ الْغُسْلُ

মনী, মযী, ওদী; এর মাঝে মযী এবং ওদী (মযী- পুরুষদের হালকা পানি, ওদী- নারীদের স্রাব) বের হলে গোপনাঙ্গ ধুয়ে ওযু করে নিতে হবে। আর মনী (পুরুষদের বীর্য) বের হলে গোসল করতে হবে।" [৩৪]

১৮. কাপড়ের নাপাকি

নাপাকি বা নাজাসাত ২ প্রকার।

◆ **النجاسة الخفيفة (আন নাজাসাতুল খফীফাহ) তথা হালকা নাপাকি**

যেমন: কবুতর, মুরগী, কোয়েল, চড়ুই পাখি ইত্যাদির প্রস্রাব ও বিষ্ঠা। এধরনের নাপাকি কাপড়ে লাগলে সেই কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা জায়েয।

◆ **النجاسة الغليظة (আন নাজাসাতুল গলীযাহ) তথা ভারী নাপাকি**

যেমন: পায়খানা, প্রস্রাব, মনী (বীর্য), মযী, পুঁজ, মুখভর্তি বমি, মহিলাদের হায়েয, নিফাস ও ইস্তিহাযার রক্ত, ডাঙ্গায় বসবাসকারী ব্যাঙের প্রস্রাব ইত্যাদি। গলীযাহ নাপাকি যতটুকুই লাগুক না কেন, কাপড়ের যেখানে নাপাকি লেগেছে উক্ত অংশটি নাপাক হয়ে যাবে। তবে কথা হলো, এর দ্বারা নামায পড়া শুদ্ধ হবে কি না?

এক্ষেত্রে যদি গলীযাহ নাপাকি এক দিরহাম মুদ্রার পরিমাপ (অর্থাৎ হাতের তালুর মাঝের গভীরতা সমপরিমাণ) বা তার অধিক হয়, তাহলে উক্ত কাপড় পরে নামায পড়া জায়েয নয়। কিন্তু নাপাকির পরিমাণ যদি এক দিরহাম মুদ্রার পরিমাপ থেকে কম হয়, তাহলে উক্ত কাপড়সহ নামায পড়া জায়েয আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ধুয়ে নেওয়াই সর্বোত্তম। আর যদি নাপাকি দিরহামের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সে নাপাকি ধুয়ে ফেলা আবশ্যক। এ পরিমাণ নাপাকি নিয়ে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।[৩৫]

---

[৩৩] আল হিদায়াহ- ১/৩২; সহীহ বুখারী- ২৬৯; সহীহ মুসলিম- ৩৪৩; আস সুনানুল কুবরা- ১/২৮২, হাদীস- ৮১১; সুনান নাসায়ী- ১/২৩, হাদীস- ১৯৩; তাহাবী শরীফ- ২৫৯

[৩৪] তাহাবী শরীফ- ২৫৯

[৩৫] ইলাউস সুনান- ১/৪০৫; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকীল ফালাহ- ৮৪; আলবাহরুর রায়েক- ১/২২৮; শরহুল মুনইয়াহ- ১৭১; আন নাহরুল ফায়েক- ১/১৪৬; আল জাওহারাতুন নাইয়িরা- ১/৪৯; ইমদাদুল ফাতাওয়া- ১/৮৭

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- "এক দিরহাম পরিমাণ রক্তের কারণে নামায পুনরায় আদায় করো।"[৩৬]

فلما ذكره صاحب الأسرار عن علي وبن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم وكفى بهما حجة في الاقتداء وروي عن عمر أيضا أنه قدره بظفره

হযরত আলী ﷺ এবং ইবনে মাসউদ ﷺ (কাপড়) নাপাক হওয়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন এক দিরহাম। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ নির্ধারণ করেছেন নখ পরিমাণ।[৩৭]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﷺ সহ প্রমুখ বিখ্যাত আলিমগণ এর পক্ষে মতামত দিয়েছেন। আর যদি নাপাকি শক্ত প্রকৃতির হয়, তাহলে এক দিরহাম মুদ্রার ওজনের কম হলে নামায আদায় হয়ে যাবে। এক দিরহাম মুদ্রার ওজন বর্তমানে প্রায় তিন গ্রাম।[৩৮]

১৯. শিশুদের প্রস্রাব বা পায়খানা

বাচ্চা কাপড়ে প্রস্রাব বা পায়খানা করে দিলে এবং নাপাকির স্থান নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে সেই স্থান ধুয়ে নিলেই হবে। তবে নির্দিষ্ট স্থান জানা না থাকলে পোশাকের যতটুকু অংশে প্রস্রাব লেগেছে বলে সন্দেহ হয় ততটুকু ধুতে হবে, যেন নাপাকির স্থান নিশ্চিতভাবে ধৌত হয়ে যায়। আর নাপাকি কোথায় লেগেছে এটা একদমই না বুঝতে পারলে পুরো কাপড়ই ধুয়ে নিতে হবে।[৩৯] হানাফী মাযহাবে শিশুদের প্রস্রাব সর্বাবস্থায় নাপাক যদিও তা দুধের শিশু হয়, হোক তা ছেলে কিংবা মেয়ে।[৪০] শিশুদের প্রস্রাব যে নাপাক এই সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে এসেছে।[৪১]

বাচ্চারা অনেক সময় মেঝেতে প্রস্রাব করে দেয়। মেঝে যদি মাটির হয় সেক্ষেত্রে তা শুকিয়ে প্রস্রাবের চিহ্ন ও দুর্গন্ধ চলে গেলে ওই স্থান পবিত্র হয়ে যায়। আর মেঝে পাঁকা হলে এবং শুকিয়ে না গেলে প্রসাবের স্থান ভেজা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে ফেললে এবং মেঝে থেকে প্রসাবের প্রভাব ও দুর্গন্ধ চলে গেলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।

---

[৩৬] সুনানে দারা কুতনী- ১; সুনানে বায়হাকী কুবরা- ৩৮৯৬, জামেউল আহাদীস- ১০৭৮৩, মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাকী- ১৩২৩; আল জামেউল কাবীর- ২৩৮

[৩৭] উমদাতুল কারী- ৩/১৪০, আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ- ১০১

[৩৮] কানযুদ দাকায়েকের টিকা- ১৫ থেকে ১৬

[৩৯] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ২/৭৫; বাদায়েউস সানায়ে- ১/২৩৬; ফাতহুল কাদীর- ১/১৬৮

[৪০] মাআরিফুস সুনান- ১/২৬৮-২৬৯; ইলাউস সুনান- ১/৪০৯; রদ্দুল মুহতার- ১/৩১৮

[৪১] সহীহ বুখারী- ১/৩৫; জামে তিরমিযী- ১/২১

কিন্তু অনেকেই এক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক কসরত করতে থাকে। তিনবার পানি ঢেলে প্রতিবার শুকনা করে না মোছা পর্যন্ত পবিত্র বিবেচনা করা হয় না। ওই স্থানে ভিজা পা পড়লে পাও অপবিত্র হয়ে যায় এই ধারণা করা হয়। অথচ সতর্কতার বাড়তি এ কষ্টটুকু মাসআলার সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, পাঁকা মেঝেতে প্রস্রাব করার পর তা শুকিয়ে গেলে এবং প্রস্রাবের চিহ্ন ও দুর্গন্ধ চলে গেলে মোছা ছাড়াই ওই স্থান পবিত্র হয়ে যায়।[৪২]

[৪২] ইবনে আবি শাইবা- ১/৭৬; আদ্দুররুল মুখতার- ১/৩৩২; খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ১/৪২; ফাতহুল কাদীর-১/২০৩; তাতারখনিয়া- ১/৩১৬



||৪র্থ দারস||

মাসায়িলুত ত্বাহারাত

হায়েয বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১. হায়েয ও নিফাস চলাকালীন অবস্থায় কী আযানের উত্তর দেওয়া, আল্লাহর নামসমূহ মুখস্থ করা, ইসলামিক বই, সিরাত, দু'আর বই পড়া ইত্যাদি কাজ করা যাবে?

◈ যাবে, তবে কুরআনের আয়াত পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. মোবাইল ফোনে কুরআন পড়ার আগে ওযু করা কি জরুরি?

◈ কিছু কিছু আলিমদের মতে ওযু জরুরি নয়। তবে আমাদের মতামত হচ্ছে, ওযু ব্যতীত স্ক্রিনে কুরআনের আয়াত স্পর্শ করা যাবে না। উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিমদের মতে এ্যাপ থেকে কুরআন স্পর্শ করে পড়তে হলে ওযু জরুরি।

৩. হায়েয বা তুহুর অবস্থায় ওযু ছাড়া মুসহাফ (বা গিলাফ বাধাইকৃত মুসহাফ) কি ধরা যাবে? পবিত্র অবস্থায় ওযু ছাড়া তিলাওয়াত করা যাবে কি?

◈ আলগা পবিত্র কাপড় দিয়ে ধরা যাবে, কিন্তু কুরআনের সাথে বাধাইকৃত কাপড় বা গিলাফ থাকলেও ধরা যাবে না। আর পবিত্র অবস্থায় মুসহাফ না ধরে ওযু ছাড়া তিলাওয়াত করা যাবে।

৪. হায়েযের সময় দৈনন্দিন আমল হিসেবে সূরা মুলক মুখস্থ তিলাওয়াত করা যাবে?

◈ না। অন্যান্য দু'আ, দুরুদ পড়ে ঘুমাবে এবং ঘুমানোর আগে রেকর্ড বা কারো থেকে সূরা মুলক শুনে নেবে।

৫. হায়েয চলাকালীন রাতে ঘুমানোর আগে দু'আ হিসেবে সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত পড়া যাবে?

◈ সূরা বাকারাহর শেষ দুই আয়াত কেবল দু'আ হিসেবে পড়া যাবে।

৬. কারো পিরিয়ড যদি অভ্যাসমাফিক ২ দিনে ভালো হয় তবে এটা কি হায়েয নাকি ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে?

❖ মাসিকের রক্ত হানাফী মাযহাব মোতাবেক কমপক্ষে ৩ দিন চলমান থাকবে নাহলে তা মাসিক নয় বরং ইস্তিহাযা হিসেবেই গণ্য হবে। কিন্তু কোনো যুবতি মেয়ের মাসিক যদি আজীবন ২ দিনই হয় তাহলে সেটি হায়েয।

৭. আমার মাসিক শুরু হওয়ার ২-৪ দিন আগে থেকে কুদরার মতো কিছু দেখা যায়, প্রবাহমান না, খুবই নগণ্য। এমন ২-৩ দিন চলার পর মাসিকের রক্ত আসে, রক্ত আসার ৬ষ্ঠ দিনে ফরয গোসল করতে হয়। আমি কি এই কুদরাকে মাসিকের অন্তর্ভুক্ত ধরব নাকি ধরব না? সেই সময় সালাত ও সাওমের হুকুম কী হবে? আমার মাসিক নিয়মিত, তবে কুদরার সমস্যা বিগত দু-এক বছর থেকে আছে, আমি আল্ট্রাসাউন্ড করিয়েছি একবার। তখন জরায়ুর কোনো সমস্যাও ধরা পড়ে নি।

❖ উল্লিখিত কুদরা মাসিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। হায়েযের অভ্যাসগত দিন ব্যতীত সুফরা বা কুদরা কোনোটিই হায়েযের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৮. আমার কোনো কোনো মাসে এমন হয় যে ৫-৬ দিন স্বাভাবিকভাবে পিরিয়ড হয়ে একদম বন্ধ হয়ে যায়, তাই গোসল করে নামায শুরু করি। ৪-৫ ওয়াক্ত নামায পড়ার পর আবার রক্ত দেখি। এই রক্ত কয়েক ঘণ্টা পর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তারপর থেকে আর হয় না। আমার প্রশ্ন হলো, যেহেতু আমার প্রায়ই এমন হয় তাহলে কি আমার ৫-৬ দিন পিরিয়ড হয়ে বন্ধ হওয়ার পর আমার ১ দিন অপেক্ষা করা উচিত যেহেতু আবার তো রক্ত আসার সম্ভাবনা রয়েছে?

❖ যখন সম্পূর্ণ বন্ধ হবে তখনই সালাত পড়বেন, একদিন অপেক্ষার দরকার নেই।

৯. সবসময় হায়েয হয় ৫ দিন। হঠাৎ কোনো মাসে যদি ৭ দিন হয় তবে কি ৫ দিনই হায়েয ধরে ইবাদাত শুরু করে দেব নাকি অপেক্ষা করবো?

❖ যখন সাত দিন হবে তখন ৭ দিনই হায়েয থাকবে। কিন্তু যদি ১০ দিন অতিক্রম করে ফেলে তখন হানাফী মাযহাব মতে অভ্যাস মোতাবেক হায়েয ৫ দিন ধরে পরবর্তী সালাতগুলো কাজা আদায় করতে হবে আর ৫ দিনের পরে যতদিন রক্ত দেখা যাবে ততদিন ইস্তিহাযা বিবেচিত হবে। কিন্তু ১০ দিনের নিচে যতদিন থাকবে তা হায়েয বলেই গণ্য হবে।

১০. কারো ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে তার নিয়মিত হায়েয হয় না। শুধু ফোঁটা ফোঁটা বের হয়ে দু-তিন দিন থাকে আবার চার-পাঁচ দিন পর পুনরায় হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় মেনেও হয় না। এক্ষেত্রে সে কোন সময়টাকে হায়েয হিসেবে ধরে নেবে?

◈ তার আগের ২-৩ দিন হায়েয হয়ে আবার ৪-৫ দিন পর হলেও তা হায়েয হিসেবেই গণ্য হবে, পুরো ১০ দিন পর আবার দেখা গেলে আগের মাসে যতদিন হায়েয হয়েছিল ততদিন ধরে বাকি দিনগুলোর সালাত কাজা করবে।

১১. যাদের অনিয়মিত হায়েয হয়, যেমন- কোনো মাসে ৯ দিন হায়েয হলো, তো কোনো মাসে ১২ দিন অথবা ১৫ দিন। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসেই ১৫ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর যে কদিন ব্লিডিং ছিলো না সেই ক'দিনের কাজা করে নিতে হবে? নাকি মাঝখানে রক্ত না দেখলেই নামায শুরু করতে হবে?

◈ হায়েয বন্ধ হলেই পবিত্র হয়ে সালাত পড়বে। আগের মাসের হিসাব এজন্যে করা হয়, যদি কোনো মাসে হায়েযের সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও হায়েয চলমান থাকে তাহলে যাতে নারীরা আগের মাসের হিসাব ধরে ছুটে যাওয়া সালাতগুলো কাজা করে নিতে পারে। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা অতিক্রম হওয়ার আগে যদি হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তখনই পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

১২. হায়েযের রক্ত আসার আগের দিন হালকা হলুদ স্রাব আসে তারপর মেটে রঙের স্রাব এরপর লাল রঙের রক্ত। আমার প্রশ্ন হলো- যখন লাল রঙ দেখবো তখন কি আমি নিজেকে হায়েযগ্রস্থ বলে ধরে নেবো নাকি সাইকেল অনুযায়ী হলুদ স্রাব পেলেই আমি হায়েযগ্রস্থ?

◈ মাসের অভ্যাস অনুযায়ী যেদিন হায়েয আসে সেদিন হলুদ বা মেটে স্রাব দেখলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে আর যদি অভ্যাসের দিনে না হয় বরং হায়েয হওয়ার অভ্যাসগত দিনের আগে এমন দেখা যায় তবে তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে না। এটি হানাফী ও হাম্বলী উভয়ের মত।[১]

নিফাস বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১৩. আমার ১ম সন্তানের সময় নিফাসের রক্ত ৬০ দিন চলমান ছিল। ২য় সন্তানের সময় ৫৫ দিন। এক্ষেত্রে ৪০ দিন শেষে বাকি দিনগুলো ইস্তিহাযা। আমি যেহেতু নিয়ম জানতাম না তাই রক্ত দেখেলেসালাতপড়তাম না। এখন করণীয় কী?

---

[১] মাউসূআতুল আহকামিত তহারাত, আবু উমার আদ দিবইয়ান- ৬/২৮১-২৯৯; আল মাওসূয়াতু ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিইয়্যাহ- ১৮/২৯৬, আল মুগনী- ১/২০২; আল মাজমু'- ২/৪২৩

◈ জি, ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যে রক্ত দেখা গিয়েছে তা ইস্তিহাযা। ইস্তিহাযার দিনগুলোতে ছুটে যাওয়া অর্থাৎ, ২০ দিন আর ১৫ দিনের সালাতগুলো কাজা করতে হবে।

১৪. নিফাসের ক্ষেত্রে যদি মাঝখানে কয়েকবার কয়েকদিন করে রক্ত বন্ধ থাকে আর সে দিনগুলোতে নামায না পড়ে যদি ৪০ দিন পর একবারে কাজা পড়ে নেয় তাহলে কি হবে? যেমন- কারো যদি ২০ দিনের পর ১০ দিন ব্লিডিং বন্ধ থেকে আবার ৩৬, ৩৭ তম দিনে ব্লিডিং হয়ে একবারে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ওই নারী ৪০ দিনই অপেক্ষা করে তারপর ৩৭ দিনের পর থেকে নামায গুলো কাজা পড়লো। একই ভাবে কেউ যদি ৪০ দিন অপেক্ষা করতে গিয়ে দেখে যে, অনেক আগেই সে পবিত্র হয়ে গিয়েছে। এরপর সে নামাযগুলো কাজা করে নিলো। নামাযগুলো এভাবে কাজা করার কারণে কি গুনাহ হবে? সে তো জানতো না যে, সে আসলেই পবিত্র হয়েছে কিনা। কেননা ৪০ দিনের আগ পর্যন্ত তো আবার ব্লিডিং–এর সম্ভাবনা থেকে যায়।

◈ নিফাসের অভ্যাসগত কোনো নিয়ম না থাকলে ৪০ দিনের আগে যখনই দেখবে রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখনই পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করবে। ৪০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেনা। যদি ৪০ দিনের মধ্যে আবার রক্ত দেখা যায় তবে তিনি সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবেন।

কিন্তু যদি পূর্বের নিফাসের সময়সীমা ও অভ্যাস জানা থাকে সেক্ষেত্রে রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও পূর্বের অভ্যাসের সময়ানুযায়ী পুনরায় রক্ত দেখার প্রবল ধারণা থাকলে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি দেখা যায় যে, এই ৪০ দিন পর্যন্ত তিনি আর কোনো রক্ত দেখেনি, তাহলে যেদিন রক্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেদিন থেকে সেই ৪০ তম দিন পর্যন্ত সালাতগুলোর কাজা আদায় করে নেবে।

ইস্তিহাযা বিষয়ক প্রশ্ন

১৫. আমার প্রায় সবসময়ই সাদাস্রাব হয়। তবে আমি মা'যূর নই। ১.৫-২ ঘণ্টা পর পর সাদাস্রাব হয়। এখন বাসায় থাকলে আমার সালাত আদায়ে কোনো সমস্যা হয় না, আলহামদুলিল্লাহ। তবে যখন লম্বা সময়ের জন্য বাহিরে যাই, যেমন: কোচিং বা কলেজের জন্য বাইরে থাকি তখন আমি বাসা থেকে ওযু করে বের হই, যাতে সালাত আদায় করতে পারি। এখন ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে আমার যে সাদাস্রাব হয়েছে সেটা আমি নিশ্চিত থাকি। স্রাব বাইরে বের না হলেও যোনিপথের ভিতরে থাকে। যখন প্রস্রাব হয় তখন সাদা ঘন পদার্থের মতো বের হয়ে যায়। এখন বাইরে তো কোনোভাবেই ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হওয়া সম্ভব হয় না। তাই ওযু ভঙ্গের অন্য কারণ না ঘটলে

আমি কি সেই ওযু দিয়ে সালাত আদায় করতে পারবো? সালাত পড়তে না পারলেও এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি যাতে আমার সালাত কাজা না হয়?

❖ যদি স্রাব যোনিপথের বাইরে না আসে তাহলে ওযু ভাঙবে না। সেই ক্ষেত্রে সেই ওযু দিয়েই নামায পড়ে নিতে পারবে। কিন্তু যখন স্রাব বের হয়ে যোনিপথের বহিরাংশ ভিজবে তখনই ওযু ভেঙে যাবে। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে পরিষ্কার হয়ে ওযু করে নেবে। আর পরিষ্কার হওয়া সম্ভব না হলে এমনিতেই ওযু করে বা আগের ওযুতেই নামায সঠিক সময়ে আদায় করে নেবে, পরবর্তীতে সেই নামায বাসায় ফিরে পবিত্র হয়ে আবার আদায় করবে।

১৬. স্রাব আটকে রাখার জন্য লজ্জাস্থানে তুলা বা কাপড় দিয়ে রাখলে যদি লজ্জাস্থানের সাথে তুলা/কাপড়ের লেগে থাকা অংশ ভিজে যায় তাহলে কি ওযু ভেঙে যাবে?

❖ ওযু করার পর এমন হলে ওযু ভেঙে যাবে। তবে তুলা বা কাপড় না ভিজলে ওযু ভাঙবে না।

১৭. স্রাব না আসার জন্য লজ্জাস্থানে কাপড়/তুলা দিয়ে এরপর ওযু করে বাইরে যাওয়ার পর যখন নামাজের ওয়াক্ত হবে তখন যদি বুঝতে না পারি যে স্রাব আসছে কিনা এবং ওই অবস্থায় সালাত আদায় করি এবং বাসায় আসার পর যদি লজ্জাস্থানে দিয়ে রাখা কাপড়/তুলা বের করার পর তাতে স্রাব লেগে আছে দেখতে পাই তাহলে কি আমার নামায আদায় হবে? আর যদি আমার বাইরে থাকা অবস্থায় সন্দেহ হয় স্রাব এসে গেছে কিন্তু আমি নিশ্চিত না আর নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায় তখন কি করবো?

❖ পবিত্রতার ক্ষেত্রে কেবল সন্দেহ গ্রহণযোগ্য নয়, নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা হতে হবে। যদি নিশ্চিত হন যে, ওযুর পরেই সাদাস্রাব এসেছে তাহলে নামায আবার আদায় করে নিতে হবে আর যদি নিশ্চিত হন নামাজের পরে বের হয়েছে তাহলে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

১৮. কারো মাঝে মাঝে লাগাতার সাদাস্রাব যায়, আবার কখনো বন্ধ থাকে। অর্থাৎ, সে অনিশ্চিত এই বিষয়ে। এক্ষেত্রে সে কোনো ওয়াক্তের নামাজের পূর্বে যদি ওযু করে সাথে সাথেই নামাজে দাঁড়ায় এবং ভেজা অনুভব করে, মনে হয় যেন সাদাস্রাব বের হয়েছে তাহলে কি তার ওযু ভেঙে যাবে?

❖ মনে হলে ওযু ভাঙবেনা। নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই সালাত আদায় করতে থাকবে।

১৯. ইস্তিহাযার বিধানে প্রত্যেক ওয়াক্তে ওযু করে সালাত পড়তে হয় এক্ষেত্রে কি কাপড় পরিবর্তন করা লাগবে? প্রত্যেক ওযুর সময় রক্ত বা স্রাব পরিষ্কার করতে হবে নাকি শুধু ওযু করলেই পবিত্রতা হাসিল হয়ে যাবে?

❖ এক্ষেত্রে কাপড়টিও যথাসম্ভব পবিত্র রাখতে হবে।

২০. আমরা জেনেছি সাদাস্রাব বের হলে ওযু করতে হয়। তাহলে এটি যদি আমাদের কাপড়ে লেগে যায় তখন কি কাপড় পরিবর্তন করা জরুরি? নাকি ওই কাপড় পরা অবস্থায় ওযু করলেই পবিত্র হতে পারবো?

❖ কাপড়ের ওই অংশ ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে।

লোমকর্তন-বিষয়ক প্রশ্ন

২১. বগলের অবাঞ্ছিত লোম পুরোপুরি না চেঁছে বা না উপড়ে ফেলে যদি কেঁটে ছোট করে নিই তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে?

❖ সমস্যা নেই।

২২. অবাঞ্ছিত লোম যে সময়সীমার মধ্যে কাঁটতে হয় মাঝে মাঝে সেই সময়ের মধ্যে কাঁটা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় কি নামায হচ্ছে?

❖ জি, নামায হচ্ছে। তবে সময়সীমার ৪০ দিনের মধ্যে লোমকর্তন না করা মাকরুহে তাহরীমী।

পবিত্রতাজনিত অন্যান্য প্রশ্ন

২৩. নামায ফরয হবার পরেও অনেকটা বয়স পর্যন্ত স্বপ্নদোষের বিষয়টা জানা ছিল না। এমন হয়তো অনেক সময়ই হয়েছে যে, স্বপ্ন দেখেছি এবং ঘুম থেকে উঠার পর ভেজা ভাব ছিল। যেহেতু এসব জানতাম না তাই কেবল ওযু করেই নামায পড়েছি। এখন সে নামাযগুলো কি আদায় হয়নি? এর জন্য কি কিছু করণীয় আছে?

❖ উক্ত নামাযগুলো আন্দাজ করে সুযোগমতো কাজা আদায় করলেই হবে।

২৪. পিরিয়ডের জন্য ব্যবহৃত কাপড় যদি অন্য কোনো পবিত্র কাপড়ে লাগে বা রোদে শুকাতে দিলে ভালো কাপড়ের সাথে লেগে যায় তাহলে কি ঐগুলোও নাপাক হয়ে যাবে? ভালো কাপড় ও পিরিয়ডের কাপড় একই স্থানে দিলে কি কোনো সমস্যা হবে?

❖ নাপাকির ভেজা ও আদ্রতা অন্য কাপড়ে না লাগলে সেই অংশ নাপাক হবে না। তবে আলাদা করে রোদে শুকাতে দেয়াই উত্তম।

২৫. আজানের আগেই তো নামায পড়া যায়। যদি এমন হয়, ওয়াক্ত হয়েছে নামাজের, কিন্তু সে আজানের জন্য অপেক্ষা করে নামায আদায় করেনি। আর ওই ওয়াক্তের সময়ই হায়েয হয়ে গিয়েছে, তাহলে কি পরবর্তীতে ওই নামায আদায় করতে হবে?

◈ ইবরাহীম নাখায়ী ﷺ বলেন– "নামাজের সময়ের মধ্যে কোনো মহিলার অপবিত্রতা শুরু হলে ওই নামায তাকে কাজা করতে হবে না।" [২]

এছাড়া হাসান বসরী ﷺ, মুহাম্মাদ ইবনে সীরিন ﷺ সহ প্রমুখ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।[৩]

২৬. ইস্তিঞ্জা করার পর পবিত্র হওয়ার জন্য টিস্যু ব্যবহার না করে পানি ব্যবহার করলে মাঝে মাঝে পানি যোনিপথের ভিতরে থেকে যায়। যখন একটু হাঁটা-চলা হয় বা সালাতে রুকু সিজদা করা হয় তখন পানিগুলো বের হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কি আমার ওযু বা সালাত ভেঙে যায়?

◈ এটা যদি পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত পানি হয় তাতে ওযু ভাঙবে না। আর এটা যদি নাপাক তথা প্রস্রাব বা স্রাবের পানি হয় তাহলে ওযু ভেঙে যাবে।

২৭. ফরয গোসলের সময় ৩ বারের অধিক মাথায় পানি দেওয়া যাবে?

◈ যাবে। তবে পানির অপচয় করার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, ওযুর ক্ষেত্রে ৩ বারের অধিক পানি নেওয়া হাদীসে নিষেধ রয়েছে।

২৮. বাচ্চা গায়ে প্রস্রাব/পায়খানা করে দিলে জায়গাটা পরিষ্কার করে ওযু করে নিলে হবে নাকি আবার গোসল করতে হবে?

◈ যদি শরীরের কোনো স্থানে লাগে তাহলে সেই স্থান ধুয়ে নিলেই হবে গোসল বা ওযু করতে হবে না। আর কাপড়ে লাগলে কাপড়ের সেই স্থানের সাথে শরীরের নাপাক অংশটুকু ধুতে হবে।

২৯. রাতে ওযু করে ঘুমানোর সময় ঘুমানোর জিকির করার পর যদি ওযু ভেঙে যায় তাহলে কি আবার ওযু করে এসে জিকির করতে হবে?

◈ জরুরি নয়।

২] কিতাবুল আছার- ১/৮৪

৩] কিতাবুল আছল- ১/২৮৬; ফাতহুল কাদীর- ১/১৫২; আলবাহরুর রায়েক- ১/২০৫; রদ্দুল মুহতার- ১/২৯১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া- ১/৪৮৩

মেডিকেল বিষয়ক প্রশ্ন

◈ *পরিচ্ছন্নতা*

৩০. যোনিপথ পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করা যাবে?

◈ সাবান ব্যবহার না করাই উত্তম। কেননা সাবানের ক্ষারের কারণে ভ্যাজাইনার পিএইচ পরিবর্তন হয়ে যায়। বাজারে বিভিন্ন ভ্যাজাইনাল ওয়াশ লিকুইড পাওয়া যায়, যেমন: V–care, V-wash ইত্যাদি। সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩১. পিরিয়ড ভালো হওয়ার কয়েকদিন পর (৫-৭দিন) গোপনাঙ্গের আশেপাশে গোল গোল দানার শক্ত ফোঁড়ার মতো হয়। মাঝেমধ্যে ব্যথা করে, একবার একটু পুঁজও হয়েছিল। কয়েকদিন পর আবার তা মিলিয়ে যায়, একাই ভালো হয়ে যায়। এটার জন্য কি করতে পারি?

◈ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন, লোমকর্তনের সময় রেজার ডেটল-স্যাভলনের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করে নিন, কুসুম গরম পানি ব্যবহার করবেন লোম কর্তনের পর। অন্তর্বাস ধোয়ার সময় ডেটল-সেভলনের পানি ব্যবহার করবেন। ইন শা আল্লাহ এগুলো অনুসরণ করলে এই সমস্যা হবে না, তবুও যদি সমস্যা চলমান থাকে তাহলে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান।

৩২. গুপ্তাঙ্গের লোমকূপে চুলকানি, এটাতে করণীয় কি?

◈ চুলকানি মাসিকের রাস্তায় কিনা সেটা লক্ষ্য করুন। যদি শুধুই লোমকূপে হয় তাহলে কিছু বিষয় খেয়াল করুন- লোম কর্তনের সময় রেজার ইউজ করলে অবশ্যই স্যাভলন বা ডেটলের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করুন। লোমকর্তন শেষে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। হাইজিন মেইনটেইন করুন, অন্তর্বাস সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখুন, প্রস্রাবের পর ভালো করে পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করুন।

৩৩. গোপনাঙ্গের লোমকর্তনের ক্ষেত্রে হেয়ার রিমুভাল ক্রীম এবং রেজারের মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা অধিক স্বাস্থ্যসম্মত?

◈ রেজার ব্যবহার করাই ভালো। ভিট ক্যামিকেল হওয়ায় যোনিপথ কালো হয়ে যাওয়া ও অস্বস্তি অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি কোনো হারবাল হেয়ার রিমুভাল ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে সেটাও ভালো হবে ইন শা আল্লাহ।

◈ *সাদাস্রাব*

৩৪. আমার হায়েয শেষ হওয়ার পর সাদা পানি পড়ে। এটা কি সাদাস্রাব?

◈ সাদা, গন্ধহীন তরল (ঘনত্ব কম বা বেশি) সাদাস্রাব হিসেবেই গণ্য করা হয়।

৩৫. আপু আমার পিরিয়ড নিয়মিত কিন্তু ২০১২ বা ২০১৩ সাল হতে পিরিয়ডের ৫-৭ দিন আগ থেকেই অনেক সাদাস্রাব বের হয়। এবং তার থেকে পরিষ্কার হতে বেশ সময় লাগে। আমি এই সময় টা তে সাদাস্রাব বের হবার পর বেশ দুর্বলতা অনুভব করি। এটা কি অস্বাভাবিক কিছু?

◈ অস্বাভাবিক হবে যখন সাদাস্রাবে গন্ধ হবে বা সাথে চুলকানি থাকবে অথবা জ্বর থাকবে। আপনার ক্ষেত্রে এসকল লক্ষণ না থাকলে এটি স্বাভাবিক।

◈ *হায়েয*

৩৬. পিরিয়ডের পূর্বে স্তনে ব্যথা হয় ও শক্ত চাকার মতো হয়ে যায়। এটা কি স্বাভাবিক?

◈ এটা স্বাভাবিক। পিরিয়ড এর সময় হরমোনজনিত পরিবর্তনের কারণে এটা হয়। এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই ইন শা আল্লাহ। তবে আপনি সেল্ফ এক্সামিনেশন করুন নিজে নিজে। Self examination of breast লিখে ইউটিউবে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। সে অনুযায়ী করে দেখুন স্বাভাবিক আছে কিনা।

৩৭. পিরিয়ডের ব্যথায় কী করণীয়?

◈ গরম পানির সেঁক দেওয়া, গরম পানিতে কালজিরা, আদা, মধু মিশিয়ে পান করা, মাত্রাধিক্য ব্যথা হলে প্রয়োজনে ডাক্তার দেখানো।

৩৮. আমার গত ২ মাস ধরে ১৫ দিন পর পর পিরিয়ড হয়েছে। এই মাসে পিরিয়ড হয়েছে কিন্তু রক্ত যাচ্ছে না। প্রথম দিন কালো রক্ত গিয়েছে, এরপর বন্ধ হয়ে যায়। করণীয় কী?

◈ অস্বাভাবিক মাসিকের অন্য কোনো লক্ষণ আছে কিনা জানতে হবে। ৩-৪ মাস টানা এমন হলে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন ইন শা আল্লাহ।

৩৯. মেন্সট্রুয়াল কাপ কত ঘণ্টা ব্যবহার করা যাবে?

◈ ৬-৭ ঘণ্টার বেশি না।

৪০. আমার ৩ মাস হলো পিরিয়ড হয়নি পরের কয়েক মাস ঠিকমতো পিরিয়ড হয়েছে। এখন আবার ৩ মাস ধরে পিরিয়ড হচ্ছে না। তবে এখন প্রচুর সাদাস্রাব যাচ্ছে। এটা কি স্বাভাবিক? এক্ষেত্রে কী করা উচিত?

◈ এমন অনিয়মিত মাসিক হলে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান। কিছু টেস্ট দেবে সেগুলো করাবেন ইন শা আল্লাহ।

৪১. হায়েযের রক্ত জমাট বাঁধে না কিন্তু আমার হায়েযের সাথে মাঝে মাঝে জেলি বা নরম আবরণের মতো কী যেন বের হয়। এটা কি স্বাভাবিক?

◈ এগুলো হায়েযের রক্ত না, বরং এগুলো ওভাম এবং জরায়ুর ভেতর তৈরি হওয়া নরম স্তর যেগুলো বাচ্চা গর্ভে না আসলে পিরিয়ডের রক্তের সাথে বের হয়ে যায়।

৪২. হায়েযের সময় প্রথম দিকে গাঢ় রক্তের সাথে জমাট রক্তও থাকে, তাহলে কী করণীয়? কারণ, বলা হয়েছে রক্ত জমাট হলে তা হায়েযের রক্ত না?

◈ তরল লাল রক্তের সাথে জমাট বস্তু থাকতেই পারে। সেগুলো মূলত রক্ত না। তবে তরলবিহীন বেশি বড় জমাট রক্তের মতো কিছু বের হচ্ছে কিনা সেটা খেয়াল করতে হবে। এমন হলে এর সাথে অসহনীয় ব্যথা বা জ্বর আছে কিনা এই ব্যাপারগুলো দেখতে হবে। এক্ষেত্রে ডাক্তার দেখানো উচিত।

৪৩. পিরিয়ডের সময় কাপড় ব্যবহার করা যাবে?

◈ কাপড় ব্যবহার করলে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা জরুরি। স্যাভলন দিয়ে ধোয়া, ৩ ঘণ্টা পর পর তা পরিবর্তন করা ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

৪৪. পিরিয়ডের সময় প্যাডের ওপর পেপার ন্যাপকিন নামে যে চারকোণা টিস্যু পেপার পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করা কতটুকু স্বাস্থ্যকর?

◈ টিস্যু ব্যবহার করা অনুচিত। কারণ এগুলো ভিজে যোনিপথে ঢুকে যেতে পারে, ফলে পরবর্তীতে ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে।

৪৫. তিন মাস ধরে হায়েয হচ্ছে না। তবে হায়েযের সময় আসলে ব্রেস্টে ব্যথা অনুভব হয় কিন্তু রক্তস্রাব হয় না। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

◈ দ্রুত একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান ইন শা আল্লাহ।



||৫ম দারস||

অসূর্যস্পর্শী-১

নারীদেরকে আল্লাহ ﷻ চক্ষুর প্রশান্তিরূপে সৃষ্টি করেছেন। শৈশব ও কৈশোরে সে তার পরিবার ও নিকটাত্মীয়ের চোখের মণি হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ জীবনে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মতো নেমে আসে যৌবনকাল। মেয়ে থেকে সে হয়ে যায় নারী। যৌবনের শুরু থেকেই তার দিকে পাথরবৃষ্টির মতো পড়তে থাকে লালসার দৃষ্টি। তাই আল্লাহ ﷻ নারীদেরকে দিয়েছেন ঢাল; একটি সুস্পষ্ট বিধান, যাতে সে নিজেকে সমস্ত লোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারে। নারীরা ঘরের রানি হয়ে থাকবে। ঘরের মধ্যে যারা তার দূর-সম্পর্কীয় তাদের সামনে যাবে না। পুরুষেরা বাহিরে গিয়ে রোদে পুঁড়ে সংসারের ঘানি টানবে, ঘরের রানিদের জন্য আহার্য জোগাড় করবে। নারীদের যদি ঘরের বাহিরে একান্তই বের হতে হয় তাহলে এমনভাবে বের হবে যাতে সূর্যও তাকে স্পর্শ করতে না পারে। নারীরা এমনভাবে চলাফেরা করবে এবং এমন পোশাক পরিধান করবে যেই পোশাক পরিধান করলে বখে যাওয়া পুরুষগুলোও কিছু বলার বা উত্যক্ত করার সাহসটুকু তো পাবেই না; উল্টো নতজানু হবে, ভিতর থেকে সম্মান এসে পড়বে নিজেদের অজান্তেই। সে এমন পোশাক পরিধান করবে যে পোশাক দেখলেই মানুষ বুঝে নেবে এই নারী সম্ভ্রান্ত। তার সঙ্গ কামনা করার ইচ্ছা জাগলেও পাপবোধ অনুভূত হবে সেই পুরুষের মনে। এভাবেই আল্লাহ ﷻ নারীদেরকে সম্মানিত করতে চেয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা আর মু'মিনদের অধীনস্থ নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয় (যখন তারা বাড়ির বাহিরে যায়), এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [১]

---

[১] সূরা আহযাব- ৫৯

কিন্তু পাশ্চাত্য মিডিয়া ও তাদের দূষিত সংস্কৃতি আমাদের মগজ ধোলাই করে দিয়েছে। তারা বারবার আমাদের এটাই বোঝাতে চায় যে, পর্দা নারীদের পায়ের শিকল এবং নারী-স্বাধীনতার পথে অন্তরায়। এই প্রগতিশীল সমাজে পর্দার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা চায় মুসলিম নারীরাও যাতে তাদের মতো অসভ্য হয়ে যায় এবং ছোট পোশাকে অভ্যস্ত হয়। আর আফসোস, অনেক মুসলিম বোন তাদের বাতলে দেওয়া পথেই চলছে। তারা জানেও না ওই পথে কতটা যিল্লত, কতটা অপমান। সাধারণ মানব মস্তিষ্কও এটা বুঝে নেবে যে ভদ্রতা ঢেকে রাখার মাঝে আর উগ্রতা প্রকাশ করার মাঝে। কিন্তু কতিপয় মানুষ আজ ট্রেন্ডের স্রোতে এতটাই গা ছেঁড়ে দিয়েছে যে, সে বুঝতেও পারছে না এই স্রোত তাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে।

১. বর্তমান সময়ে পর্দার প্রয়োজনীয়তা

ভয়াবহ এক ফিতনাময় সময়ে আমরা বসবাস করছি। আর হালের অন্যতম বড় একটি ফিতনা হলো নারী-পুরুষজনিত ফিতনা। যা হাজারো ফিতনা-ফাসাদের দ্বার খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এসব বাঁধহীন ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে যার যার জায়গা থেকে গা বাঁচিয়ে চলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। নারী-পুরুষজনিত এই ফিতনার দ্বার সিলগালা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে নেমে এসেছিল পর্দার ঐশী বিধান। আর ঐ পর্দার বিধান যদি সুষ্ঠুভাবে মেনে চলা হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এই ফিতনা থেকে অনেকাংশেই বেঁচে যেতে পারব।

আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বেও বঙ্গদেশীয় নারীরা পরপুরুষদের সামনে যেত না, প্রয়োজনে আড়ালে থেকে কথা বলতো, ঘরের বাহিরে বের হওয়ার প্রয়োজন হলে অপাদমস্তক ঢেকে বের হতো। অপরদিকে বর্তমানে এই চরম জাহালতের মুহূর্তে যখন পর্দার জরুরত পূর্বের চেয়েও অধিক, অথচ আজ নারীরা বেপর্দা ও উলঙ্গপনায় মেতে উঠেছে। সেটাই কিনা আধুনিকতা, পর্দার বিধান সেকেলে! বর্তমান মুক্ত চিন্তার (!) সমাজে এসেও পর্দা কেন প্রয়োজনীয় এমন একটা প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে।

◆ ইসলামের বিধান কখনও পুরানো হয় না। চৌদ্দশত বছর আগে যা আল্লাহর তরফ থেকে বিধান হিসেবে নেমে এসেছে, আজও তা সেই এক আল্লাহরই বিধান। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত তা পালনীয়। তাই এই যুগে এসেও পর্দা করার মূল এবং প্রথম কারণ এটাই যে, আল্লাহ ﷻ এই বিধান নাযিল করেছেন কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য।

◆ সমাজে জিনা সহজলোভ্য। পুরুষেরা খুব সহজেই নারীসঙ্গ উপভোগ করছে। ফলে কতিপয় পুরুষের মানসিকতা এমন হয়ে গিয়েছে যেন সকল নারীই তাদের কাছে

ভোগের বস্তু। এমতাবস্থায় সহজপ্রাপ্য নারীদের থেকে নিজেকে আলাদা করতে বর্তমান সমাজে পর্দা প্রয়োজন।

◆ আমরা এমন এক হাইপারসেক্সুয়াল সমাজে বসবাস করি যেখানে মানুষ একটি ক্লিকের ব্যবধানে জিনায় জড়ায়। পর্নোগ্রাফি এতোটাই সহজলোভ্য যে, এমন পুরুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে কিনা ইলেক্ট্রনিক স্ক্রিনে কোনো উলঙ্গ নারীকে কখনো দেখেনি। এমতাবস্থায় কতিপয় পুরুষের মানসিকতা এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছে যে, তারা নারী বলতে বুঝে কেবল এক টুকরো গোস্ত। পোশাকের ওপর দিয়েই তারা নারীদেরকে উলঙ্গ কল্পনা করে মজা লুটে। সেসব বেহায়া চোখে নিজেকে নগ্ন কল্পনা করতে দিতে চাইবে না কোনো সম্ভ্রান্ত নারী। প্রকৃত পর্দাই আসলে এর সর্বোচ্চ সমাধান।

◆ বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় দুটি সামাজিক ব্যাধি হচ্ছে ইভ টিজিং এবং ধর্ষণ। পর্দাজনিত বিধি-নিষেধের সঠিক অনুসরণই এসবের হাত থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা করতে পারে। বোরকা-নিকাবের অন্যতম একটি সুবিধা হলো—এটা পরিধানের পর বয়স বোঝা যায়না। সেই সাথে সমাজের দ্বীনবিমুখ মানুষেরা এটাই মনে করে যে, বোরকা-নিকাব বয়স্করা পরিধান করে। এভাবেই পর্দা ইভ টিজিং এমনকি ধর্ষণ থেকেও রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হয়েছে।

◆ পাশ্চাত্য সমাজ আমাদের মগজধোলাই করেছে। ফলে এই শাশ্বত বিধানকে তারা আমাদের চোখের সামনে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেতে সক্ষম হয়েছে যে, পর্দা নারী-স্বাধীনতার পথে প্রাচীর। বস্তুত, তাদের স্বাধীনতা কেবল নারী দেহ থেকে কাপড় কমানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাই মুসলিম নারীদের পাশ্চাত্যের এই নীতির বিরুদ্ধাচরণস্বরূপ হিজাব, নিকাবের অধিক প্রচলন ও প্রচার-প্রসার ঘটানো জরুরি।

২. পর্দা, ইভ-টিজিং এবং ধর্ষণ

বর্তমান সময়ে বিশেষত আমাদের দেশে অনেক বড় একটি জাতীয় ও সামাজিক সমস্যা নারী উত্ত্যক্ত বা ইভ টিজিং। সেই সাথে রয়েছে ধর্ষণ; যা মারাত্মক এক সামাজিক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের কোথাও না কোথাও প্রতি সেকেন্ডেই এমন কোনো জঘন্য অপরাধের শিকার হচ্ছে নারীরা। এই অবস্থায় একদল প্রান্তিক লোক বলে থাকেন যে, "নারীরা যেভাবে চলতে চায় চলবে, তাই বলে কি ইভ টিজিং বা ধর্ষণ করতে হবে?" আবার কিছু মানুষ বলেন যে, "সব দোষ পোশাকের। পর্দা করে রাস্তায় চলাচল করলেই ইভ টিজিং বা ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে।"

কিন্তু যখন হাজারে একজন পর্দানশীল নারী দুর্ভাগ্যক্রমে ধর্ষিত হয় তখন দ্বিতীয় উক্তিটিকে কেন্দ্র করে তথাকথিত সুশীলদের আঙুল উঠে পর্দার বিধানের উপর। তাদের

এসব কথা প্রভাবিত করে দুর্বল ঈমানের মুসলিমদেরকে। তাই আমাদের এসব বিষয়ে আরও হিকমাহ অবলম্বন করে, দূরদর্শিতার সাথে কথা বলা উচিত যাতে ইসলামের বিধানের ওপর আঘাত আনার মতো কোনো ফাঁক ফোঁকর তারা খুঁজে না পায়।

ধর্ষণ কিংবা ইভ টিজিং এর জন্য পুরুষই মূলত দায়ী। কিন্তু এখানে সাবধানতা অবলম্বন না করার দায়ভার নারীর। আর পর্দাই হচ্ছে সাবধানতা অবলম্বন। এরপরও যদি কোনো পর্দানশীল নারী ধর্ষিত হয় তাহলে এভাবে বলা যায়, সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বনের পরও চুরি হয়ে যায় আর সেটা ব্যতীক্রম। ব্যতীক্রম কখনই উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত হতে পারে না, যেমনটা ইংরেজিতে বলা হয় "exception is not an example"। ১০০ জন ধর্ষিতার মাঝে ১-২ জন হয়তো পাওয়া যাবে যারা পূর্ণ পর্দানশীল। তবুও এগুলোই খবরের কাগজের বড় বড় হেডলাইনে আসে। যেন তারা জাতিকে এটাই বোঝাতে চায় যে, পর্দা করেও নারীরা ধর্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ পর্দা করে কোনো লাভ নেই।

এমতাবস্থায় অনেকের মাঝেই এই ধারণা এসে পড়েছে যে, পর্দার বিধানের মূল উদ্দেশ্য ধর্ষণ বা ইভ টিজিং থেকে রক্ষা পাওয়া। তারপর যখন আমরা সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারি যে পর্দা করা সত্ত্বেও কেউ একজন ধর্ষিত হয়েছে তখন আমাদের মনে সংশয় জাগতে শুরু করে পর্দার বিষয়ে। অথচ পর্দার উদ্দেশ্য ইভ টিজিং বা ধর্ষণ থেকে বাঁচা নয়। এভাবে বলা যেতে পারে ইভ-টিজিং বা ধর্ষণ থেকে রেহাই পাওয়া পর্দার ফজিলতমাত্র, মূল উদ্দেশ্য নয়। পর্দার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দেওয়া বিধান পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

৩. 'মনের পর্দা' ও দেহের পর্দা

বর্তমান যুগে একটি বহুল প্রচলিত অজুহাত হলো 'মনের পর্দা'। যারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে পুরোপুরি গাফেল তাদেরকে যখন পর্দা করার কথা বলা হয় তখন তারা তোঁতা পাখির মতো বলতে থাকে "অন্তর পরিষ্কার থাকলেই হয়", "মনের পর্দাই বড় পর্দা", "কত বরকাওয়ালী অকাজ করে বেরায়" ইত্যাদি। তারা এভাবে ভেবে নেয় যে, তাদের তথাকথিত মনের পর্দাই যথেষ্ট, দেহের পর্দার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। অথচ যারা মনের তথাকথিত পর্দার কথা বলে, দেখা যায় তাদের অন্তরের অবস্থাই বরং অধিক নাজেহাল।

এ কথা ঠিক যে অন্তরের মাধ্যমেও জিনা হয়ে থাকে, সেই অর্থে জিনা থেকে বাঁচতে মনের পর্দারও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে দেহের পর্দার প্রাধান্য অধিক। এসব উক্তি-যুক্তি পর্দা থেকে বাঁচার জন্য অজুহাত বৈ কিছু নয়।

৪. নারীদের সতর ও সতর ঢাকার পদ্ধতি

সাধারণত নারীদের দুই পা ও দুই হাতের কব্জি ব্যাতীত পুরো শরীরই সতর (যদিও এই ২টি অঙ্গ পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত)। সতর ঢাকার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ—

◆ পোশাকটি মাত্রাতিরিক্ত পাতলা হতে পারবে না

ইসলামে এমন পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যা পরিধান করা সত্ত্বেও দেহের অঙ্গ দৃশ্যমান থাকে। এ ধরনের পোশাক পরিধানের কারণে মানুষকে বস্ত্রাবৃত হওয়া সত্ত্বেও বিবস্ত্র দেখায়। হাদীসে এ ধরনের পোশাক পরিধান করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। দিহইয়া কালবি ﵁—কে রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি কাপড়খণ্ড দিয়ে বলেছেন, "এটা দুই টুকরা করবে। এক টুকরা দিয়ে একটি জামা সেলাই করবে আর অন্য টুকরা তোমার স্ত্রীকে দিবে এবং জামাটিতে দুটি অংশ করে সেলাই করে নিতে বলবে, যাতে কাপড়ের নিচে চুল দেখা না যায়।"[২]

একবার বনু তামীম গোত্রের কিছু নারী আয়েশা ﵂ এর কাছে আসেন। তাঁরা পাতলা কাপড় পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। এটা দেখে আয়েশা ﵂ বলেন, "যদি তোমরা মু'মিনা হও, তাহলে এগুলো মু'মিনাদের পোশাক নয়। আর যদি তোমরা মু'মিনা না হও, তাহলে এসব কাপড় উপভোগ করো।"[৩]

একবার হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ﵂ পাতলা কাপড়ের ওড়না পরিধান করে আয়েশা ﵂ এর কাছে আসেন। আয়েশা ﵂ সেই কাপড়টি ছিঁড়ে ফেলেন এবং তাঁকে একটি মোটা কাপড়ের ওড়না পরিয়ে দেন।[৪]

হাদীসের ভাষ্যমতে, বহু মানুষ পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও বিবস্ত্র থাকবে, কারণ হলো পাতলা কাপড় পরিধান করা। এ আলোচনা থেকে জানা যায়, ইসলামে শুধু সতর ঢেকে রাখাই ওয়াজিব নয়; বরং সতরের অঙ্গগুলো মানুষের দৃষ্টির আড়াল করে রাখাও অপরিহার্য।

◆ আঁটসাঁট পোশাক হতে পারবে না

অনেকের এমন পোশাক পরিধান করে যা এতটাই চিপা ও সংকীর্ণ হয় যে, এতে সতরের অঙ্গগুলোর আকৃতি-গঠন, উত্থান-পতন দৃশ্যমান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটাও

---

[২] আবু দাউদ- ৪১১৬

[৩] কুরতুবি- ১৪/২৪৪

[৪] মুয়াত্তা ইমাম মালেক- ১৯০৭

নগ্নতা ও বস্ত্রহীনতার নামান্তর। ইসলামী শরিআতে এমন বস্ত্র পরিধান করা নিষিদ্ধ। আর এমন পোশাক পরিহিত কারো দিকে তাকানোও হারাম।

এ বিষয়ে আল্লামা শামী ﵀ লিখেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো নারীর পোশাক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, অতঃপর তার দৈহিক গঠন দেখতে থাকে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। তাই এমন কাপড় পরিহিত কাউকে দেখাও নিষিদ্ধ। কেননা এটি নিছকই কাপড় দেখা নয়; বরং সতরের অঙ্গগুলো দেখার শামিল।"[৫]

আমাদের সমাজে অনেক পুরুষও খুবই আঁটসাঁট প্যান্ট পরিধান করে। এমনকি আধুনিক (!) নারীরাও এরকম প্যান্ট পরে থাকে। উল্লিখিত বিধান অনুসারে এসব প্যান্ট নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পরিধান করা হারাম। একইভাবে চিপা ও চুড়িদার পায়জামা পরিধান করাও নিষিদ্ধ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে নগ্নতা ও অশ্লীলতার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। হাদীসে এসেছে— "নিশ্চয়ই এসব কিয়ামতের আলামত যে, একসময় কৃপণতা ও অশ্লীলতা প্রকাশ পাবে। খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে। আমানতদারকে খেয়ানতকারী মনে করা হবে। নারীদের নতুন নতুন পোশাকের উদ্ভব ঘটবে, যেগুলো পরিধান করে নারীরা বস্ত্রাবৃত হয়েও নগ্ন থাকবে। নিকৃষ্ট লোকেরা অভিজাত লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে।"[৬]

অন্য হাদীসে এসেছে, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "জাহান্নামীদের মধ্যে দুটি দলকে আমি দেখিনি। (কিয়ামতের আগে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) এক দলের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, সেগুলো দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করতে থাকবে। আরেক দল হলো—এমন সব নারী, যারা কাপড় পরিহিত হবে; অথচ তারা প্রকৃত অর্থে নগ্ন থাকবে। তারা পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইবে, নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের চুলের খোঁপা উটের চুট ও কুঁজের মতো একদিকে হেলে থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে।"[৭]

এই হাদীসের শব্দদ্বয়ের কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

- এর অর্থ হতে পারে, সেসব নারী আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত হবে কিন্তু তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে বিরত থাকবে।

---

[৫] রদ্দুল মুহতার- ৬/৩৬৬

[৬] তাবরানি আওসাত- ৭৪৮৯

[৭] মুসলিম শরিফ- ৪/২১৯২

- তারা কাপড় পরিহিত হবে; কিন্তু নেক আমল, পরকালের ফিকর ও আল্লাহর আনুগত্য থেকে নিজেদের দূরে রাখবে।
- সেসব নারী কাপড় পরিধান করেও সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য শরীরের কিছু অংশ খোলা রাখবে। ফলে তারা বস্ত্রাবৃত হয়েও নগ্ন থাকবে।
- তারা বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অলংকারে মোড়ানো থাকবে; কিন্তু তাকওয়ার পোশাক বা মানসিকতায় নগ্ন থাকবে।
- তারা এতই পাতলা কাপড় পরিধান করবে যে দেহের অভ্যন্তরীণ অংশ দেখা যাবে। ফলে কাপড় পরিহিত হয়েও তারা নগ্ন থাকবে।[৮]

◆ পোশাক দ্বারা সতরের অঙ্গগুলো ভালোভাবে ঢেকে ফেলতে হবে

নারীদের সতর কতটুকু তা আগে উল্লিখিত হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে কতিপয় পুরুষদের সামনে সতর ঢেকে রাখতে হয়। এ নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইন শা আল্লাহ।

৫. নারীদের পোশাক যেমন হবে

পোশাকের প্রয়োজনীয়তা মূলত লজ্জাস্থান আবৃত রাখার সাথে সম্পৃক্ত। লজ্জাস্থান আবৃত করাকে মহান আল্লাহ ﷻ পোশাক পরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ﴾

হে বনী-আদম, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং তাক্বওয়ার পোশাক, এটিই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৯]

বোঝা গেল, যেসব পোশাক দিয়ে লজ্জাস্থান আবৃত হয় না ইসলামে সেগুলোকে পোশাকই বলে না; অর্থমূল্য ও সৌন্দর্য প্রকাশে তা যতই অভিজাত হোক না কেন। যেহেতু এর মাধ্যমে পোশাকের আসল উদ্দেশ্যই অর্জিত হচ্ছে না।[১০]

---

[৮] শরহে নববী- ১৭/১৯০-১৯১; মিরকাতুল আফাতীহ- ৬/২৩০২

[৯] সূরা আ'রাফ- ২৬

[১০] তাকমিলায়ে ফাতহিল মুলহিম- ৪/৭৭

নারীদের ক্ষেত্রে সাধারণত ৪টি কারণে কোনো পোশাক নিষিদ্ধ হয়ে থাকে—

◆ **১ম কারণ-** খোদ কাপড়টি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ও নাজায়েয হলে। যেমন—অবৈধ অর্থে কেনা কাপড়, এমন পাতলা কাপড় যার ফলে লজ্জাস্থান প্রকাশ পায়, আঁটসাঁট পোশাক যার ফলে বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থান ও দৈহিক গঠন স্পষ্ট বোঝা যায় ইত্যাদি।

◆ **২য় কারণ-** কাপড়টি গ্রহণ করা বৈধ কিন্তু এর পরিধানের পদ্ধতি নিষিদ্ধ। যেমন—পুরুষের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা হারাম। নারীদের জন্য হাতের কব্জি, পায়ের টাখনু ছাড়া অন্য অঙ্গ প্রদর্শন করা ও মাথার চুল খোলা রাখা নিষিদ্ধ।

◆ **৩য় কারণ-** কাপড়টি গ্রহণ এবং এর পরিধানের পদ্ধতিও সঠিক কিন্তু এই কাপড় পরিধানের উদ্দেশ্য ও নিয়ত বিশুদ্ধ নয়। যেমন—খ্যাতি কিংবা লোক দেখানোর জন্য পোশাক পরিধান করা। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﵁ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় খ্যাতির জন্য পোশাক পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন। [১১]

◆ **৪র্থ কারণ-** নারী পুরুষদের পোশাক ও পুরুষ নারীদের পোশাক পরিধান করা না জায়েয। এতে কোনো ইখতেলাফ নেই। তা ছাড়া নারী-পুরুষ একে অন্যের সাদৃশ্যপূর্ণ, কাফির-মুশরিক ও পাপাচারীদের অনুকরণ করে পোশাক পরিধান করাও হারাম।[১২] আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। [১৩]

আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

[১১] সহীহ মুসলিম- ২০৭৭

[১২] আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ১১/২৬৮

[১৩] সুনান আবু দাউদ- ৪০৯৮

রাসূল ﷺ পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদেরকে এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।[১৪]

৬. পর্দার ক্ষেত্রে নিকাব পরিধানের বিধান

নারীদের জন্য গাইরে মাহরামের সামনে নিকাব পরিধান তথা মুখ ঢাকা ফরয। এ সম্পর্কে ৪ মাযহাবের মুফতা ও মু'তামাদ (গ্রহণযোগ্য) ফতোয়া এটাই। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ﴾

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী ও কন্যা এবং মু'মিনদের অধীনস্থ নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়।[১৫]

এই আয়াতে 'জিলবাব' দ্বারা এমন এক চাদরকে বোঝানো হয়েছে যা মুখমণ্ডল সহ পূর্ণ শরীর আবৃত রাখে। ইমাম কুরতুবী ؒ তার তাফসীরে এটি উল্লেখ করেছেন।[১৬] 'আল্লামা আলূসী ؒ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ؓ-এর বরাত দিয়ে লিখেন, 'জিলবাব' সেই চাদরকে বলে যা মহিলাদের দেহের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছেঁড়ে দেওয়া হয়।[১৭] আল্লামা ইবন হাযম ؒ লিখেন, "আরবী ভাষায় 'জিলবাব' এমন কাপড়কে বলা হয় যা সারা শরীর আচ্ছাদন করে। যে কাপড় সমস্ত শরীর ঢাকে না, সে কাপড়ের ক্ষেত্রে 'জিলবাব' শব্দটির প্রয়োগ সঠিক ও শুদ্ধ নয়।"[১৮]

আরবী অভিধানের বিখ্যাত গ্রন্থ "লিসানুল আরাব"—এ লেখা হয়েছে, 'জিলবাব' ঐ চাদরকে বলা হয় যা নারীরা নিজেদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকার জন্য ব্যবহার করে।[১৯] উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহেলী যুগের বাজে-বেপরোয়া নারীদের থেকে থেকে সম্ভ্রান্ত, ভদ্র নারীগণকে যাতে পার্থক্য করা যায়। তাফসীরে ত্ববারীতে উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে এটি উল্লেখ আছে, এই আয়াতে "চেনা সহজতর হবে" এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে এ ধরনের অনাড়ম্বর লজ্জা নিবারণকারী পোশাকে সজ্জিত দেখে

[১৪] সহীহ বুখারী- ৫৮৮৫

[১৫] সূরা আহযাব- ৫৯

[১৬] কুরতুবী, আল-জামিলি আহকামিল কুরআন- ১৪/২৪৩

[১৭] রুহুল মা'আনী- ২২/৮৮

[১৮] আল-মুহাল্লা- ৩/২১৭

[১৯] লিসানুল 'আরাব- ১/২৭৩

প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী জানবে তারা অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পবিত্র মেয়ে। ভবঘুরে অসতী ও পেশাদার মেয়ে নয়, যার কাছে কোনো অসদাচারী মানুষ নিজের কামনা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। "না কষ্ট দেওয়া হয়" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যেন উত্যক্ত ও জ্বালাতন না করা হয়। এবং তারা যাতে এও বুঝতে পারে এসব মেয়েরা দাসী নয় বরং স্বাধীন নারী।

আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ﷺ ও আবু উবাইদাহ ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤسهن و وجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة

....ليعلم أنهن حرائر

মু'মিনা নারীরা নিজেদের চাদর দ্বারা নিজ নিজ মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে বের হবে। তারা কেবল একটি চোখ খোলা রাখতে পারে। তারা যে স্বাধীনা নারী এর মাধ্যমে এটা বোঝা যাবে। [২০]

আম্মাজান আয়েশা ﷺ–এর এক হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই আয়াত যখন নাযিল হয় তখন সাহাবিয়াতগণ মুখমণ্ডলসহ পূর্ণ শরীর আচ্ছাদন করেছিলেন।[২১] ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী ﷺ সেই হাদীসে فاختمرن – এর ব্যাখ্যায় বলেন,

(فاختمرن) أي غطين وجوههن

তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে রেখেছিলেন। [২২]

এই আয়াত নাযিল হলে আনসারী সাহাবিয়াতগণ এমন চাদর পরিধান করলেন যাতে তাদের সম্পূর্ণ দেহ ঢেকে গিয়েছিল এবং পথ চেনার জন্য তাঁরা এক চোখ খোলা রাখতেন। তাঁরা এমনভাবে পর্দা করতেন যে, মনে হতো তাদের মাথার ওপর কোনো কাক দণ্ডায়মান হয়েছে।[২৩]

হাদীসে নারীদের পূর্ণ দেহকেই 'আওরাহ' তথা ঢেকে রাখা জরুরি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, আর মুখমণ্ডল হচ্ছে দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।[২৪]=

[২০] তাফসীরে বাগাবীতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এটা আনা হয়েছে; ফাতহুল কদীর, শাওকানী- ৭/৩০৭

[২১] সহীহ বুখারী- ৪৭৫৯

[২২] ফাতহুল বারী- ৮/৩৪৫

[২৩] সুনানে আবু দাউদ- ৪১০০-৪১০১; ফাতহুল বারী- ৮/৩৪৫

[২৪] জামে তিরমিযী- ১১৭৩; সহীহ ইবনে খুযাইমাহ- ১৬৮৫; সহীহ ইবনে হিব্বান- ৫৫৯৮ থেকে ৫৫৯৯, হাদীসটির সনদ হাসান এবং কারো কারো মতে সহীহ।

এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে এমন নারীগণ নিকাব এবং মোজা পরিধান করবে না। [২৫]

এই হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে হজ্জ ব্যতীত নিকাব পরিধানের বিধান শরী'আতে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি হজ্জের দিনে মেয়েদের নিকাব পরিধান অবৈধ? আসলে আমাদের সালাফগণ ও মুহাদ্দিসগণ এভাবে এই হাদীসের ব্যাখ্যা করেননি। মূলত হজ্জের সময় সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ। কিন্তু নিকাব নিষিদ্ধ নয়। হজ্জের সময়েও আলগা কাপড় বা সেলাই ছাড়া ঝুলে থাকে এমন কাপড় দিয়ে পুরুষদের থেকে নিজেদের চেহারা লুকাতে হবে। ইমাম আবু বকর ইবনুল আ'রাবী ﵀ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

...وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها

...কেননা নারীদের চেহারা বোরকা দ্বারা ঢাকা ফরয, তবে হজ্জ ব্যতীত। সেক্ষেত্রে মহিলারা কাপড়ের সাথে সেলাই ব্যতীত ঝুলে থাকবে এমন খিমার মুখের ওপর ব্যবহার করবে যেন পুরুষদের থেকে নিজেদের বিরত রাখে এবং পুরুষরাও যাতে তাদের দেখতে না পারে। [২৬]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ ﵀ এর ব্যাখ্যা থেকেও বোঝা যায় যে, হজ্জের সময় নারীরা সেলাই করা কাপড়, নিকাব ও বোরকা পরিধান করবে না তবে আলগা কাপড় বা সেলাই ছাড়াই ঝুলে থাকে এমন কাপড় বা ওড়না দিয়ে নিজের মুখ ঢাকবে।[২৭] ইমাম ইবনে আবেদীন আশ শামী ﵀ তো এক্ষেত্রে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৮] সুতরাং পুরুষের উপস্থিতিতে ইহরাম অবস্থায়ও নারীরা যথাসম্ভব চেহারা ঢাকবে। আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত যে,

فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

---

[২৫] সহীহ বুখারী- ১৭৩৮, ১৭৪১, ১৭৯৪; সুনানে আবু দাউদ- ১৮২৫; জামে তিরমিযী- ৮৩৩; সুনানে নাসায়ী- ২৬৭৩; মুয়াত্তা মালেক- ১/৩২৮; মুসনাদে আহমাদ- ২/১১৯; সুনানে কুবরা বাইহাকী- ৫/৭৪, হাদীস- ৯০৪৪ থেকে ৯০৪৬

[২৬] আ'রিদ্বাতুল আহওয়াযী ৪/৫৬

[২৭] বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ- ২/৬৬৪-৬৫

[২৮] হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন- ৩/২৬১, কিতাবুল হাজ্জ

হজ্জের সময় পুরুষেরা তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নারীরা জিলবাব দিয়ে মুখ ঢেকে নিত এরপর তারা চলে গেলে আবার মুখ খুলে দিত।[২৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় নিকাব পরিধান ছেড়ে দেয়ার মতো কোন আমল নয়। এমনকি নিকাব পরিধান ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ৪ মাযহাবেরই নির্ভরযোগ্য ফতোয়া রয়েছে।[৩০]

❖ নারীদের ক্ষেত্রে গাইরে মাহরামদের সামনে মুখ খোলা রাখার বিষয়ে আসমা বিনতে আবু বাকর ﷺ এর হাদীসের তাহক্বীক-

নারীদের মুখ খোলার রাখার পক্ষে যখন মত দেওয়া হয় তখন দলিল হিসেবে আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ—এর একটি হাদীস প্রায়ই পেশ করা হয়। কিন্তু এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে পূর্ববর্তীদের সমালোচনা রয়েছে। তাই এর তাহক্বীক আমাদের সকলের জেনে রাখা প্রয়োজন।

❖ হাদীস-

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: "يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا"- وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

একদিন আসমা বিনতু আবু বকর ﷺ পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ—এর নিকট গেলেন। এতে তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন— "হে আসমা! নারীরা যখন বালেগা হয়, তখন তার শরীরের কোনো অঙ্গ দৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, তবে কেবল এটা এবং এটা ব্যাতীত।" (রাবী বলেন) এ বলে তিনি তাঁর মুখ এবং তাঁর দু-হাতের কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৩১]

❖ **খুলাসাতুল হুকুম-** সার্বিক বিবেচনায় এই হাদীসটি মুহাদ্দিসদের নিকট সহীহ নয়। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া যাবে না।[৩২]

---

[২৯] সুনানে আবু দাউদ- ১৮৩৩; মুসনাদে আহমাদ- ২৩৫০১, হাদীসটির মান হাসান। এর অনেক শাওয়াহেদ আছে।

[৩০] মাজমাউল আনহুর শারহু মুলতাক্বাল আবহুর- ১/৮১; আল মাবসূত্ব- ১০/১৫২; বাযলুল মাজহুদ- ১৬/৪৩১; যাদুল মুয়াসসার আলা ইলমিত তাফসীর- ৬/৩১; আল ফুরু- ১/৬০১; আল ফাতাওয়া- ১৯২; আওনুল মাবুদ- ১১/১৬২; আল ইকলীল- ১/৪১

[৩১] সুনানে আবু দাউদ- ৪১০৪; সুনানে বাইহাক্বী- ২/২২৬

[৩২] খুলাসাতুল হুকুম বলতে বোঝানো হয়েছে হুকুমের সারসংক্ষেপ

◈ সনদ-

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي و مؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد عن

......سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها

◈তাহক্বীক-

এই হাদীসের সনদ[৩৩] ও মতন[৩৪] উভয়ই সমালোচিত।

▸ স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ ﷺ এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর একে মুরসাল[৩৫] বলেন। কেননা ইয়াকূব ইবনু দুরাইক আম্মাজান আয়েশা ﷺ কে পাননি, সুতরাং তার থেকে বিনা ওয়াসেতা বা মাধ্যমে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

▸ এই বর্ণনায় ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম রয়েছে। ওয়ালিদ ইবনু মুসলিমের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তার জরাহ[৩৬] ও তা'দীল[৩৭] উভয়ই পাওয়া যায়, কিন্তু তার জরাহ মুফাসসার[৩৮] হওয়ায় অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ তাকে মাজরুহ[৩৯] হিসেবেই গণ্য করেছেন। নিম্নে তার তা'দীল উল্লেখ ব্যাতীতই তার জরাহ-এর কিছু নমুনা পেশ করা হচ্ছে।

- তার থেকে বর্ননাকারী আবু মুসহির ﷺ বলেন— "ওয়ালিদ ইবনু আবীস সাফার থেকে আওযায়ীর হাদীস গ্রহণ করতেন না এবং তিনি মিথ্যুক ছিলেন। ওয়ালিদ (ইবনু আবীস সাফার নাম উল্লেখ ব্যতীতই) আওযায়ী থেকে বর্ণনা করার দাবি করতেন... কখনও কখনও ওয়ালিদ মিথ্যুক রাবীদের থেকে তাদলিস[৪০] করে হাদীস বর্ণনা করতেন।"[৪১]

---

[৩৩] রাসূল ﷺ থেকে হাদীসের গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত বর্ণনাকারীর যেই ক্রমধারা অনুসরণ করে হাদীসের মূল কথাটুকু পৌঁছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর ক্রমানুযায়ী সাজানো থাকে।

[৩৪] হাদীসের মূল ভাষ্যটুকুকে মতন বলে।

[৩৫] যে হাদীসের সনদে শেষের দিকে এসে ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি অর্থাৎ যে হাদীসে সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে কোনো তাবেঈ সরাসরি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

[৩৬] হাদীসের পরিভাষায় জরাহ বলতে বোঝায় রাবীর জীবনী নিয়ে সমালোচনা করা।

[৩৭] রাবী বা বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণতা ও গ্রহণযোগ্যতা।

[৩৮] সুস্পষ্ট।

[৩৯] সমালোচিত।

[৪০] অর্থাৎ রাবীদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে উল্লেখ না করে গোপন করা।

[৪১] সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৯/২১২

এই বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম যাহাবী দারাকুতনী থেকেও একই দোষ বর্ণনা করেছেন।

- মুয়াম্মাল ইবনু ইহাব ﷺ আবু মুসহির ﷺ থেকে বর্ণনা করেন—

كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم

ওয়ালিদ বিন মুসলিম আওযায়ী মিথ্যুক রাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করত অতঃপর সেগুলো তাদের থেকে তাদলীস করত। [৪২]

- আবু বকর আল মারওয়াযী ﷺ বলেন,

لأحمد بن حَنبَل فِي الْوَلِيد؟ قال: هُوَ كَثِير الخطأ

আমি ইমাম আহমাদকে ইবনে হাম্বলকে ওয়ালিদের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বললেন, (হাদীস বর্ণনায়) তার অনেক ত্রুটি রয়েছে। [৪৩]

এ বর্ণনায় বাশীর ইবনু সায়ীদ আল আযদী আল বাসরী আছেন, যাকে আবু আব্দুর রহমানও বলা হয়। তার ব্যাপারেও মুহাদ্দিসগণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে কিন্তু তার তা'দীল থাকলেও তিনি উপরোক্ত রাবী[88]

ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম থেকে অধিকতর মাজরুহ। নিচে তার তা'দীল উল্লেখ ব্যতীতই তার জরাহ এর কিছু নমুনা দেওয়া হলো।

- আবু মুসহির ﷺ বলেন,

لم يكن في بلدنا أحد أحفظ منه، وهو منكر الحديث

আমাদের এই দেশে হাদীস মুখস্থের ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষায় অধিকতর হাফেজ আর কেউ ছিলেন না, অথচ তিনি মুনকারুল [৪৫] *হাদীস!* [৪৬]

---

[৪২] তাহযীবুল কামাল- ৫৪৪৭

[৪৩] প্রাগুক্ত, এছাড়াও ওয়ালিদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুন: তাহযীবুত তাহযীব- ১১/১৩৫; তারীখু মাদীনাতি দিমাশক- ৩৪/৬০২-৬০৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী।

[88] বর্ণনাকারী।

[৪৫] যিনি অগ্রহণযোগ্য রাবীদের থেকে একক সূত্রে দুর্বল বা অপ্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনা করে থাকে।

[৪৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৭/৩০৫

- ইমাম বুখারী ﷺ বলেন,

يتكلمون في حفظه

তার হিফজ শক্তি নিয়ে মুহাদ্দিসগণ কালাম[৪৭] করেছেন।[৪৮]

- ইমাম ইবনু মায়ীন ও ইমাম নাসায়ী ﷺ তাকে 'দ্বঈফ'[৪৯] বলেছেন।
- হাদীসটিকে শাইখ আলবানী ﷺ শাওয়াহেদ[৫০] এর ভিত্তিতে সহীহ বললেও এটি সঠিক নয়। প্রথমত, উসূলে হাদীস[৫১] মোতাবেক শাওয়াহেদের ভিত্তিতে যে শর্তে সনদ হাসান বা সহীহ[৫২] হয় সেই শর্ত এখানে বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণই এর সনদ ও মতনের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে একে 'দ্বঈফ' বলেছেন।

▶ এই হাদীসের মতনেও আলিমগণ একটি আপত্তি করেছেন। আর তা হলো, আবু বকর ﷺ এর মেয়ে আসমা ﷺ একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের নারী ও একজন সাহাবিয়াত হয়ে কীভাবে বালেগা হওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ—এর নিকট পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় আসতে পারেন যা দেখে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখ ফিরিয়ে নেবেন!? অথচ এ ঘটনা যখন ঘটেছে তখন আসমা ﷺ এর বয়স অন্তত সাতাশের উপরে ছিল। কারণ মাদীনায় হিজরতের বছর তাঁর বয়স ছিল সাতাশ। এছাড়া স্বয়ং আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ অন্যত্র বলেন– "আমরা পুরুষদের থেকে আমাদের চেহারা আবৃত রাখতাম।"[৫৩]

পর্দার ব্যাপারে ওহী নাযিলের সময়কাল বিবেচনা করে আলিমগণ বলে থাকেন যে, যদি এ হাদীসকে সহীহ হিসেবেও ধরে নেওয়া হয় তাহলে এটা বুঝতে হবে যে, এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা ছিল।[৫৪]

---

[৪৭] হাদীস শাস্ত্রে রাবীর 'কালাম' করা বলতে রাবীর সমালোচনা করা বোঝায়।

[৪৮] প্রাগুক্ত।

[৪৯] যে হাদীস ত্রুটিপূর্ণ তাকে দ্বঈফ হাদীস বলে।

[৫০] যদি দুটি সমভাষ্য হাদীসের মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

[৫১] হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি।

[৫২] যেই হাদীসের সনদে প্রত্যেকজন রাবীরই পূর্ণ আদালত ও প্রখর স্মরণশক্তি রয়েছে এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

[৫৩] মুস্তাদরাক হাকিম- ১৬৬৪

[৫৪] আওদাতুল হিজাব- ৩/৩৩৬

মূল কথা হচ্ছে, উক্ত হাদীসটির মতন 'নাকারাত'[৫৫] দোষে এবং সনদ 'ইযতিরাব'[৫৬] দোষে দুষ্ট।[৫৭]

৭. পর্দার ক্ষেত্রে নারীদের হাত-পা ঢেকে রাখার বিধান

নারীদের জন্য মূলত বাহিরে বের হওয়ার সময় দুই হাত ও দুই পায়ে মোজা পরিধান করা কিংবা দুই হাত-পা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব। কিন্তু ফিতনার আশঙ্কা থাকলে তা ওয়াজিব। এটিই ৪ মাযহাবের সিদ্ধান্ত।[৫৮] উল্লেখ্য যে, এই জামানা মোটেও ফিতনামুক্ত নয় আজ থেকে বহুকাল পূর্বে আমাদের সালাফগণ তাদের সেই জামানাকে ফিতনাময় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সেদিক বিবেচনায় এই জামানা তো তাদের তুলনায় অধিকতর ফিতনাময়। নারীর হাত-পাও তার আওরাহর অংশ। আল্লামা ইবনে কুদামাহ ﷺ আল মুকনিতে ইমাম মারদাউই ﷺ থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, "*স্বাধীন নারী পুরোপুরি আওরাহ, এমনকি তার নখ এবং চুলও।*"[৫৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ বলেন– "সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে ইহরাম অবস্থায় নারীদের জন্য দস্তানা, মোজা ও নিকাব পরিধানের অনুমতি নেই। এটাই ইঙ্গিত বহন করে যে, ইহরামে না থাকা অবস্থায় নিকাব ও হাত-পা মোজা (পর্দার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে) পরিধেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে সাহাবিয়াতগণ তাদের মুখ এবং হাত ঢেকে রাখতেন।"[৬০]

সুতরাং নারীদেরকে গাইরে মাহরাম পুরুষদের সামনে নিজের হাত-পা ঢাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে তাকে হাত-পা মোজা দিয়েই ঢাকতে হবে। সে তার পোশাকের কিছু অংশ হাতের ওপর ঝুলিয়ে দিতে পারে এবং যদি তার মাঝে মাঝে মোজা পরার প্রয়োজন হয় এবং এটি তার পক্ষে কিছুটা কঠিন হয় তাহলে সে সহ্য করবে এবং এর জন্য আল্লাহ ﷻ-এর নিকট প্রতিদান আশা করবে।

রাসূল ﷺ এর সময়ে নারীগণ তাঁদের পোশাক এমনভাবে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতেন যাতে পদযুগল প্রকাশিত না হয়ে যায়। এমনকি নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়ার কারণে

---

[৫৫] হাদীস শাস্ত্রে 'নাকারাত' সমালোচনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাবীর বর্ণিত হাদীসে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে এটি বোঝায়।

[৫৬] একই রাবী থেকে যখন সনদে বা মতনে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় তখন সেই বর্ণনাকে 'ইযতিরাব' বলা হয়।

[৫৭] কিতাবুল ইলাল, ইবনে আবী হাতিম- ১৪৬৩; আলকামিল, ইবনে আদী- ৩/১২০৯; আন নাযার ফী আহকামিন নাযার, ইবনুল কাত্তান- ১৬৭ ও ১৬৮; তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ইবনে কাছীর- ৩/৩১২; আলজাওহারুন নাকী, (সুনানে কুবরা বাইহাকীর সাথে মুদ্রিত)- ৭/৮৬; আননাকদুল বান্না,আবু মুয়ায তারিক ইবনে আউয়ুল্লাহ, পৃষ্ঠা- ২৮ থেকে ৪০

[৫৮] যাদুল মুয়াসসার আলা ইলমিত তাফসীর- ৬/৩১, আল ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী- ২/৪৫১

[৫৯] আল-ইনসাফ- ১/৪৫২

[৬০] মাজমূ 'আল-ফাতাওয়া- ১৫/৩৭১-৩৭২

কাপড়ে মাটি থেকে ময়লা লেগে যেত। এক নারী সেই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাস করেন। তখন তিনি বলেন, "*পরবর্তীতে যা (কাপড়ে) লাগে তা সেটাকে পবিত্র করে দেয়।*"[৬১]

৮. বর্তমান ট্রেডিশনাল হিজাব

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, কাপড় বা ওড়না মাথায় কেবল উঁচু করে পেঁচিয়ে একে বলা হয় হিজাব। অথচ মুখ থাকে খোলা, হাত পা থাকে অনাবৃত, গায়ে থাকে চুমকি-পুতি খচিত ও চমকপ্রদ পোশাক যা আঁটসাঁট তাই অঙ্গের ভাজগুলো বোঝা যায়। পূর্বে প্রদত্ত মাসআলাগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এগুলোকে হিজাব বলে না। হিজাবকে ট্রেডিশন হিসেবে নেওয়া হয়েছে কেবল। শুধু মাথার চুল ঢেকে নিলেই পর্দা হয়ে যায় এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই।

৯. নারীর মাহরাম ও বিস্তারিত মাহরাম চার্ট

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনত রাখতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এবং তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে, যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তারা যেন তাদের ঘাড় ও বুক মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [৬২]

---

[৬১] তিরমিযী- ১৪৩, আবু দাউদ- ৩৮৩, ইবনু মাজাহ- ৫৩১

[৬২] সূরা নুর- ৩১

◆ যাদের সামনে পর্দা করতে হবে না বা পর্দার ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে-

১. স্বামী- স্বামীকে দেখা দেওয়া, সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, তার সাথে ঘনিষ্ঠ সময় কাটানো জায়েয এবং সওয়াবের কাজ। তার সামনে কোনো প্রকার পর্দা করতে হবে না।

২. পিতা, দাদা, নানা ও তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ- আপন পিতা, সৎ পিতা এবং দুধ পিতা মাহরাম। অন্য যেকোনো প্রকারের পিতা যেমন: ধর্মীয় পিতা, পালক পিতা ও উকিল পিতা মাহরাম নন। আর আপন দাদা বা নানা এবং দাদা-নানার ও দাদী-নানীর আপন ভাই, দুধ ভাই, সৎ ভাই মাহরাম। তেমনি দাদা-দাদী ও নানা-নানীর পিতা, তাদের নানা-দাদা... এভাবে যত উপরেই যাক, সবাই মাহরাম।

৩. শ্বশুর, আপন দাদা-নানা শ্বশুর এবং তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ- আপন শ্বশুর ও দুধ শ্বশুর মাহরাম। তবে সৎ শ্বশুর যেমন- শাশুড়ির প্রাক্তন বা পরবর্তী স্বামী মাহরাম নন। ঠিক তেমনি আপন দাদা বা নানা শ্বশুর ও দুধ দাদা বা নানা শ্বশুর মাহরাম। সৎ দাদা বা নানা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, চাচা শ্বশুর, খালু শ্বশুর ও ফুফা শ্বশুর কেউই মাহরাম নন।

৪. পুত্র, কন্যার স্বামী, পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র- আপন পুত্র, দুধ পুত্র ও স্বামীর অন্য স্ত্রী বা পূর্বের স্ত্রীর গর্ভে স্বামীর ঔরসজাত পুত্র মাহরাম। কিন্তু পালক পুত্র, ধর্মীয় পুত্র ও সতীনের পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত পুত্র মাহরাম নন। অপরদিকে আপন পুত্রের পুত্র বা আপন কন্যার পুত্র, সৎ পুত্রের পুত্র বা সৎ কন্যার পুত্র, দুধ পুত্রের পুত্র বা দুধ কন্যার পুত্র ও তাদের অধস্তন পুরুষরাও মাহরামভুক্ত। কিন্তু তাদের পালক পুত্র ও ধর্মীয় পুত্র মাহরাম নয়। অনুরূপ আপন কন্যার কন্যার স্বামী এবং দুধ কন্যার কন্যার স্বামী এভাবে যত নিচের দিকে যাক সবাই মাহরামভুক্ত। তবে সৎ কন্যার স্বামী, অনুরূপ অধস্তন কেউ মাহরাম নয়।

৫. ভাই- আপন ভাই, সৎ ভাই ও দুধ ভাই অর্থাৎ আপন মায়ের দুধ পুত্র, দুধ মায়ের আপন, সৎ, দুধ পুত্র মাহরাম। সৎ বাবা অথবা সৎ মায়ের অন্য ঘরের পুত্র মাহরাম না। এ ছাড়া চাচাতো, খালাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাই, দুলাভাই, দেবর ও ভাসুর মাহরাম নয়।

৬. ভাতিজা- আপন ভাইয়ের পুত্র, সৎ ভাইয়ের পুত্র, দুধ ভাইয়ের পুত্র মাহরাম।

৭. ভাগিনা- আপন বোনের পুত্র, সৎ বোনের পুত্র, দুধ বোনের পুত্র মাহরাম।

৮. চাচা- আপন চাচা, সৎ চাচা ও দুধ চাচা অর্থাৎ আপন পিতার দুধ ভাই, দুধ পিতার আপন ভাই, আপন বাবার সৎ ভাই মাহরাম। কিন্তু ফুফা, সৎ বাবার ভাই মাহরাম না।

৯. মামা- আপন মামা, সৎ মামা ও দুধ মামা অর্থাৎ আপন মায়ের দুধ ভাই, দুধ মায়ের আপন ভাই, আপন মায়ের সৎ ভাই মাহরাম। তবে খালু, সৎ মায়ের ভাই মাহরাম নয়।

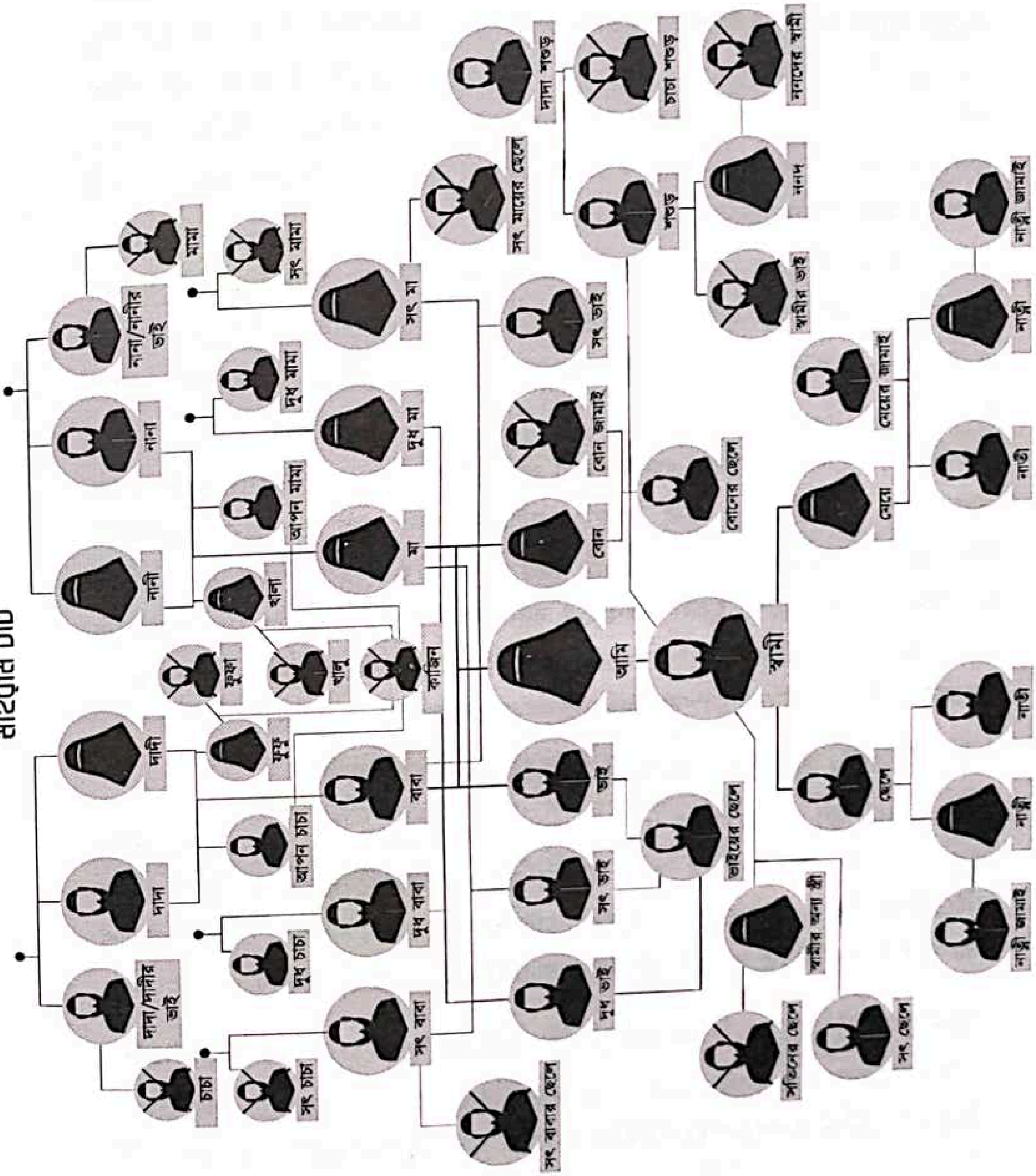
১০. নাবালক- এমন বালক যার মাঝে নারীদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই।

১১. অন্যান্য নারী- নারীদের সামনে নারীকে পর্দা করতে হবে না। তবে কাফির ও ফাসিক নারীদের সামনে শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।[৬৩]

উপরে বর্ণিত মাহরামের তালিকা ব্যতীত পৃথিবীর সকল পুরুষ নারীদের জন্য এবং সকল নারী পুরুষদের জন্য গাইরে মাহরাম।

[৬৩] সূরা নূর- ৩১; সহীহ বুখারী- ২৬৪৫; সুনানে তিরমিযী- ১১৪৬; সহীহ বুখারী শরহে কুসতুল্লানিসহ- ৯/১৫০; ফাতহুল বারী- ৯/১৩৮; সহীহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবি- ১০/২২; তুহফাতুল আহওয়াযী- ৪/২৫৪; তাফসীরে রাযী- ২৩/২০৬; তাফসীরে কুরতুবী- ১২/২৩২, ২৩৩; তাফসীরে আলূসী- ১৮/১৪৩; ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসিদ আল-কুরআন- ৬/৩৫২; আহকামুল কুরআন- ৩/৩১৭; তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন- ২/২৫৬-৩৬১ ; তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন- ৬/৪০১-৪০৫; তাফসীরে মাযহারী- ২/২৫৪-২৬১ ও ৬/৪৯৭-৫০২; শরহু মুসলিম, নববী- ৯/১০৫; উমদাতুল কারী- ৭/১২৮; বাদায়েউস সানায়ে- ২/৩০০; রদ্দুল মুহতার- ২/৪৬৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/২১৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক- ২/২৪৩; তাফসীরে রুহুল মাআনী- ৪/২৫২; আলবাহরুর রায়েক- ৩/৯৩

মাহরাম চার্ট


দাদা/দাদীর ভাই
দাদা
দাদী
নানী
নানা
নানা/নানীর ভাই
চাচা
মামা
ফুফা
খালা
ফুফু
সৎ চাচা
দুধ চাচা
আপন চাচা
খালু
আপন মামা
দুধ মামা
সৎ মামা
সৎ বাবা
দুধ বাবা
বাবা
কাজিন
মা
দুধ মা
সৎ মা
সৎ বাবার ছেলে
সৎ মায়ের ছেলে
দাদা শশুড়
দুধ ভাই
সৎ ভাই
ভাই
আমি
বোন
বোন জামাই
সৎ ভাই
শশুড়
চাচা শশুড়
ভাইয়ের ছেলে
স্বামী
বোনের ছেলে
সতিনের ছেলে
স্বামীর অন্য স্ত্রী
স্বামীর ভাই
ননদ
ননদের স্বামী
সৎ ছেলে
ছেলে
মেয়ে
মেয়ের জামাই
নাত্নী জামাই
নাত্নী
নাতী
নাতী
নাত্নী
নাত্নী জামাই

১০. নাবালক ছেলেদের সামনে পর্দা

পূর্ণ বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত ছেলেদের সামনে অনেক নারীই পর্দা করে না। এমনকি তাদের সামনে শরীরের বিশেষ অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখারও প্রয়োজন মনে করা হয় না। অথচ কুরআন মাজীদে সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে পর্দার হুকুম থেকে মুক্ত ব্যক্তিদের আলোচনা এসেছে, যেখানে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন, "তারা যেন...যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"

উক্ত আয়াতে সেসকল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের বোঝানো হয়েছে, যারা এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি সেই সাথে নারীদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর; তাদেরকে পর্দার হুকুমের আওতামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যে বালক নারীদের এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে বয়সের দিক থেকে সাবালকত্বে না পৌঁছলেও তার সামনে নারীদের পর্দা করা ওয়াজিব। ফকীহগণ সাবালকত্বের এ হুকুম অবস্থাভেদে ১০ বছর থেকেও শুরু হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বালেগ হয়নি কিংবা ১৫ বছর হয়নি বলেই এ বয়সের ছেলেদেরকে গাইরে মাহরাম নারীদের মহলে যেতে দেওয়া অন্যায়। তদ্রূপ নারীদের জন্যও এ বয়সের ছেলেদের সামনে বেপর্দা চলাফেরা করা গুনাহ।[৬৪]

১১. ফাসিকা ও অমুসলিম নারীদের সামনে পর্দা

ফাসিকা (পাপিষ্ঠা) ও অমুসলিম নারীর সামনে চেহারা ঢেকে পর্দা করা জরুরি নয়। কিন্তু এই ভয় থেকে যায় যে তারা গাইরে মাহরাম পুরুষদের সামনে উক্ত নারীর শরীরের আকৃতি ও সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। তাই তাদের সামনে শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ করা ও শরীরের আবৃত অংশ খোলা যাবে না। হযরত উমার ؓ বলেন,

فإنه لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر الي عورتها إلا أهل الملة

যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে তার জন্য স্বজাতি ছাড়া অন্য কারো (বিধর্মী মহিলার) সম্মুখে শরীরের আবৃত অংশ প্রকাশ করা জায়েয নয়।[৬৫]

---

[৬৪] মাআরিফুল কুরআন- ৬/৪০৫, তাফসীরে কুরতুবী- ১২/১৫৭, তাফসীরে মাজহারী- ৬/৫০১, আল মুফাসসাল ফী আহকামিন নিসা- ৩/১৭৬-১৭৭, আহসানুল ফাতাওয়া- ৩৬-৪০

[৬৫] সুনানে বাইহাক্বী- ৭/৯৫; তাফসীরে কুরত্ববী- ১২/২১৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর- ৩/৪৫৫; সুনানে সায়ীদ ইবনে মানসুর-এর বরাতে।

তবে জরুরত ব্যতীত অমুসলিম মেয়েদের সামনেও পর্দা করা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী মাযহাব ও ইমাম আহমাদ থেকে সুস্পষ্ট মত রয়েছে।[৬৬]

১২. নেককার মুসলিমাহ নারী ও মাহরাম পুরুষদের সামনে মহিলাদের আওরাহ

একজন মুসলিমাহ নারীর জন্য অন্যান্য দ্বীনদার মুসলিমাহ নারীদের সামনে অত্যাবশকীয় আওরাহ হচ্ছে নাভীর নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত। এমনকি একে অপরের পিঠ ও পেট উভয়ই দেখতে পারবে। এই ব্যাপারে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের রাজেহ (প্রণিধানযোগ্য) মত এটিই।

এবং ফাসিকা (পাপিষ্ঠা), অমুসলিম নারী ও মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীগণ সর্বোচ্চ মাথা, চেহারা, দুই হাত, দুই পা, ঘাড় ইত্যাদি উন্মুক্ত রাখতে পারবে। বাকি শরীরের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না এবং শরীরের আবৃত অংশ খুলবে না।[৬৭]

বিশিষ্ট তাবে'য়ী হাসান বসরী ﷺ বলেন, "নিজ ভাইয়ের সামনেও নারীদের ওড়না ছাড়া থাকা উচিত নয়।"[৬৮]

প্রখ্যাত তাবে'য়ী আতা' ইবনে আবী রাবাহ ﷺ বলেছেন, "মাহরাম পুরুষের সামনে মেয়েদের মাথা ঢেকে রাখাই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। অবশ্য মাহরাম তা দেখে ফেললে গুনাহ হবে না।"[৬৯]

১৩. গাইরে মাহরামদের সাথে কথা বলার বিধান

পর্দার আড়াল থেকে বেগানা পুরুষের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েয। তবে বিনা প্রয়োজনে গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলা যাবে না। তদ্রূপ জরুরতবশত কথা বললেও যদি গুনাহে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে সেক্ষেত্রেও তাদের সাথে

---

[৬৬] ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ৫/৩২৭; রদ্দুল মুহতার- ৬/৩৭১; মাজমাউল আনহুর- ২/৫৩৯; মুনতাক্বাল ইয়ানবূ' (হাশিয়াতুস সুয়ূত্বী আলার রউদ্ব)- ৫/৩৭১; হাশিয়াতুদ দাসূক্বী- ১/২১৩; ফাতহুল ক্বাদীর, শাওকানী- ৪/৩২; আসনাল মাত্বালিব- ৩/১১১; বুলগাতুস সালেক- ১/১৯২; মুগনীল মুহতাজ- ৩/১৩১; আল মুগনী- ৭/৪৬৪; তাফসীরে ইবনে কাসীর- ২/৬০১-৬০২; তাফসীরে কুরত্ববী- ১২/২১৫-২১৬; আহকামুল কুরআন, জাসসাস- ৩/৩১৮; তাফসীরে তাবারী- ১৮/৯৫; সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়

[৬৭] সহীহ মুসলিম- ৩৩৮; আল মাবসূত্ব, সারাখসী- ১০/১৪৮, ১০/২৫৪; বাহরুর রায়েক্ব- ৮/২১৯; হাশিয়াতুদ দাসূক্বী- ১/২১৫; বুলগাতুস সালেক- ১/১৯৩; মাওয়াহেবুল খলীল- ২/১৮০; নেহায়াতুল মুহতাজ- ৬/১৯৫; আল মাজমূ শরহুল মুহাযযাব- ৩/১৬৭; রওদাতুত ত্বলেবীন- ৭/২১; আর রওদুল মুরবি'- ১/৩৩২; মুগনীল মুহতাজ- ৪/২১৪; আল ইনসাফ- ৮/২০; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েলে ইবনু উসাইমীন- ১২/২৬৮; আল মাওসূয়াতু ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ৪০/৩৫৮,৩৫৯

[৬৮] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা- ৯/৩৭৩

[৬৯] প্রাগুক্ত, কিতাবুল আসল- ৩/৪৮; বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৯১

কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর প্রয়োজনবশত কথা বলার ক্ষেত্রেও কোমলতা পরিহার করে কথা বলতে হবে।[৭০]

কুরআন মাজীদে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন,

﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় পাও তবে আকর্ষণমূলক কোমল ভঙ্গিতে কথা বলো না। কেননা যাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তারা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে ও (তাদের অন্তরে) লালসা-বাসন জাগবে। বরং তোমরা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বল।[৭১]

ইমাম ত্বারী ﵀ তার তাফসীরে (২০/২৫৮) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن

পুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলবে না যেভাবে কথা বললে লম্পট ও দুশ্চরিত্র প্রকৃতির পুরুষেরা তোমাদেরকে কামনা করে।

হযরত আয়েশা ﵂ এর নিকট মাসআলা বা হাদীসের প্রয়োজনে অন্যান্য সাহাবিগণ আসলে, তিনি মুখের ওপর হাত রেখে কণ্ঠ বিকৃত করে পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলতেন যেন কারো অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ না হয়।[৭২]

ইমাম কুরতুবী ﵀ তার তাফসীরে (১৪/১৭৭) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه، مثل كلام المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا

পুরুষদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে আরবের মহিলাদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা মিষ্টি ও নরম আওয়াজে কথা বলত যেমনটি বাজে ও বাজারী মেয়েরা বলে থাকে! তাই আল্লাহ তাদের (মুমিনাদের) এমনভাবে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

একইভাবে পুরুষের জন্যও বিনা প্রয়োজনে কোনো বেগানা নারীর সাথে কথা বলা নিষেধ।

---

[৭০] সূরা আহযাব- ৩২,৫৩; তাফসীরে ইবনে কাসীর- ৩/৭৬৮; সহীহ মুসলিম- ২০৩৮; আহকামুল কুরআন, জাসসাস- ৩/৩৫৯; রদ্দুল মুহতার- ১/৪০৬

[৭১] সূরা আহযাব- ৩২

[৭২] তাফসীরে কুরতুবী- ১৪/৬৫৮

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

আর তোমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। [৭৩]

ইমাম কুরতুবী রহ. উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেন,

في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة

উক্ত আয়াতে আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ—এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছেন। অন্যান্য সকল মু'মিনা নারীগণও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। [৭৪]

কিন্তু গুনাহে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে এটিও জায়েয নেই। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

চোখের জিনা হল (হারাম) দৃষ্টিপাত। কর্ণদ্বয়ের জিনা হলো, (গাইরে মাহরামের যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনা। জিহবার জিনা হলো, (গাইরে মাহরামের সাথে সুড়সুড়িমূলক) কথোপকথন। হাতের জিনা হলো, (গাইরে মাহরামকে) ধরা বা স্পর্শকরণ। পায়ের জিনা হলো, (খারাপ উদ্দেশ্যে) চলা। অন্তর চায় ও কামনা করে এবং লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবে রূপ দেয় (যদি জিনা করে) অথবা মিথ্যায় পরিণত করে (যদি অন্তরের চাওয়া অনুপাতে জিনা না করে)। [৭৫]

---

[৭৩] সূরা আহযাব- ৫৩

[৭৪] তাফসীরে কুরতুবী- ১৪/২২৭

[৭৫] সহীহ মুসলিম- ২৬৫৭, মুসনাদে আহমাদ- ৮৯৩২

১৪. ক্লাসমেট, ছেলে বন্ধু, কাজিন, বিয়ের কথা চলছে/বিয়ে পাকা হয়ে গেছে এমন ছেলে বা বয়ফ্রেন্ড

উপরের মাসআলাসমূহ থেকে আমরা জানতে পারছি যে, বিনা প্রয়োজনে বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলা নাজায়েয। এমনকি প্রয়োজনেও নাজায়েয যদি ফিতনার সম্ভাবনা থাকে এবং এই বিধান সুস্পষ্ট। দ্বীন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান যে রাখে সেও এই বিষয়ে অবগত। তবুও আফসোস, অনেক পর্দানশীল বোনদের যত্রতত্র দেখা যায় গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে বেশ অন্তরঙ্গতার সাথেচলাফেরা করছে।

◈ ফ্রি মিক্সিং—এর যুগে এসে বাবা-মাকে বুঝিয়ে বে-দ্বীনি শিক্ষার পরিবেশ থেকে সরে আসতে পারে না অনেকেই। ফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনেককেই ভর্তি হতে হয় এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কো-এডুকেশনের নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছে এই বিষাক্ত সমাজ। তাই এমনটা অনেক সময়ই দেখা যায় যে, কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া বোনেরা পর্দাও করছে, সেই সাথে পুরুষ ক্লাসমেট/ছেলে বন্ধুদের সাথে সাধারণ কথা-বার্তাও চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই একটা সময় ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এরপর দেখা যায় 'ছেলে বন্ধু' নির্দ্বিধায় শরীরেএর স্বাধারণ অঙ্গে হাত পর্যন্ত দিয়ে দেয়। তারপর সে হয়তো হারাম সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত বা আহ্বানও করে বসতে পারে। অনেকেই ভাবতে পারে হয়তো তার ছেলে বন্ধুটি তার মতোই সকল বিষয়ে সুধারণা রাখে, বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে। অথচ একজন পুরুষের চিন্তাধারা একজন নারীর মতো সহজ-সরল নয়। সেই পুরুষের মনে কি ভয়ানক চিন্তার জট বেঁধে থাকতে পারে তা অকল্পনীয়। আর সেই পুরুষ চাইবে তার কামনাকে বাস্তবে রূপ দিতে। সত্যিই যদি সেই পুরুষ তার কামনাকে বাস্তবে রূপান্তর করতে পারে তাহলে সে হয়তো সাময়িক প্রশান্তি লাভ করবে, কিন্তু একজন নারী হারাবে তার সম্ভ্রম। খেয়াল করলে বোঝা যায় ধ্বংসের শুরুগুলো হয় সেই প্রাথমিক কথা-বার্তা থেকেই। তাই এই বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। যারা কলেজ-ভার্সিটিতে এখনো উঠেনি তারা প্রথমত চেষ্টা করবে বাবা-মাকে বোঝাতে, কো-এডুকেশন রয়েছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে যাতে ভর্তি হতে বাধ্য না করে। এরপরও যদি বাবা-মা না বুঝে তাহলে আগ থেকেই এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর থেকে কোনোমতেই কোনো পুরুষ ক্লাসমেট যাতে কথা বলার কোনো সুযোগ না পায়। যদি কেউ প্রথমবারের মতো কথা বলতে আসে তাহলে তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে উপেক্ষা করলেই পরবর্তীতে সে আর কথা বলার জন্য আগাবে না আশা করা যায়। খুব প্রয়োজন হলেও নারী সহপাঠিদের কাছ থেকেই সাহায্য নিতে হবে। পুরুষ সহপাঠির থেকে সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবাও যাবে না। আর যারা পর্দা করা সত্ত্বেও ইতিমধ্যে ছেলে বন্ধুদের

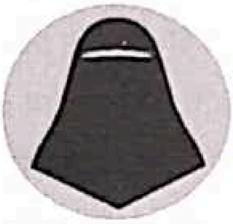
সাথে মিশে গিয়েছেন তাদের এই বিষয়টা গুরুত্বের সাথে ভাবা উচিত। এতে আল্লাহ নারাজ হচ্ছেন। তাই আন্তরিক তওবা করে এই পাপাচার থেকে ফিরে আসতে হবে যত কষ্টই হোক না কেন।

◈ অনেক একান্নবর্তী ঘরে অর্থাৎ জয়েন্ট ফ্যামিলিতে দেখা যায় চাচাতো-মামাতো ভাই-বোনেরা একই ছাদের নিচে বসবাস করে। এমন পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাজিনদের মাঝে খুবই সখ্যতা গড়ে ওঠে। বাবা-মায়েরাও কিছু বলে না, যেহেতু তারা ভাই-বোনের মতোই! বাহির থেকে দেখে সাধারণ মানুষেরা বলতেই পারে যে, তারা আপন ভাই-বোনের চেয়েও বেশি। কিন্তু এতে আল্লাহর বিধান বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তিত হবে না। চাচাতো, মামাতো ভাইয়েরা নারীদের জন্য গাইরে মাহরাম। একজন সাধারণ পুরুষের সাথে পর্দার যেরূপ বিধান তাদের সাথেও পর্দার একই বিধান।

◈ বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রী একে অপরকে দেখে নেওয়া মুস্তাহাব। মাহরামের উপস্থিতিতে কথা-বার্তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি জানিয়ে দেওয়া বা জেনে নেওয়াও জায়েয। কিন্তু অনেক সময় শয়তান এই জায়েয বিষয়টাকে পুঁজি বানিয়ে জিনার দিকে নারী-পুরুষকে উস্কে দেয়। দেখা যায় 'এই বিষয়টা জানানো দরকার'; 'সেই বিষয়টা জানালে ভালো হয়' করতে করতে দিনকে দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে, অনলাইনে বা সরাসরি কথা হতে থাকে পাত্রীর মাহরামের অনুপস্থিতিতেই। একটা সময়ে কিছুটা আবেগময়ী কথা হতে থাকে দুজনের মাঝে। এরপর থেকে বিয়ের আগেই জিনার দরজা খুলে যায়। অনেকে আবার 'বিয়ে তো হবেই' ভেবে আরো অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। তারপর স্বভাবগতভাবেই হোক বা শয়তান প্ররোচনায়, যখন সেই পুরুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তখন সেই নারী নিজেকে পায় সর্বহারা অবস্থায়। তাই বিয়ের পূর্বে জিনা থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে।

একজন নারী যখন বোরকা, খিমার, জিলবাব ও নিকাবের মতো দামি পোশাকগুলো গায়ে জড়িয়ে নেয় তখন তার মাথায় রাখা উচিত যে, তার পরিধেয় এই পোশাকটি ইসলামকে উপস্থাপন করে। এই পোশাক পরিহিত অবস্থায় সে যখন অন্য পুরুষদের সাথে রাস্তা-ঘাটে ঘনিষ্ঠভাবে ঘুরাফেরা করে, ভার্সিটি-ক্যাম্পাসে আন্তরিকভাবে কথা-বার্তা বলে তখন সেটা আরও দশ জনের চোখে পড়ে। এরপর সেই সাধারণ মানুষগুলো 'বোরকাওয়ালীরা বেশি খারাপ' ধরণের কথাবার্তা বলতে থাকে। এতে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। সেই সাথে বেকায়দায় পড়তে হয় সেই বোনগুলোকেও যারা

আল্লাহকে ভয় করে পরিপূর্ণ পর্দা করছে এবং এসব গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকছে। সাদা কাপড়ে ময়লা যেমন বেশি লাগে ঠিক তেমনি ইসলাম মেনে চলার চেষ্টা করছে কিন্তু সামান্য বিচ্যুতি রয়েছে এমন কিছু দেখলেও সাধারণ মানুষ সেটার ওপর বেশি আলোকপাত করে। আর এই 'বোরকাওয়ালীরা বেশি খারাপ' টাইপ কথাগুলো শুনতে হয় তাদেরকেও যারা সত্যিকার অর্থে, নির্ভুলভাবে পর্দা করছে। আমার বিচ্যুতি যাতে আরেকজনের মন্দ কথা শোনার কারণ না হয়ে দাঁড়ায় অন্তত এই ভেবে ফিরে আসা উচিত।



||৬ষ্ঠ দারস||

অসূর্যস্পর্শী- ২

১. নারীদের জন্য চাকরি বা ব্যবসার বিধান

ইসলাম নারীদের ওপর উপার্জন করার দায়িত্ব অর্পন করেনি। এটি পুরুষদের কাজ। নারীর যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের। আর নারীর দায়িত্ব হচ্ছে আদর্শ পরিবার ও সংসার রচনা করা। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে চাকরি বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নারী ঘর থেকে বের হবে না।

নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো, তার ঘর-সংসারকে পরিচালনা করা, পরিবারের সকল দিকে লক্ষ্য রাখা, সন্তানদের প্রতিপালন ও পরিচর্যা করে দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তার স্বামীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা।

অন্যদিকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় ব্যয়, সংসার পরিচালনা ও সন্তানাদি, পারিবারিক ও সামাজিক অন্যান্য ব্যয়ভার থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। যাবতীয় দায়ভার স্বামী, পিতা, ভাই বা পুত্র সন্তানের ওপর আরোপিত হয়েছে।[১]

অপরদিকে প্রত্যেক নারী তার স্বামীর গৃহের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর কিয়ামতের দিন সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবে।[২] তবে যদি কোনো নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার স্বামী বা মাহরাম পুরুষ গ্রহণ না করে কিংবা তারা দায়িত্ব নিতে অক্ষম হয় অথবা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ না থাকে তাহলে প্রয়োজনের খাতিরে সে শরী'আহ সম্মত পন্থায় ও শর্তানুযায়ী হালাল পেশার চাকরি ও ব্যবসা করতে পারবে।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন– "আমার খালা তালাকপ্রাপ্তা হলে নিজেদের খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর সংগ্রহ করার ইচ্ছা করেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করেন। ফলে তিনি নবী ﷺ এর কাছে এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলেন।

[১] আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়েতিয়্যাহ- ৭/৮২

[২] সহীহ বুখারী- ৮৯৩

তখন নবী ﷺ বললেন- 'হ্যা, তুমি তোমার খেজুর সংগ্রহ করতে পার। আশা করি তুমি সদকাহ করবে অথবা (তা দিয়ে) সৎ কাজ করবে'।"[৩]

হযরত আবু বকর ؓ–এর কন্যা আসমা ؓ বলেন– "যখন যুবায়ের ؓ আমাকে বিবাহ করেন, তখন তার না ছিলো সম্পত্তি আর না ছিল কোন চাকর-বাকর। একটা উট আর একটা ঘোড়াই ছিল তার সম্বল। ঘোড়াটাকে আমি ঘাস-পানি খাওয়াতাম। সাথে সেলাই ও গম ভাঙার কাজও করতাম। আমি রুটি তৈরি করতে পারতাম না, আমার কয়েকজন ভালো আনসার প্রতিবেশি মহিলা আমাকে রুটি বানিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরে রাসূল ﷺ যুবায়ের ؓ–কে একখণ্ড জমি দান করেন। সে জমি থেকে আমি শুকনো খেজুরের বীচি সংগ্রহ করে মাথায় বহন করে আনতাম।"[৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ؓ–এর স্ত্রী নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারীম ﷺ–এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরি করা দ্রব্যাদি বিক্রি করি। এ ছাড়া আমার ও স্বামী-সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই।" রাসুলে কারীম ﷺ বললেন, "এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।"[৫]

মুফতি মুহাম্মাদ শফী ؒ সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন– "যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোনো পন্থা না থাকে, তবে সাজসজ্জা ছাড়া পর্দার সাথে চাকরি ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও নারীদের প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত হলো সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বের হওয়া, এবং বোরকা বা জিলবাব তথা বড় চাদর গায়ে দিয়ে বের হওয়া।"[৬]

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী ؒ বলেন– "নারীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে। কিন্তু কোনো নারীর যদি উপার্জনে সক্ষম অভিভাবক না থাকে তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য তার কর্ম বা চাকুরি করার অনুমতি আছে। তবে এজন্য শর্ত হলো, তার ভাবগাম্ভীর্যতা, অনুকূল পরিবেশ ও পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে দায়িত্ব পালন করা জায়েয নেই।"[৭]

---

[৩] সহীহ মুসলিম- ১৪৮৩

[৪] সহীহ বুখারী- ৫২২৪

[৫] মুসনাদে আহমাদ- ১৬১৩০, ১৬০৮৬

[৬] তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন- ৭/১৩

[৭] আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল- ৬/৩৮

এই পরিস্থিতিতে নারীর চাকরি বা ব্যবসার ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হবে, নতুবা তা জায়েয হবেনা—

◆ চাকরি বা ব্যবসাটি হালাল হতে হবে এবং তার দৈহিক, মানসিক স্বভাব ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। যেমন:- ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই কিংবা এ জাতীয় পেশা।

◆ কর্মক্ষেত্রে পর্দার পরিপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

◆ চাকরির কারণে যাতে পরপুরুষের সঙ্গে সফর করতে না হয়।

◆ কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যাতে কোনো হারাম কাজে লিপ্ত না হওয়া। যেমন: ড্রাইভারের সঙ্গে একাকী ভ্রমণ, পারফিউম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

◆ নারীর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা। যদি চাকরি করতে গিয়ে এসব দায়িত্ব পালনে ব্যাপক অসুবিধা হয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে না।[৮]

◆ যদি বিবাহিত নারী ওজরের কারণে চাকরি বা ব্যবসা করতে চান সেক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক।

আজকাল অনেকেই অনলাইনকেন্দ্রিক ব্যবসার দিকে ঝুঁকছে। অনেকের ক্ষেত্রে সেটা নিতান্তই শখ। যেই ওজরসমূহ থাকলে একজন নারী চাকরি-ব্যবসা করতে পারে এমন কোনো ওজর অনেকেরই নেই, সেই সত্ত্বেও তারা অনলাইনে ব্যবসা করে থাকে। ফলে সংসার-স্বামী-সন্তানকে প্রাপ্য সময়টুকু দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, ব্যাঘাত ঘটে ইবাদতেও। এছাড়া অধিকাংশ সময় ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে যাওয়া, কুরিয়ার অফিসের ভিড় ঠেলে ডেলিভারি সম্পন্ন করা, পুরুষ দোকানি বা ডেলিভারি ম্যানের সাথে কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে পর্দার লঙ্ঘন হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। আবার শখের বশে ব্যবসা শুরু করার ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। ফলে বেকায়দায় পরছে সে সকল নারী যাদের কাছে ব্যবসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দু মুঠো ভাত। তাই আমাদের প্রত্যেক নারীর উচিত শখের ওপর শরী'আহকে প্রাধান্য দিয়ে উপরে আলোচিত ওজর ব্যাতীত ব্যবসার দিকে না আগানো।

---

[৮] ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ- ২/৯৮১; ফিকহুন নাওয়াযিল- ৩/৩৫৯; আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুওয়াইতিয়্যাহ- ৭/৮৩-৮৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক- ৬/১১৭; আদ্দুররুল মুখতার- ৬/৫৫; আলবাহরুর রায়েক- ১/২০০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ১/৩৮, ফিকহুন নাওয়াযিল- ৩/৩৫৯

২. পর্দা করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি আপলোড

পর্দা করে নিজের ছবি তুলে তা ফেসবুকে আপলোড দেওয়া কোনো ভদ্র, সভ্য ও রুচিশীল নারীর কাজ হতে পারেনা। মু'মিন-মু'মিনাহগণ অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে। তাই এসব অনর্থক কাজ পরিহার করতে হবে।[৯] আল্লাহ ﷻ বিশ্বাসীদের গুনাবলি বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾

যখন তারা অনর্থক বিষয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যায় তখন সম্মানের সাথেই এড়িয়ে চলে। [১০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

من حسن إسلام المرء: تركُه ما لا يعنيه

ইসলামের অনুপম দিক সমূহের মাঝে অন্যতম দিক হচ্ছে– কোনো (মুসলিম) ব্যাক্তি (যাবতীয়) অনর্থক কাজ পরিহার করবে। [১১]

হাদীসটি বিভিন্ন সনদে কতিপয় সাহাবীদের থেকে হাসান ও যঈফ সূত্রে রিওয়ায়াত হয়েছে। ইমাম নববী ؒ–সহ বেশ কজন মুহাদ্দিস এ হাদীসকে সহীহ ও হাসান বলেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ ؒ বলেন,

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: (من حسن إسلام المرء: تركُه ما لا يعنيه)، فهذا يعم الترك لما لا يعني: من الكلام، والنظر، والاستماع، والبطش، والمشي، والفكر، وسائر الحركات الظاهر والباطن، فهذه كلمة شافية في الورع

নবী ﷺ এই একটি কথার মাঝে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীরুতার সকল কথা ও নির্দেশের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। সুতরাং এখানে অনর্থক কাজ পরিহার করার

[৯] তাকমিলা ফাতহিল মুলহিম- ৪/১৬৪; ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া- ৪/১০৬; কিফায়াতুল মুফতী- ৫/৩৮৮; হিদায়া- ৪/৪৫৮; মিশকাত- ২/২৮০; সূরা নূর- ৩০

[১০] সূরা ফুরক্বান- ৭২

[১১] তিরমিযী- ৪/২৩১৭; ইবনু মাজাহ- ২/৩৯৭৬; ইবনু হিব্বান- ১/২২৯ ; শুয়াবুল ঈমান- ৪/২৫৫; আরবাঈন আস সুগরা- ১৯; মুসনাদে শিহাব- ১/১৯; আল কামেল- ৬/৫৪

ব্যাপকতা হচ্ছে- কথায়, নজরে, শ্রবণে, ধরায়, চলায়, চিন্তা করায় ও সকল বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনর্থক কাজ পরিহার করা। আর এসকল বিষয়ই হচ্ছে আল্লাহ ভীরুতার সাথে সংশ্লিষ্ট। [১২]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি দেয়া ভদ্র ও চরিত্রবান মেয়েদের ক্ষেত্রে দৃষ্টি কটু দেখা যায়। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা সতী-সাধ্বী (মুহস্বানাত), নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি। [১৩]

এই আয়াতের 'মুহস্বানাত'- এর ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী ﷺ বলেন, يعني العفيفات- পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী, যারা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেমালুম (বহু দূরত্বে অবস্থানকারী)।

'আল্লামা আলুসী ﷺ বলেন, "পবিত্রতার সার্বিক উপাদান নিয়ে বেড়ে উঠা এবং উত্তম চরিত্রের ওপর লালিত-পালিত হওয়ার কারণে অন্য কোনো চিন্তা ও মানসিকতা তাদের কল্পনায় আসে না। এই গুণ পূর্ণ নিষ্কলুষতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার প্রমাণ বহন করে...[১৪]

অন্যত্র রয়েছে- "আত্মার ব্যাধিমুক্ত স্বচ্ছ অন্তরের নারীদের মধ্যে প্রবঞ্চনামূলক চাতুর্য নেই। তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে অসৎ কোনো মনোবাসনা নেই। শৈশবকাল থেকেই এই স্বভাব তাদের চরিত্রশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।"[১৫]

এছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি না দেওয়ার আরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে—

◆ অফলাইনে অর্থাৎ রাস্তাঘাটে পুরুষেরা একটা মেয়ের দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারে না বললেই চলে। কেননা এতে লোকচক্ষুর ভয় রয়েছে, লজ্জাশীলতা রয়েছে। কিন্তু যখন সেই পুরুষ এমনই নারীর ছবি অনলাইনে পেয়ে যায় তখন সেই নারীর দিকে বাজে দৃষ্টি দেওয়া থেকে তাকে বাঁধা দেওয়ার মতো আর কিছুই থাকে না। তার নজর তখন এমন সব স্থানেও চলে যেতে পারে যেসব স্থান সেই নারী কখনই চাবে না কোনো পুরুষের চোখে এভাবে ফুটে উঠুক। অনেকেই ভাবতে পারে, পর্দা

---

[১২] মাদারিজুস সালেকীন- ২/২২

[১৩] সূরা নূর- ২৩

[১৪] রূহুল মা'আনী- ৬/১২৬

[১৫] গারায়িবুল কুরআন- ৫/১৭৩

যারা করে না তাদের ছবিতে এরকম লোলুপদৃষ্টি পড়ে, পর্দা করে ছবি দিলে হয়তো সেই আশঙ্কা নেই। এই ধারণা একদমই ভুল। যে পুরুষ নির্লজ্জ, তার কাছে বেপর্দা আর পর্দানশীলের মাঝে কোনো ফারাক নেই।

◆ বদনজরের কারণ হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি আপলোড করা। আপনি জানেনও না আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় এমন কত মানুষ আছে। আপনার ছবি দেখে যদি তারা ঈর্ষায় ভুগে তাহলে অনেক সম্ভবনা রয়েছে বদনজরের শিকার হওয়ার। তাই সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজের ছবি আপলোড করা থেকে বিরত থাকা উচিত, হোক তা পর্দাবৃত বা খোলামেলা। অনেক সংসারও ভেঙে যায় বদনজরের কারণে। স্বামীর সাথে অন্তরঙ্গ কিছু মুহূর্তের ছবি অনলাইনে আপলোড করে অনেকে, অথবা সেসব মুহূর্তের কথা কিছু মধুর শব্দের সমন্বয়ে ফুটিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার বুভুক্ষ চোখের সামনে তুলে ধরে অনেক নারী। এসবও বদনজরের কারণ হতে পারে। কত ঘর ভেঙেছে এরকম বদনজরের কারণে তা আল্লাহই ভালো জানেন। তাই যদি কেউ সত্যিই তার স্বামীকে ও তার সংসারকে ভালোবেসে থাকে তাহলে তার উচিত এসব থেকে বিরত থাকা।

◆ ছবি ব্যবহার করে জঘন্যতম ও বিশ্রী কালোজাদু করা যায় খুব সহজে। আমরা হয়তো অনেকেই এমন দেখেছি যে কালোজাদুর জন্য যেসব ছবি ব্যবহার করা হয় সেসব ছবির উপর বিভিন্ন আঁকিবুঁকি, বিভিন্ন লেখা, ক্রস, হুক, রক্তের ছোপ ইত্যাদি থাকে। সংসার ধ্বংস, বিচ্ছেদ, বন্ধ্যাকরণ এমনকি জীবননাশের জন্যও এসব জাদু করা হয়ে থাকে। যারা জাদু করে তারা এসব ছবি সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই সংগ্রহ করে নিতে পারে খুব সহজে। তাই সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি আপলোড করা থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা জরুরি।

◆ এছাড়া নারীদের বেপর্দা, পর্দা করা এমনকি ছোট্ট অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ছবিও অনলাইনে পোস্ট করা উচিত নয়। রোমহর্ষক হলেও সত্য যে, বিভিন্ন সূত্র ও সংবাদ মাধ্যমে জানা যায় নারীদের এসব ছবি অনেক সময়ই পাচার হয়ে যায় বিভিন্ন পর্ন সাইটে। এমনকি ছোট্ট শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ছবিও বিভিন্ন নোংরা সাইটে পাওয়া গিয়েছে বলে মাঝে মাঝেই সংবাদে আসে। ইন্টারনেটের অন্ধকার জগতে ঘাপটি মেরে থাকা শিশুকামীদের হাতে আপনার শিশুর ছবি চলে যাক তা নিশ্চয় তা আপনি চাইবেন না!

৩. সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপরীত লিঙ্গের সাথে চ্যাট করা, পোস্টে কমেন্ট করা/রিপ্লাই দেওয়া

শরঈ কোনো ওজর না থাকলে এভাবে বেগানা ছেলে-মেয়ের একে অপরের সাথে চ্যাটিং করা গুনাহের কাজ। আর শরঈ দৃষ্টিতে সিদ্ধ কোনো প্রয়োজনে কথা বলা কিংবা চ্যাটিং করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হচ্ছে মাহরাম সহকারে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলে প্রয়োজনীয় কথা বলা। রাসূল ﷺ বলেছেন,

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হলে নিঃসন্দেহে তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান। (অর্থাৎ তখন শয়তান তাদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়)। [১৬]

আরেক বর্ণনায় এসেছে,

(لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: (انطلق فحُجَّ مع امرأتك)؛

"মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেন কোনো নারী কোনো পুরুষের সাথে নির্জনে মিলিত না হয় এবং মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যেন একা সফর না করে।" এক ব্যক্তি দাড়িয়ে গিয়ে বললেন- "হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধে নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছি আর আমার স্ত্রী (একা) হজ্জের সফরে বের হয়েছে।" নবী ﷺ বললেন— "এখান থেকে উঠো এবং তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো। [১৭]

আ'তা ইবনু আবী রবাহ রহ. থেকে বর্ণিত,

لو ائتمنت على بيت مال لكنت أميناً، ولا آمن نفسي على أمةٍ شوهاء

যদি আমাকে বাইতুল মালের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকতে পারব। কিন্তু আমি আমার নাফস তথা প্রবৃত্তিকে কোনো কুৎসিত দাসীর নিকটও নিরাপদ ও বিশ্বস্ত মনে করিনা! [১৮]

---

[১৬] জামে তিরমিযী- ৪/৪৬৫, হাদীস- ২১৬৫; সুনানে নাসায়ী- ৫/৩৮৭, হাদীস- ৯২১৯; সহীহ ইবনু হিব্বান- ১০, ১৫/৪৩৬, ১২২, হাদীস- ৪৫৭৬,৬৭২৮; মুসনাদে আহমাদ- ৩/৪৪৬, হাদীস- ১৫৭৩৪; আদ দ্বিয়া ফিল আহাদীসিল মুখতারাহ- ১/১৯১-১৯২, হাদীস- ৯৬

[১৭] সহীহ বুখারী- ৩/১০৯৪, হাদীস- ২৮৪৪; সহীহ মুসলিম- ২/৯৭৮, হাদীস- ১৩৪১

[১৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী- ৯/৯৬; হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুয়াইম তরজমা নং- ২৪৪

সুতরাং নির্জনে কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কেউই গুনাহ থেকে নিরাপদ নয়। অনলাইনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে যোগাযোগ স্থাপন খুবই সহজ। এখানে মানুষের লজ্জাবোধটা একটু কম কাজ করে থাকে। এই কারণে প্রায়ই দেখা যায় নারীদের ইনবক্সে দ্বীনি দাওয়াত (!) নিয়ে পুরুষেরা হানা দিয়ে থাকে। কিছু নারী একে নিছক দ্বীনি দাওয়াত মনে করেই ম্যাসেজের রিপ্লাই দিয়ে দেয় আর এরপর থেকেই দুইয়ের মাঝে হয়তো নিয়মিত কথা চলতে থাকে। সেই কথা এতটা দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে যে তা দ্বীনিদের জন্য অভাবনীয়। একেই বলা হয় নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। পরবর্তী দারসে আমরা এ বিষয় নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারবো ইন শা আল্লাহ।

৪. গাইরে মাহরাম পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত

পুরুষের মতো নারীদেরকেও গাইরে মাহরাম পুরুষদের দিকে তাকাতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

মু'মিনা নারীদের বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। [১৯]

ইমাম ইবনু কাসীর رحمه الله এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

أي: عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة، ولا بغير شهوة-أصلاً

তারা যাতে তাদের স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পরপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। এই জন্যই অধিকাংশ আলিমদের মতে— কামনার সহিত হোক কিংবা কামনা-বাসনা ব্যতীত হোক, উভয় অবস্থাতেই নারীদের জন্য বেগানা পুরুষের দিকে তাকানো নাজায়েয। [২০]

এর পরিপ্রেক্ষিতে জমহুরদের দলিল হচ্ছে,

---

[১৯] সূরা নূর- ৩১

[২০] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৬/৪৫

أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه

উম্মে সালামাহ ﵂ ও মাইমূনা ﵂ নবীজি ﷺ–এর নিকট বসা ছিলেন এমতাবস্থায় অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূম ﵁ আসলেন। নবীজি ﷺ বললেন, "তোমরা তার সামনে পর্দা করো (অর্থাৎ পর্দার অন্তরালে চলে যাও, তাকে দেখো না)।" আমি (উম্মে সালামাহ) বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! উনি তো অন্ধ, আমাদের তো দেখছেনও না আবার আমাদের চিনেনও না।" নবী ﷺ বললেন, "(সে নাহয় দেখছে না কিন্তু) তোমরা কি অন্ধ? তোমরা কি দেখো না!?" [২১]

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

যখন তোমরা নারীদের নিকট প্রয়োজনীয় কোনো কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার বিষয়। [২২]

এই আয়াতে কারীমা থেকে অনেকগুলো বিষয় অনুধাবন করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

◆ নারী ও পুরুষ একে অপরকে দেখবেনা, জরুরি কোন বিষয় হলে পর্দার আড়াল থেকে আদান-প্রদান হবে।

[২১] তিরমিযী- ২৭৭৮; আবু দাউদ- ৪১১২; নাসায়ী- ৯১৯৭; ইবনে রাহউইয়াহ- ৪/৮৫,১৬০; আহমাদ- ৬/২৯৬; আবু ইয়ালা- ১২/৩৫৩ হাদীস- ৬৯২২; মুশকিলুল আসার, ত্বহাবী- ১/২৬৫; ইবনে হিব্বান- ১২/৩৮৭-৩৮৯; সুনানে কুবরা, বাইহাক্বী- ৭/৯২; ইবনে আব্দিল বার- ১৯/১৫৫; খত্বীব- ৩/১৮; ইবনে আসাকির- ৫৪/৪৩৫; মিযযী- ২৯/৩১৩; মু'জামুল কাবীর, ত্ববারানী- ২৩/৩০২, হাদীস- ৬৭৮; তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৬/৪৫, সূরা নূর- ৩১ এর তাফসীর। সনদটির সার্বিক বিবেচনায় অধিকাংশ মুহাদ্দিসই একে হাসান ও সহীহ বলেছেন। তবে কেউ কেউ সনদে উল্লিখিত নাবহানের কারণে হাদীসটির সনদকে যঈফ বলেছেন।

[২২] সূরা আহযাব- ৫৩

◆ আল্লাহ ﷻ নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে দেখা না হওয়ার মাধ্যমে উভয়ের অন্তরকে অধিকতর পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। এতে দৃঢ় হলো, ফিতনা না থাকলেও বেগানা পুরুষের দিকে নারীরা তাকাবে না।

অপরপক্ষে ইমাম ইবনু কাসীর ﷺ অধিকাংশ আলিমদের মত উল্লেখ করার পর বলেন,

وذهب آخرون من العلماء: إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة-أم المؤمنين-تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت

তবে আরেকদল উলামাগণ কামনা-বাসনা বিহীন অবস্থায় বেগানা পুরুষের দিকে তাকানো জায়েয বলেছেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সুত্রে প্রমানিত যে, তিনি ঈদের দিন হাবশীদের খেলা দেখছিলেন সাথে আয়েশা ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ এর পিছন থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে খেলা দেখছিলেন, আর আল্লাহর রাসূল ﷺ আম্মাজানকে তাদের থেকে পর্দাবৃত করছিলেন.....। [২৩]

এই হাদীসকে অনেকেই আবার পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগের ঘটনা বলে দাবি করেন আবার কেউ কেউ এর খণ্ডনে বলে থাকেন এটি পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে।

মোটকথা, যারা জায়েযের পক্ষে তারা মূলত ফিতনা না হওয়ার ও কামনা-বাসনা দৃষ্টিতে না তাকানোর শর্তে জায়েয বলেছেন। এই হাদীস আম্মাজানের শানে এসেছে। এটি প্রতীয়মান যে, তিনি নিঃসন্দেহে নির্মল ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন, সে হিসেবে তার থেকে ফিতনা ও কামনা-বাসনার আশা করাই বোকামি। কিন্তু বর্তমান ফিতনা ও যৌনতায় রোগাক্রান্ত এই সমাজে ফিতনা ও শাহওয়াত থেকে বাঁচাটা খুব মুশকিল। আর শাহওয়াত তথা কামনা-বাসনার দৃষ্টিতে তাকালে সকল উলামার নিকটই তা অবৈধ।

৫. পুরুষদেরকে সালাম দেওয়া বা সালামের জবাব দেওয়ার বিধান

বিনা প্রয়োজনে পর পুরুষকে সালাম দেওয়া ঠিক নয়। তবে প্রকাশ থাকে যে, পরপুরুষের সাথে কোনো বেগানা নারীর কথা বলার প্রয়োজন হলে তখন কথার শুরুতে

[২৩] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৬/৪৫; সহীহ বুখারী- ৪৫৪, ৫১৯০; সহীহ মুসলিম- ৮৯২; সুনানে নাসায়ী- ৪/১৯৫; মুসনাদে আহমাদ- ২৪৭৬৫

সালাম আদান-প্রদান করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে পর্দার বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া পরপুরুষের সাথে কথা বলার যেই আদব কুরআন মাজীদে উল্লিখিত রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অর্থাৎ, কোমলতা পরিহার করে স্বাভাবিকভাবে শুধু প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলবে।[২৪] তবে শাফেয়ী মাযহাবে ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে সালাম দেওয়াকে জায়েয বলা হয়েছে।[২৫]

৬. নারী ও পুরুষের সহশিক্ষার বিধান

আল্লাহ ﷻ নারী-পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ প্রদান করেছেন। নারী ও পুরুষ জাতির মাঝে এই পারস্পরিক আকর্ষণ একদমই স্বাভাবিক। কিন্তু মহান আল্লাহ সৃষ্টির সকল জীব ও ব্যবস্থাপনার মাঝে একটি ভারসাম্য ও সীমারেখা নির্দিষ্ট করেছেন। শরী'আহসম্মত বিবাহ ও শরী'আহ নির্ধারিত মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে অযথা সাক্ষাৎ করা কিংবা উঠবস করা অথবা অবাধে মেলামেশা হয় এমন পরিবেশে অবস্থান করা জায়েয নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾

তিনি ওই সত্তা, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং এর মাঝ থেকেই তিনি তোমাদের একে অপরের (বৈবাহিক) জোড়া নির্ধারণ করেছেন, যাতে করে সে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। [২৬]

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ নারী ও পুরুষকে তার নির্ধারিত সীমারেখার মাঝে অবস্থানের রূপরেখা দেখিয়েছেন। সুতরাং বৈবাহিক সম্পর্ক ও আল্লাহ ﷻ যাদের সাথে বিবাহ হারাম করেছেন তারা ব্যতীত বেগানা নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে নিষেধ সেটি হোক শিক্ষা ক্ষেত্রে কিংবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

---

[২৪] ফাতাওয়া তাতারখানিয়া- ১৮; আলমুহীতুল বুরহানী- ৮/২৩; রদ্দুল মুহতার- ৬/৩২৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া- ৫/৩২৬; ফাতাওয়া সিরাজিয়া- ৭২

[২৫] ফাতহুল বারী- ১১/৩৭; আওজাযুল মাসালিক- ১৭/১৮০, হাদীস- ১৭২৮; উমদাতুল ক্বারী- ২২/৩৭৮-৩৭৯

[২৬] সূরা আ'রাফ- ১৮৯

আর তোমরা তাঁর (নবী ﷺ-এর) স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার বিষয়। [২৭]

ইমাম কুরতুবী ؒ উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছেন। অন্যান্য সকল মু'মিন নারীরাও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।[২৮] কিন্তু গুনাহে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে তাও জায়েয নেই।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

চোখের জিনা হলো—(হারাম) দৃষ্টিপাত। কর্ণদ্বয়ের জিনা হলো—(গাইরে মাহরামের যৌন উদ্দীপক) কথাবার্তা মনযোগ দিয়ে শোনা। জিহ্বার জিনা হলো—(গাইরে মাহরামের সাথে সুড়সুড়িমূলক) কথোপকথন। হাতের জিনা হলো—(গাইরে মাহরামকে) ধরা বা স্পর্শকরণ। পায়ের জিনা হলো— (খারাপ উদ্দেশ্যে) চলা। অন্তর চায় এবং কামনা করে আর লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবে রূপ দেয় (যদি জিনা করে) এবং মিথ্যায় পরিণত করে (যদি অন্তরের চাওয়া অনুপাতে জিনা না করে)। [২৯]

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন,

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়। কেননা শয়তান তাদের ৩য় জন হয়! (অর্থাৎ শয়তান তাদের পরস্পরের মাঝে কুমন্ত্রণা প্রদান করে।) [৩০]

---

[২৭] সূরা আহযাব- ৫৩

[২৮] তাফসীরে কুরতুবী- ১৪/২২৭

[২৯] সহীহ মুসলিম- ২৬৫৭; মুসনাদে আহমাদ- ৮৯৩২

[৩০] জামে তিরমিযী- ৪/৪৬৫, হাদীস- ২১৬৫; সুনানে নাসায়ী- ৫/৩৮৭ হাদীস- ৯২১৯; সহীহ ইবনু হিব্বান- ১০, ১৫/৪৩৬, ১২২, হাদীস- ৪৫৭৬, ৬৭২৮; মুসনাদে আহমাদ- ৩/৪৪৬, হাদীস- ১৫৭৩৪; আদ দ্বিয়া ফিল আহাদীসিল মুখতারাহ- ১/১৯১ ও ১৯২, হাদীস- ৯৬

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বলেন,

لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحُجَّ مع امرأتك؛

মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেন কোনো নারী কোনো পুরুষের সাথে নির্জনে মিলিত না হয় এবং মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যেন একা সফর না করে। এক ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমি তো অমুক অমুক যুদ্ধে নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছি আর আমার স্ত্রী (একা) হজ্জের সফরে বের হয়েছে।" নবী ﷺ বললেন— "এখান থেকে উঠো এবং তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে হজ্জ করো।" [৩১]

আ'তা ইবনু আবী রবাহ রহ. থেকে বর্ণিত,

لو ائتمنت على بيت مال لكنت أميناً، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء

যদি আমাকে বাইতুলমালের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত থাকতে পারব। কিন্তু আমি আমার নিজের নফসকে (প্রবৃত্তিকে) কোনো কুৎসিত দাসীর নিকটও নিরাপদ ও বিশ্বস্ত মনে করি না! [৩২]

উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ উপেক্ষা করে অবাধ মেলামেশায় লিপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এছাড়া পুরুষের মতোই নারীদের ক্ষেত্রেও গাইরে মাহরাম পুরুষদের দিকে তাকানো জায়েয নেই, যা আমরা পূর্বেও জেনেছি। সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের একে অপরের সাথে অবাধ মেলামেশা, দৃষ্টিপাত, কথাবার্তা ইত্যাদির মাধ্যমে শরী'আহ লঙ্ঘন কোনো না কোনোভাবে হয়েই যায়। মোদ্দাকথা হলো, সহশিক্ষার পরিবেশে শরী'আতের বিধান পালন সম্ভবপর হয় না। সুতরাং সহশিক্ষা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামী শরী'আহ কখনই সমর্থন করে না।

উপরন্তু আল্লাহর বিধানের বিপরীতে সমাজব্যবস্থা আজ পর্দার এমন লঙ্ঘন করছে যে, এর ফলে সমাজে যুবক-যুবতিদের মাঝে যেমন নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে তেমনি সমাজে বেড়েছে অবৈধ সন্তানের হিড়িক। আর এই বেপর্দার অভিশাপ আজকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পোহাতে হচ্ছে। অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, অবৈধ উপার্জন, খুন, ধর্ষণসহ বহুবিধ অপরাধের মূল কারণ হচ্ছে এই পর্দাহীনতা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা।

[৩১] সহীহ বুখারী- ৩/১০৯৪, হাদীস- ২৮৪৪; সহীহ মুসলিম- ২/৯৭৮, হাদীস- ১৩৪১

[৩২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী- ৯/৯৬; হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নুয়াইম তরজমা- ২৪৪

৭. নারীদের সুগন্ধি প্রসাধনী ব্যবহার

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের জন্য পারফিউম বা সুগন্ধি ব্যবহার করে পরপুরুষদের নিকট দিয়ে গমনের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকজনের নিকট দিয়ে গমন করে, ফলে লোক সকল তার ঘ্রাণ পায়, সে নারী ব্যভিচারিণীর সমতুল্য। [৩৩]

কেননা, নারী দেহের সুগন্ধ পরপুরুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে বা যৌনতার দিকে আহ্বান করে। তবে স্বামী, মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) এবং মহিলা অঙ্গনে তা ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। ঘ্রাণ ছড়িয়ে যায় এমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বাহিরে গমন নিষেধ। তবে হালকা সুগন্ধি, যেটাতে ঘ্রাণ ছড়ায় না তা ব্যবহার করাতে সমস্যা নেই। মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করলে এবং ঘরের বাইরে যাওয়ার পর কোনো পরপুরুষের মাধ্যমে তার দেহের সুঘ্রাণ পাওয়ার উপক্রম হবে বলে ধারণা হলে তাদের ওপর আবশ্যক হলো, সুগন্ধির স্থানটি এমনভাবে ধুয়ে ফেলা যেন কোনো সুগন্ধি অবশিষ্ট না থাকে। তবে এতে গোসল করা আবশ্যক নয়। নবী ﷺ বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ

যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যায়, তা ধৌত না করা পর্যন্ত তার কোনো সালাত কবুল হবে না। [৩৪]

ইমাম মুনাবী রহ. *ফায়যুল ক্বাদীর* গ্রন্থে বলেন, "এখানে تغتسل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ধৌত করার মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে সুগন্ধি দূর করা।" সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে আবু দাউদে এসেছে,

عن أبي هريرة: أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت: نعم، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل

---

[৩৩] নাসাঈ- ৫১২৬; মুসনাদে আহমাদ- ৮৭৭৩; মুসনাদে বাযযার- ৮২৫৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ- ২৬৮৬৪; মুসনাদে আবু ইয়ালা- ৬৪৪৭৯; ফয়যুল ক্বদীর- ৩/১৫৫

[৩৪] সুনানে ইবনে মাজাহ- ৪০০২

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক নারী মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর পাশ কেটে এমন সুগন্ধি লাগিয়ে যাচ্ছিলেন যার ঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল, তখন তিনি তাকে বললেন, "হে আল্লাহর বান্দী, তুমি কি মসজিদে যেতে চাচ্ছ?" মহিলাটি বললেন- "জ্বি।" তিনি বললেন- "তুমি কি সুগন্ধি ব্যবহার করেছ?" মহিলাটি বললেন- "জ্বি।" তিনি বললেন- "ঘরে ফিরে যাও অতঃপর সুগন্ধি ধুয়ে এসো, কেননা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে শুনেছি- যেই নারী ঘ্রাণ ছড়ায় এমন সুগন্ধি ব্যবহার করে মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয় তার সালাত কবুল করা হবেনা যতক্ষণ না পর্যন্ত সে বাড়িতে ফিরে গিয়ে তা ধৌত করে আসে।"

৮. অলংকার প্রদর্শিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে বিধান

গাইরে মাহরামদের সামনে নারীদের পরিহিত অলংকার যাতে প্রদর্শিত না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। আল্লাহ ﷻ কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾

তারা যেন তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। [৩৫]

তাফসীরে ত্ববারীতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তারা যেন বেগানা পুরুষের সামনে নিজের যীনাত (অলংকার) তথা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

যীনাত মূলত দুই প্রকার:-

- যা অভ্যন্তরীণ, যেমন: নুপুর, চুড়ি, কানের দুল, গলার হার ইত্যাদি।
- যা এমনিতেই প্রকাশ পায়, এই আয়াতের ভিত্তিতে তা আবার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন কারো মতে তা হচ্ছে– পোশাকের বাহ্যিক সৌন্দর্য।[৩৬]

সাহাবাগণ ﷺ ও তাবেয়ীগণ ﷺ, ইমাম সুয়ূত্বী, আল্লামা শাওকানী, আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন আশ শানকিতি, আল্লামা যামাখশারী ﷺ সহ প্রমুখ এই আয়াতের একই ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৭]

৯. নিজের অজান্তে যেভাবে পর্দা লঙ্ঘন হতে পারে

দৈনন্দিন জীবনে চলাচলের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই নিজেদের অজান্তেই আমাদের পর্দা লঙ্ঘন হতে পারে। কেবল বোরকা-নিকাব, হাত-পা মোজা পরিধান করেই পর্দা হয়ে

[৩৫] সূরা নূর- ৩১

[৩৬] তাফসীরে ত্ববারী- ১৯/১৫৫, সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য

[৩৭] আদ দুররুল মানসূর- ১১/২২-২৩; ফাতহুল ক্বাদীর (তাফসীরে শাওকানী)- ৪/৩১-৩২; আদ্বওয়াউল বায়ান ফী ইদ্বাহিল কুরআন বিল কুরআন- ৫/৫১২

গেল বিষয়টা এমন না, যা আমরা পূর্বের দীর্ঘ আলোচনা থেকে ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি। উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো তো রয়েছেই, এর পাশাপাশি ঘরের বাহিরে থাকাকালে নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলো মাথায় রাখা জরুরি–

- নারীদের জন্য ঘরের বাহিরে সুগন্ধি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আমরা পূর্বে জেনেছি। সুগন্ধি বলতে যে কেবল পারফিউম বা বডি স্প্রে বোঝাচ্ছে বিষয়টা কিন্তু এমন না। বাজারে এমন বডি লোশন, চুলের তেল, ফেস ক্রিম ইত্যাদি প্রসাধনী রয়েছে যেসবের গন্ধ পারফিউমের চেয়ে কম কিছু না। সেগুলোর সুগন্ধি যদি এতটা কড়া হয় যে তা পরপুরুষের নাকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেসব প্রসাধনীও ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

- অনেকেই এমন আছেন যারা বাহিরে বের হলে নিকাব পরিধান করেন সাথে চোখে কাজল বা সুরমা দেন। অথচ কাজল বা সুরমা নারীদের সাজসজ্জার অন্তর্ভুত যা কেবল মাহরাম, নারী ও স্বামী ব্যতীত অন্যদের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়।

- অনেকের বোরকার আস্তিন/হাতা এতটা ঢোলা হয় যে হাত সামান্য তুলতে গেলেই কব্জিসহ হাত উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই বোরকার হাতার বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত।

- বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি বা ঢং রয়েছে, যা নারীদের ক্ষেত্রে সহজাত। নারীদের এসব ঢং পুরুষদের মনে আবেদন জাগায়, আর সেটা পুরুষদের সহজাত। অনেকে রাস্তাঘাটে, বিশেষত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বান্ধবী ও সমবয়স্কাদের সাথে চলাফেরা করার সময় ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সেসব ঢং প্রকাশ করে ফেলে। বর্তমানে যেহেতু প্রায় সকল সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা প্রচলিত তাই সেসব অঙ্গভঙ্গি বা ঢং কোনো পরপুরুষের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই এই বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত।

- ঘরের বাহিরে নিকাবের নিচ দিয়ে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় নিজের অজান্তে চেহারার কিছু অংশ; তথা গাল, চিবুক, মুখ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে এবং সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

- কোনো বস্তু নিচে পড়ে গেলে উঠানোর সময় এমনভাবে বসা উচিত যাতে কোনোমতেই কোমরের মাপ প্রকাশিত না হয়। অনুরূপ, চেয়ার জাতীয় স্থানে বসার ক্ষেত্রেও উক্ত বিষয়টি লক্ষণীয়।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসরুমে পুরুষদের থেকে দূরে এবং পিছনের দিকে বসার চেষ্টা করতে হবে, যাতে পুরুষদের দৃষ্টির সামনে বারবার পড়তে না হয়। পুরুষ ক্লাসমেটদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা, হাসাহাসি, ঠাট্টা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

- গণপরিবহনে ওঠা ও নামার সময় বিশেষ খেয়াল রাখবেন হেল্পার/কন্ডাক্টর গায়ে হাত দিচ্ছে কিনা। অনেক সময় তারা বাহনে উঠতে বা বাহন থেকে নামতে সাহায্য করার নামে পিঠে বা কোমরে ইচ্ছা করে হাত লাগিয়ে দেয়। তাই গণপরিবহণে ওঠা-নামার সময় প্রয়োজনে তাদেরকে বলুন নেমে দাঁড়াতে।

- গণপরিবহণে ওঠার আগে দেখে নিন নারীদের সিট ফাঁকা আছে কিনা। তাহলেই সেই পরিবহনে উঠুন। আর যদি দেখেন যে নারীদের সিটে পুরুষেরা বসে আছে এবং অন্যত্র পর্দা রক্ষা করে বসা সম্ভব নয় তাহলে অধিকার সচেতন হয়ে তাদেরকে উঠতে বলুন সহজ ভাষায়। একদমই কোনো উপায় না থাকলে প্রয়োজনে দুটি সিটের ভাড়া দিন যাতে পাশে কোন পুরুষ না বসতে পারে।

- রাতের দিকে যদি একা ভ্রমণ করতেই হয় তাহলে যাত্রীপূর্ণ গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করবেন। চারদিকে নজর রাখবেন, আসে পাশের পুরুষদের মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করবেন। কিছুটা সমস্যা মনে হলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ুন। সর্বাবস্থায় রাত্রীকালে একা চলাচল পরিহার করুন।



||৭ম দারস||

মাসাঈয়িলুল হিজাব

আওরাহ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

১. পোশাক কেনা বা বানানোর ক্ষেত্রে দেখা যায় দোকানদার বা টেইলার্সদের কাছে শরীরের মাপ বলতে হয়। এইক্ষেত্রে কি পর্দা নষ্ট হচ্ছে?

❖ যথাযথ চেষ্টা করতে হবে মহিলাদের থেকে কেনা বা তাদের দিয়ে বানানো। যদি একদমই কোনো উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে নিজে টেইলার্সে না গিয়ে ঘরের বয়স্ক কোনো মহিলা (যেমন: মা, খালা, ফুফু) মাপ নিয়ে যেতে পারে।

২. শ্বশুরের সামনে কি থ্রি-কোয়ার্টার বা হাফ হাতা জামা পরা যাবে? হালকা মেকআপ করে থাকা যাবে?

❖ কনুই যাতে না দেখা যায় এমন পোশাক পরিধান করতে হবে। হালকা মেকআপও তার সামনে পরিহার করা উচিত।

৩. মাহরাম পুরুষ এবং মহিলাদের সামনে থ্রি-কোয়ার্টার হাতের জামা এবং চুড়িদার পায়জামা পরে যাওয়া যাবে?

❖ নিকট মাহরাম ও মহিলাদের সামনে যাওয়া যাবে।

৪. ন্যাশনাল আইডি কার্ড ও পাসপোর্টের জন্য কান বের করে ছবি তুলতে হয়েছে। অনেক সময় সামনের কিছু চুল বের না করলে ছবি গ্রহণযোগ্য হয় না। এসব ক্ষেত্রে পর্দার কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে। আর আমাদের করণীয় কী?

❖ এসব ক্ষেত্রে কারণবশত জায়েয।

৫. এই ফিতনার সময়ে কি রঙ-বেরঙের জিলবাব/খিমার পরিধান করা জায়েয হবে?

❖ এসব ক্ষেত্রে পর্দার কোনো ছাড় নেই। রঙ-বেরঙের বলতে চোখে ফুটে এমন জিলবাব পড়া যাবে না।

সলাতের সতর সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

৬. স্কার্ট পরে কি নামায পড়া যাবে? সমাজে প্রচলিত আছে যে, স্কার্ট এর নিচের দিক যেহেতু খোলা থাকে তাই ভিতরে কিছু না পরলে নামায হয় না। এটা কতটা যুক্তিযুক্ত?

❖ স্কার্ট দ্বারা দেহের পূর্ণ পর্দা হলে সমস্যা নেই, এতে নিচ থেকে খোলা থাক বা না থাক।

৭. নামাজে পা পুরো ঢেকে রাখাটা কি জরুরি? পায়ের কতটুক অংশ ঢাকতে হবে?

❖ টাখনু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরি।

মাহরাম, গাইরে মাহরাম ও বিবিধ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

৮. বাড়িতে বা আত্মীয়ের বাসায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে গাইরে মাহরামের সামনে পর্দা ছাড়া পড়ে গেলে কি গুনাহ হবে?

❖ তাওবা করে নিলেই হবে। ভবিষ্যতে সতর্ক থাকতে হবে।

৯. স্বামী বাদে মাহরাম যেকোনো পুরুষের সামনে কি বাচ্চাকে ব্রেস্ট-ফিডিং করানো যাবে?

❖ করানো যাবে না, তবে আর কোনো সুযোগ না থাকলে পর্দা দিয়ে পূর্ণভাবে ঢেকে তারপর ব্রেস্ট-ফিডিং করাবে।

১০. পুরুষ উস্তাযকে কুরআন তিলাওয়াত শোনানোর ক্ষেত্রে পর্দার বিধান কী? রেকর্ড করা তিলাওয়াত কি তাঁকে শোনানো যাবে?

❖ মহিলা উস্তায বিকল্প হিসেবে না থাকলে শোনানো যাবে তবে কোনো সুর দিয়ে পড়বে না, মোটা গলায় মাখরাজ সহকারে পড়বে।

১১. পুরুষ ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে পর্দার বিধান কী?

❖ মহিলা ডাক্তার না পেলে প্রয়োজনে পুরুষ ডাক্তারকে যতটুকু না দেখালেই নয় স্রেফ ততটুকু দেখানো যাবে।

১২. কেউ বাইরে যাওয়ার সময় পরিপূর্ণ পর্দা করে। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে তার দেবরও তাদের সাথে থাকেন। যেহেতু বাসায় রান্না থেকে শুরু করে অনেক কাজ করতে হয়। আর বাসায় সবাই একসাথে বসে খায়, তাই সবসময় মুখ ঢাকাটা কষ্টের হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সে যদি তার দেবরের সামনে শুধু মুখ আর হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা রাখে তাহলে কি তার গুনাহ হবে?

❖ দেবরের সামনে মুখ খোলা যাবে না, দরকার হলে বড় ঘোমটা ব্যবহার করবে। তবে হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা যাবে।

১৩. আমার বেশিদিন হয়নি দ্বীনের বুঝ এসেছে। এর আগে অনেক ছবি তোলা হতো। বুঝ আসার পর থেকে যথাযম্ভব ছবি সরিয়ে ফেলেছি। অনেক বন্ধু-বান্ধবীদেরকেও মেসেজ দিয়ে অনুরোধ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, বেশির ভাগই মেনেছে। কিন্তু সহপাঠীদের মধ্যে ২-৩ জন আছে (ছেলে) এমন যে একদম নাছোড়বান্দা। ব্যাচের সাথে গ্রুপ ছবিগুলো তারা সরাতে চায় না। তো এক্ষেত্রে আমি ছেলেদেরকে ঠিক কয়বার বলতে পারবো? আর যদি এমন হয় যে, বলেও লাভ হচ্ছে না বরং উল্টাপাল্টা কথা বলছে বা ঝামেলা করছে তাহলে আমার করণীয় কী?

❖ প্রথমত, আপনার জন্য ছেলেদের এই ব্যাপারে দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত, মেয়েদেরকে কয়েকবার বোঝানোর চেষ্টা করুন। না বুঝলেও আপনি আপনার দায়িত্ব থেকে ইন শা আল্লাহ মুক্ত থাকবেন।

১৪. বাসায় কোনো গাইরে মাহারাম নিকট আত্মীয় যেমন চাচাতো-মামাতো ভাই, দুলাভাই, ভাসুর আসলে তাদেরকে পর্দার আড়াল থেকে সালাম/কেমন আছেন ইত্যাদি জিজ্ঞাস করা যাবে? আর পর্দা অবস্থায় সামনে পড়ে গেলে জিজ্ঞাস করা যাবে?

❖ যাবে তবে বেশি আলাপচারিতা করা যাবে না।

১৫. এক বোন ও তার নাবালক ছোট ভাই তাদের শৈশবে একে অপরের গোপনাঙ্গে হাত দেয়। তার ছোট ভাই সেই বোনের স্তনও মুখে নিয়েছিল। সেই বোন জানতে চান এতে কি তাদের সম্পর্কের কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা বা তাদের বাবা-মায়ের সম্পর্ক এতে ঠিক আছে কিনা?

❖ না সম্পর্কচ্ছেদ হয়নি। কিন্তু খাসভাবে তাওবা করতে হবে।

১৬. মামা শ্বশুর বা চাচা শ্বশুর কি মাহরাম?

❖ না, মাহরাম না।

১৭. সৎ বাবা/ চাচা/ মামা/ দাদা/ নানা কি মাহরাম?

❖ সৎ বাবার সামনে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা আছে।

আর সৎ চাচা/ মামা/ দাদা/ নানার ক্ষেত্রে, যদি বাবা অথবা মা সৎ হন তাহলে সেই সৎ চাচা/ মামা/ দাদা/ নানা মাহরাম নন। আর যদি বাবা অথবা মা আপন হন সেক্ষেত্রে সেই সৎ চাচা/ মামা/ দাদা/ নানা মাহরাম।

১৮. হোস্টেলে একই ফ্লোরে হিন্দু, খ্রিস্টান মেয়েদের সাথে অবস্থান করলে পর্দার ক্ষেত্রে কী করণীয়?

❖ মুখ খোলা রেখে অন্যান্য অঙ্গগুলো তাদের সামনে যথাসম্ভব ঢেকে রাখবে।

১৯. আমি যৌথ পরিবারের বউ। এখানে দ্বীন পালনে তারা সবাই খুবই সচেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ। আমি পরিবারের ছোট বউ হওয়ায় সবাই আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করে আলহামদুলিল্লাহ। আমার ২ ভাসুরও ছোট বোনের মতোই স্নেহ করে। ছোট বোনের সাথে যেমন খুনসুঁটি করে তেমনই তারা করেন। আমি কিছুটা গুটিয়ে থাকি। কারণ আমি যতটা জানি উনারা আমার মাহরাম নন। সাধারণত বড় ওড়না দিয়ে হিজাবের মতো করে পড়ে থাকি। কথা বার্তাও প্রয়োজন ব্যতীত বলি না। কিন্তু উনারা আমাকে ফ্রি করতে আমার সাথে প্রায়ই যেচে অপ্রয়োজনীয় কথাও বলেন। বলাবাহুল্য, আমি উনাদের চেয়ে বয়সেও প্রায় ১৫/২০ বছরের ছোট। আমার বিয়ে হয়েছে ৬ মাস চলছে। আমার বর ও উনাদের এই ফ্রি মিক্সিংটা পছন্দ করেন না। এখনও উনাদের কিছু বলতে পারছেন না স্বাভাবিক কারণেই। আমাকে বলেছেন এড়িয়ে চলতে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি তাদেরকে এড়িয়ে চলার পরও যে উনারা কথা বলছেন, এখানে কি আমার গুনাহ হচ্ছে? এবং এই পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কী? আমার পর্দা কি ঠিক আছে?

❖ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবেন, যেহেতু তাদের দ্বীনের বুঝ আছে তাই সরাসরি তাদের বা তাদের স্ত্রী অথবা শাশুড়িকে বুঝিয়ে বলে সতর্ক করাবেন। এরপরেও এমন হলে আপনার গুনাহ হবে না।

২০. হজ্জের সময় মেয়েদের মুখ ঢাকতে হয় না কিন্তু এখনকার হজ্জে প্রায় লাখ লাখ পুরুষ উপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে কী করব?

❖ হজ্জের সময়েও পুরুষদের সামনে মহিলাদের মুখ ঢাকা জরুরি কিন্তু সেটি আলগা কাপড় দ্বারা হতে হবে এবং তা ইহরামের কাপড়ের সাথে সেলাইযুক্ত হওয়া যাবে না। হজ্জে আলগা নেকাবের আলাদা ক্যাপ কিনতে পাওয়া যায় সেটি পরা যাবে। হজ্জের

সময় নারী সাহাবিয়াতগণও পুরুষ দেখলে আলগা পোশাক দিয়ে নিজেদের চেহারা ঢাকতেন এই মর্মে আম্মাজান আয়েশা ও তাঁর বোন আসমা ﵄ থেকে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় এবং এ ব্যাপারে পূর্বেও আলোচনা এসেছে।

২১. সালাত আদায় করার সময় পরপুরুষ দেখে ফেললে সেক্ষেত্রে সালাত হবে?

❖ সালাত হবে। তবে গাইরে মাহরাম যাতে না দেখে তার পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে।

২২. বয়স্ক বা অসুস্থ পুরুষের সামনে মুখ খোলা রাখা যাবে? আর ষাটোর্ধ বয়স্ক মহিলারা মুখ খোলা রাখতে পারবে?

❖ পুরুষ যদি এতটাই বৃদ্ধ হয় যে তার শারীরিক কোনো সক্ষমতা নেই তাহলে তার সামনে মুখ খোলা জায়েয। আর ষাটোর্ধ মহিলার চেহারা যদি ধুতরে যায় আর বিয়ের উদ্দেশ্যও না থাকে তাহলে তার জন্য মুখ খোলা রাখা জায়েয।

২৩. আমার সামনে কোনো পুরুষ আসলে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম, কিন্তু এক সেকেন্ডে যতটুকু দেখলাম তাতে যদি আমার কোনো যৌন অনুভূতি না আসে বা আবার দেখার ইচ্ছা না জাগে কিন্তু যদি এইটা মনে হয় যে লোকটা সুন্দর বা তার পোশাকটা মানিয়েছে... এই চিন্তাটাও কি ফেতনা?

❖ এক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক। তবে নজর হেফাযত করতে হবে এবং এমন চিন্তাও না আনাই উত্তম।

২৪. আমার পরিবার দ্বীনদার না। বড় বোনের আকদ হওয়ায় এখন দুলাভাই প্রায় সবসময়ই বাসায় থাকছেন। উনার সাথে পর্দা করেই চলি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরিবারের সবাই মিলে বসলে, উনার সাথেও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা হয়ে যাচ্ছে! কতটুকু ছাড় শরী'আহ দেয় এমন অবস্থায়? আমার কি একদমই উনার আশপাশে যাওয়া উচিত হবে না, নাকি এভাবে সবাই বসলে আমিও পর্দার সাথে বসতে পারব, কিছু কথা বলতে পারব?

❖ এভাবে সবাই বসলে যেসব অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা হয় এতে দুলাভাই বা দেবরেরা বেশ পুলকিত হয়! ওই সময় অবচেতন মনেই তাদের ভিতরে ভিন্ন রকম অবস্থা তৈরি হতে পারে। তাই একদম জরুরি কিছু না হলে এই আড্ডাখানা পরিত্যাগ করতে হবে।

২৫. নিজের বরের ভাগ্নে বা ভাতিজা যেহেতু আমার মাহরাম হবে না, এমনকি আমার বাচ্চাদেরও মাহরাম হবে না! সেক্ষেত্রে, যেন ওদেরকে আমার এবং আমার বাচ্চাদের মাহরাম বানাতে পারি সে নিয়তে আমি কি ওদের দুধ মা হতে পারব?

◈ জি, পারবেন।

২৬. আমার দূরসম্পর্কীয় চাচাতো ভাই আমার ছোট ভাইয়ের সাথে আমার আম্মু থেকে দুধ পান করে, তাহলে সেই চাচাতো ভাই আর তার বাবা কি আমার মাহরাম হবে?

◈ দূরসম্পর্কীয় ওই চাচাতো ভাই আপনার মাহরাম হবে। তবে ওই চাচা মাহরাম নয়।

সহশিক্ষা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

২৭. আমি একটি সরকারি মেডিকেলে পড়ছি। মেয়েদের পর্দা করে মেডিকেলে পড়া এবং ভবিষ্যতে ডাক্তারি বা চাকরি করা কি জায়েয? নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা থাকে মেডিকেল সেক্টরে, নাইট ডিউটি করতে হয় ইন্টার্নিতে, মাহরাম ছাড়া হোস্টেল এ থাকতে হয়। এমতাবস্থায় কী করণীয়?

◈ একটু ত্যাগ স্বীকার করে হলেও পর্দার মৌলিক বিধানগুলো মেনে চলতে পারলে ডাক্তারি পড়া উচিত। কেননা দ্বীনদার মহিলা ডাক্তারদের অভাবে পর্দানশীন বোনেরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে হতাশায় ভোগে, কিন্তু পর্দার মৌলিক বিধানটুকুও যদি পালন করা সম্ভব না হয় তাহলে এই পড়াশোনা করা যাবে না।

২৮. আমি একজন মেডিকেল ছাত্রী, অনেক সময় প্র্যাক্টিকাল কাজ করতে হাত মোজা খোলা লাগে, হ্যান্ড গ্লাভসও পরতে দেয় না অনেক শিক্ষক। এখন আমার কি পর্দা লঙ্ঘনের গুনাহ হবে?

◈ অতি প্রয়োজনে হাত মোজা খোলা জায়েয।

২৯. মেসেঞ্জারে প্রাতিষ্ঠানিক কিছু গ্রুপে যুক্ত আছি। ক্লাস, এসাইনমেন্ট, পরীক্ষা-বিষয়ক তথ্য সেখান থেকে পাই। এসব গ্রুপে ছেলে-মেয়ে উভয়ই আছে। গ্রুপে দরকারি/অ-দরকারি (কোনো মেয়ে বন্ধুর) মেসেজের রিপ্লাই দিতে গেলে কি আমার পর্দা লঙ্ঘনের গুনাহ হবে?

◈ দরকারি ছাড়া অ-দরকারি কোনো ম্যাসেজ দেওয়া যাবে না।

৩০. মাহরাম যদি সফর দূরত্বে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে, তাহলে কি হলে বা হোস্টেলে (মাহরাম ছাড়া) থেকে পড়াশোনা করা যাবে? এতে কি গুনাহ হবে?

◈ এটা জায়েয নেই। তবে বিশেষ জরুরত হলে ভিন্ন কথা।

চাকরি বা ব্যবসা বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

৩১. কেউ যদি পড়াশোনা শেষ করে শুধু বাবা-মায়ের খেদমতের জন্যই চাকরি করে আয় করতে চায় এবং বিয়ের পরেও অর্জিত অর্থ তার বাবা-মাকে দিয়ে দিতে চায়। তার এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি হবে?

❖ মেয়ের অর্জিত বা মালিকানাধীন টাকা সম্পূর্ণ তার। এটি তিনি যেকোনো জায়েয ও হালাল খাতে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকার রাখেন। কিন্তু কথা হলো তিনি চাকরি কেন করবেন? বাবা-মা কি অক্ষম কিংবা তাদের পরিবার চালানোর আর কেউ নেই? নাকি আবেগ থেকেই এমন চিন্তা এসেছে? কেবল এরকম আবেগের বশে মেয়েদের চাকরি করা জায়েয নেই।

৩২. আমি একটি চাকরি করি। এখানে সব সময়ই গাইরে মাহরামদের সাথে কাজ করতে হয়। বোরকা পরলেও নিকাব পরা সম্ভব হয় না। আমার স্বামী চায় যে আমি চাকরি করি। চাকরির কারণে আরো কিছু বিষয় আমাকে করতে হয় বা মেনে নিতে হয়, যা শরী'আহ অনুমোদন দেয় না। যেমন শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা বা অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। চেহারা খোলা থাকায় কি আমার গুনাহ হচ্ছে? চাকরিটা কি আমার জন্য হালাল হচ্ছে?

❖ চেহারা খোলা থাকলে গুনাহ হবে, গাইরে মাহরামদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে না চলা, মিনারে ফুল দেওয়া, গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করা- এগুলো সবই হারাম কাজ। স্বামীর কথা এ ক্ষেত্রে মানা জায়েয নেই।

৩৩. নারী ডাক্তার কি পুরুষের চিকিৎসা করতে পারবে? যেমন ডেন্টিস্টদের কাজই থাকে মুখের ভিতর। তাহলে তারা কি পুরুষদের চিকিৎসা করতে পারবে?

❖ ছোট বাচ্চা আর একদম বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ছাড়া অন্যান্য পুরুষদের চিকিৎসা করতে পারবে না।

৩৪. কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খরচ বহন না করে এমনকি স্ত্রীকে যদি চাকরি করার অনুমতি না দেয় সেক্ষেত্রে ওই স্ত্রীর চাকরি করা কি জায়েয হবে?

❖ পর্দা রক্ষা করে জায়েয।

৩৫. আমরা দুই বোন। আমাদের বাবা-মা বয়স্ক এবং আমরা ব্যতীত কার্যক্ষম আর কেউ নেই। এমতাবস্তায় পরিবার চালানোর জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে চাকরি করলে কি গুনাহ হবে?

❖ শরী'আতের বিধান ঠিক রেখে চাকরি করতে পারলে গুনাহ হবে না ইন শা আল্লাহ। তবে বিবাহিত হলে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি লাগবে।

৩৬. বর্তমান সময় অনেক পুরুষই তার স্ত্রীকে নিচু করে দেখে শুধু সে যথেষ্ট শিক্ষা অর্জন করেও কোনো চাকরি করে না বলে। তারা ভাবে সংসারে তাদের আর্থিক কোনো অবদান নেই বলে তাদের মতামতেরও কোনো গুরুত্ব নেই। পারিপার্শ্বিক পরিবেশে পুরুষদের এই মনোভাব দেখে দ্বীনের বুঝদার অনেক বোনও চাকরি করা ছাড়া বিয়ে করতে চান না। এক্ষেত্রে বোনদের জন্য নাসীহাহ কী হবে?

❖ সামাজিক এই বিরূপ মানসিকতা দূর করতে হবে। বোনদের বুঝতে হবে আসল সম্মান ও মর্যাদা তা-ই যা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ নির্ধারণ করেছেন। এতেই পরম সৌভাগ্য ও সম্মান নিহিত। দুনিয়ার মানুষের নির্ধারিত সম্মান প্রকৃত সম্মান নয়। আল্লাহ ﷻ নারীদের সংসার গোছানো ও সংসারে সন্তানের দ্বীনি তারবিয়াতের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এতেই তাদের সম্মান নিহিত। সর্বোপরি দ্বীনদার মেয়েদের উচিত দ্বীনদার কোনো পাত্র দেখে বিয়ে করা। কেননা একজন প্রকৃত দ্বীনদার পুরুষ এমন চিন্তাধারা লালন করবে না বরং সে চাইবে তার স্ত্রীকে তাবত দুনিয়ার মানুষের নজর থেকে আগলে রাখতে।



||৮ম দারস||

দুর্বল সৃষ্টি

﴿وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

এবং মানুষকে (পুরুষদেরকে) দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১]

আল্লাহ ﷻ পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। নারীদের প্রতি পুরুষেরা আকৃষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই পুরুষদের সহজাত। আর নারীদের প্রতি এই দুর্বলতাই পুরুষদের জন্য ইহজগতের অন্যতম সবচেয়ে বড় এক পরীক্ষা। আজ চারদিকে আমরা যত পাপাচার দেখি তার সিংহভাগই নারী-পুরুষজনিত। আর যখন সমাজে এমন পাপাচারের বিক্ষেপণ ঘটে তখন সমাজের ভিত্তি হয়ে যায় দুর্বল ও নড়বড়ে। তাই শয়তান এই বিষয়টার পেছনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু পুঁজি খাটিয়েছে এবং শ্রম দিয়েছে। বিনিময়ে আমরা আজকে এমন এক সমাজ পেয়েছি যে সমাজে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে কেবল যৌনতা আর যৌনতা। পুরুষদের মস্তিষ্কে নারী রূপান্তরিত হয়েছে ভোগ্য বস্তুতে। পর্নোগ্রাফির ভয়াল থাবা পুরুষদের মস্তিষ্ককে এমনভাবে বিকৃত করেছে যে, আজ ধর্ষিত হচ্ছে ছোট ছোট নিষ্পাপ শিশুরাও। এমতাবস্থায় আমাদের নারীদের কী করণীয়?

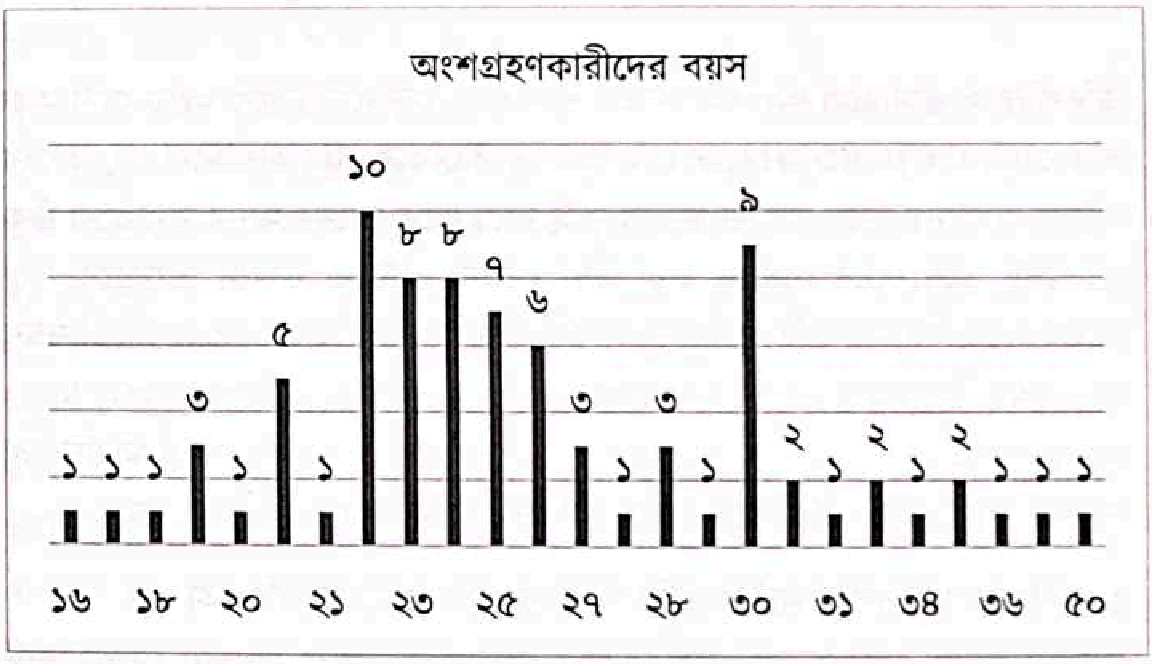
একবিংশ শতাব্দীর যৌনতা নামক মহামারীর ধাক্কা সামলাতে প্রথমেই নারীদের উচিত পুরুষদের মানসিকতা সম্পর্কে যথেষ্ঠ ধারণা রাখা। একজন নারীকে দেখে পুরুষ কী কী চিন্তা করতে পারে, পর্নোগ্রাফিসহ সমাজে ছড়িয়ে থাকা অশ্লীলতা ও নগ্নতা একজন

১] সূরা নিসা- ২৮

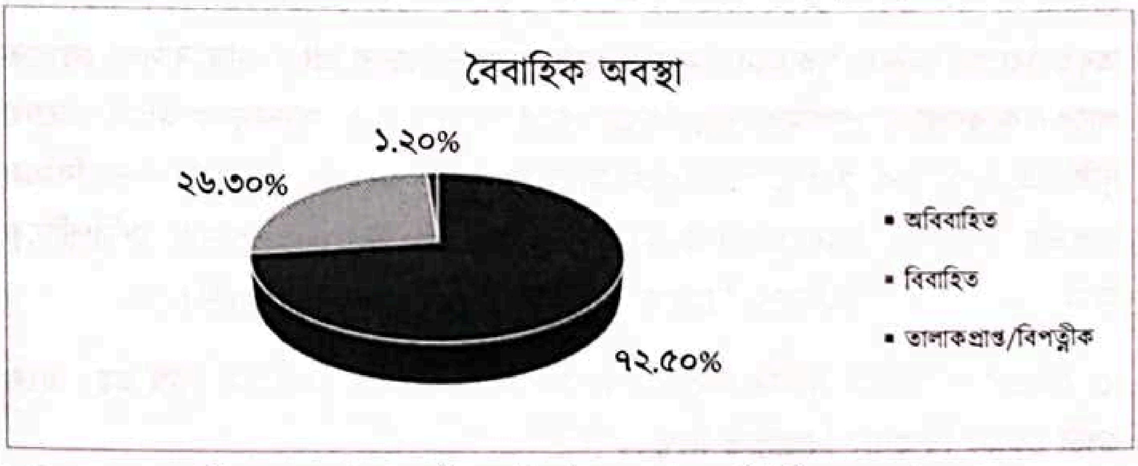
পুরুষের মস্তিষ্ককে কতটুকু প্রভাবিত করেছে, একজন পুরুষের কুদৃষ্টি থেকে একজন নারী কীভাবে নিজেকে হেফাজত করে চলতে পারে, দাম্পত্য জীবনে স্বামীর চাহিদা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা—এসব বিষয়ে জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরী। আর এই বিষয়গুলো যদি একজন পুরুষেরই মুখ থেকে জানা যায় তাহলে সেটা হবে সর্বাধিক কার্যকরী।

এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে '*ইনবাত এডুকেশন* থেকে *মেন'স সাইকোলজি সার্ভে*' শীর্ষক একটি জরিপ করা হয়েছিল যার মাধ্যমে উঠে এসেছে পুরুষদের মনস্তত্ত্বের বেশ কিছু দিক যা মুহস্বানাত কিতাবের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

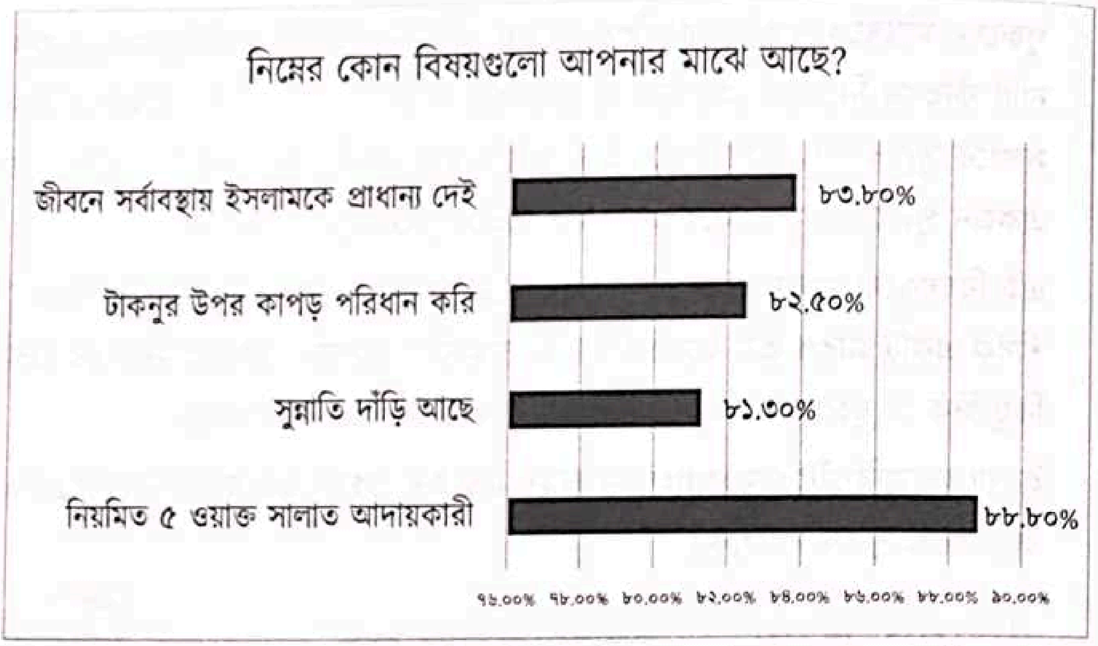
ইনবাতের জরিপটিতে অংশগ্রহণ করেছেন ৮০ জন পুরুষ। ৮০ জনের মাঝে ২১-৩০ বছর বয়সী পুরুষ সর্বাধিক।



অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ৭২.৫% অবিবাহিত ২৬.৩% বিবাহিত, ১.২% তালাকপ্রাপ্ত।



৮৪% এরও অধিক অংশগ্রহণকারী মোটামুটি বা পুরোপুরি দ্বীনের বুঝ সম্পন্ন।



জরিপটির মাধ্যমে প্রাপ্ত অংশগ্রহনকারীর বাচ্য হুবহু সেভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে যেভাবে তারা ব্যক্ত করেছেন। অংশগ্রহণকারীদেরকে বলা হয়েছিলো যে, তাদের পরিচয় আমাদের কাছে অজানা থাকবে তাই তারা যাতে তাদের মনের কথাগুলো ঠিক সেভাবেই তুলে ধরেন যেভাবে তারা চিন্তা করেন। এটা এ কারণে তাদেরকে বলা হয়েছে যাতে নারীদের প্রতি পুরুষদের মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হয়। এমন কিছু মন্তব্য এখানে থাকতে পারে যেগুলো অনেকেরই অপছন্দ হতে পারে। মাথায় রাখতে হবে এর উদ্দেশ্য কেবল এই যে, নারীরা যাতে পুরুষদের মানসিকতা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা পেতে পারে, পুরুষ জাতিকে খাটো করে দেখা কাম্য নয়।

১. একজন পর্দানশীল নারীর প্রতি দ্বীনদার পুরুষদের মানসিকতা

একজন পুরুষ একজন পর্দানশীল নারীকে অপাদমস্তক ঢাকা অবস্থায় দেখে। তাই চেহারা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে ফিতনায় পতিত হওয়ার মতো কোনো অবকাশ থাকে না। তবুও বিভিন্ন কারণে পুরুষদের মনেও পর্দানশীল নারীদের প্রতি কাম-বাসনা জাগতে পারে। কারণগুলো প্রাথমিক ভাবে হতে পারে তাদের কণ্ঠ, পুরুষদের দিকে তাদের দৃষ্টিপাত, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ম্যাসেজ-লাইক-কমেন্ট, ন্যাকামী-ঢং বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি। ইনবাতের Men's Pshychology Survey শীর্ষক জরিপটিতে আমরা অংশগ্রহণকারীদেরকে নিম্নোক্ত ৪টি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম।

❖ কোনো পর্দানশীল নারীর কণ্ঠ শুনলে কি আপনার মনে ফিতনার সৃষ্টি হয়? হলে সেটা কেমন ফিতনা? বিস্তারিত লিখুন।

এর উত্তরে প্রায় ৭৬% অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, পর্দানশীল নারীদের কণ্ঠ শুনলে তাদের অন্তরে কম-বেশি ফিতনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিম্নে তাদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো—

◐ কণ্ঠ যত বেশি নারীসুলভ হয়, ফিতনার আশঙ্কা তত বেশি। অনেক নারীকণ্ঠ এতটাই মিষ্টি হয় যে, যতই নিরস কথা বলুক, কামভাব জেগে ওঠে। চেষ্টা করেও ঠেকানো যায় না।

◐ দ্বীন পালনের প্রথম দিকে কোনো বেপর্দা নারীর দিকে তো তাকাতামই না, কিন্তু কোনো পর্দানশীল বোন সামনে দিয়ে গেলে একটা ফ্যান্টাসি কাজ করতো যে আমিও এমন কাউকে চাই। আমার নিজেরই খারাপ লাগতো, হায় এইটাও তো ফিতনা। তবে আলহামদুলিল্লাহ, অনেক চেষ্টার পর এখন আর এমন হয় না।

◐ হুম। ফিতনা সৃষ্টি হয়। মনে হয় আরেকটু কথা বলা যেত যদি! কোনোভাবে যদি আর কিছুটা সময় থাকতে পারতাম তার সাথে, যদি তাকে বিয়ে করতে পারতাম, যদি তার পরিবার আমার সাথে বিয়ে দিত, তার ব্যাপারে আরো জানতে মন চায়। এসবই...

◐ জি, খুব স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ ﷻ নারীদের কণ্ঠ আলাদা করেছেন এবং সেই কণ্ঠের প্রতি পুরুষদের অন্তরে টান দিয়েছেন। তাই আমিও এই ফিতনা অনুভব করি। বিশেষত দ্বীনের বুঝ হওয়ার পর থেকে। আর বলতে বাধ্য যে অন্যান্য নারীদের তুলনায় দ্বীনি পর্দানশীল নারীদের কণ্ঠ আরও বেশি ফিতনাময়। কারণ এখানে শয়তানের ওয়াসওয়াসা কাজ করে।

◐ মনে হয় যে, ইনিই যদি আমার অর্ধাঙ্গিনী হতেন, তাহলে কতই না ভালো হতো। ম্যাসেঞ্জারে বা যেভাবেই তার সাথে যুক্ত আছি, সেগুলো ব্যবহার করে তার সাথে কথা বলার জন্য শয়তান প্ররোচনা দেয়।

◐ জি, হয়। নারীর সুন্দর কণ্ঠ পুরুষের অন্তরে একটা ফিতনার সমুদ্র সৃষ্টি করে। যে সমুদ্র কৌতুহলে ভরপুর। শুধু এই নারীকণ্ঠ শুনেই হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে কত শত পুরুষ!

◐ কিছুটা হয়। যেহেতু এটাও আওরাতের অন্তর্ভুক্ত তাই এতে অন্য দ্বীনদার পুরুষদের দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার ভালোই সম্ভাবনা আছে। যেহেতু মেয়েও দ্বীন মেনে চলেন তাই তার দিকে যেকোনো দ্বীনদার পুরুষই আকৃষ্ট হবেন। এটাই স্বাভাবিক। আর এই ফিতনাটা ভয়াবহ রূপ নিতে পারে আজকালকার ফেইসবুক/হোয়াটসঅ্যাপ/ইমো—টাইপ সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে। অনেকেই আজকাল এই ফিতনায় পড়ে যাচ্ছে। তাই বোনদের উচিত নিজেদের কণ্ঠেরও পর্দা করা। জবান উঁচু না করা। পরপুরুষদের

সামনে বাধ্য হয়ে যেতে হলে এমনভাবে কথা বলা, যাতে আকৃষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে।

◆ হ্যাঁ। আমার মাঝে অটোমেটিক্যালি চিন্তা চলে আসে তাকে নিয়ে। কখনো কল্পনায় তাকে বেপর্দা দেখি। যদিও বাস্তবে হয়তো তিনি এমন হবেন না।

◆ জি, আমার মনে ফিতনা সৃষ্টি হয়। এমনিতেই পর্দানশীন বোনেরা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। যেকোনো কাছাকাছি বয়সী পর্দানশীন বোনকেই পোটেনশিয়াল ওয়াইফ চিন্তা করি। যেসব বোনের পর্দাকে সঠিক পর্দা হিসেবে স্বীকৃতি দিই, অবচেতনভাবে তাদের চালচলন খেয়াল করা হয়! চাই না, তাও কীভাবে কীভাবে যেন হয় ব্যাপারটা! তবে আলহামদুলিল্লাহ, সত্যিকারের পর্দানশীল বোনদের কণ্ঠ তেমন শোনা যায় না!

◆ হয়। কণ্ঠের মায়ায় পড়ে যাই।

◆ জি। সাধারণত আমরা যারা দ্বীনদার, তারা পর্দাশীল নারীদের প্রতি বেশি দুর্বল, তাদের হায়ার কারণে তাদের প্রতি সম্মানের সাথে সাথে একটা আকর্ষণও কাজ করে। আর যদি কণ্ঠ একটু ভালো লেগে যায়, তাহলে তো মারাত্মক ফিতনার মধ্যে পড়ে যাই। কণ্ঠের মাধ্যমে মনে মনে তখন তার বয়স অনুমান করার চেষ্টা করি। তারপর সে দেখতে কেমন হতে পারে; মাথার মধ্যে এরকম খারাপ চিন্তাও চলে আসে।

◆ কোনো পর্দানশীল নারী যদি আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করে তাহলে কি আপনার অন্তরে ফিতনা জন্মায়? জন্মালে সেটা কেমন ফিতনা? বিস্তারিত লিখুন।

এর উত্তরে প্রায় ৮০% অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, পর্দানশীল নারী তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাদের কম-বেশি ফিতনা হয়। নিম্নে তাদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে—

◆ ক্ষণিকের অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করাই যায়। কিন্তু লম্বা সময় ধরে তাকিয়ে থাকা মন ওলটপালট করে দিতে যথেষ্ট হয়।

◆ সেই ঘটনা বারবার মনে পড়ে, ওই রাস্তা দিয়ে বারবার যেতে ইচ্ছা করে।

◆ মনে হয় তিনি যদি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেন।

◆ আকর্ষণ তৈরি হয়, দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

◆ হ্যাঁ, ভেতরটা জ্বালিয়ে দেওয়ার মতো। চোখ সরিয়ে ফেললেও ক্ষতি থেকে যায়। শয়তান মনে করিয়ে দিতে থাকে, আর আমলের স্বাদ হারিয়ে যায়।

◆ জি। তাকানোর পরে মনে হয় সে কেমন দেখতে, কণ্ঠ কেমন, শারীরিক গঠন কেমন ইত্যাদি।

◆ মাঝেমধ্যে। চোখগুলো বড়, সুন্দর বা কাজল কালো এরকম কিছু থাকলে আকর্ষণ বাড়ে।

◆ জি, ফিতনা জন্মায় বলেই মনে হচ্ছে। তখন একটা যুক্তিহীন মানসিক প্রশান্তি বা অস্থিরতা কাজ করে। ভালো লাগে, ফুরফুরে লাগে কিছুটা। অবচেতনভাবে পূর্ণ পর্দানশীলদের ব্যাপারে খোঁজ রাখি, মনে মনে আগ্রহ থাকে, মনে হয় ওই বোনও হয়তো আমার ব্যাপারে আগ্রহী বা অন্তত আমাকে ভালো বলে জানে। অথচ ওই বোনের সাথে কখনো কথা হয়নি বা হয়তো হবেও না।

◆ অতীতে দেখা বিবস্ত্র ছবি আর এরকম পর্দানশীল নারী মিশ্রিত হয়ে কল্পনায় চলে আসে। অতিরিক্ত কল্পনা যৌন উদ্দীপ্ত করে তোলে। আল্লাহ মাফ করুন।

◈ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো দ্বীনদার নারী আপনার পোস্টে নিয়মিত লাইক-রিয়েক্ট করলে/কমেন্ট করলে/দ্বীনি বা দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ম্যাসেজিং করলে আপনার অন্তরে কি ফিতনা অনুভূত হয়? হলে সেটা কেমন তা বিস্তারিত লিখুন।

এর উত্তরে প্রায় ৭৮% অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, কোনো দ্বীনদার নারী পোস্টে লাইক-রিয়েক্ট বা কমেন্ট করলে বা সরাসরি ম্যাসেজ করলে তাদের কম-বেশি ফিতনা হয়। বাকি প্রায় ৭% অংশগ্রহণকারী বলেছেন তাদের এই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। নিম্নে অংশগ্রহণকারীদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো—

◆ নিয়মিত লাইক-কমেন্ট মনে অন্যরকম চিন্তা আনে। অনেক সময় প্রেমভাবও জেগে ওঠে। মনে হতে থাকে যে, উনি নিশ্চয় আমায় পছন্দ করেছেন, অথচ বাস্তবে হয়তো সে নারীর মনে এমন কোনো ভাবনাই থাকে না।

◆ ওনার প্রোফাইল চেক করতে ইচ্ছে হয়। পরের পোস্টে রিয়েক্ট করছেন কিনা, না করলে কেন করেনি, ব্যস্ত কিনা, পছন্দ হয়নি কিনা, আরও অনেক কিছু!

◆ জি হয়, অধিকাংশ হারাম সম্পর্ক শুরু হয় এই চ্যাটিং থেকেই।

◆ আইডিতে নারীদের রাখি না, এড পাঠালেও না। তাই লাইক-কমেন্ট হয় না। তবে মাঝে এমন একজন দ্বীনি বিষয়ে প্রশ্ন করতে করতে আমাকে নিয়ে ফিতনায় পড়ে যায়, আমিও কিছুটা পড়ে যাচ্ছিলাম।

◆ একেই বিয়ে করতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, আরও কিছু কথা বলি।

◆ ইউনিভার্সিটির এক সহপাঠিনী মাঝে কিছুদিন লাইক-টাইক দিয়েছিল। কয়েকদিন মনে প্রশ্ন আসছিল যে, সে আমাকে বিয়ে করতে চায় নাকি।

◆ দ্বীনি কেউ যদি রিয়েক্ট/কমেন্ট/ম্যাসেজিং করে তাহলে মনে হয় যে হয়তো ওই মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে।

◆ হয়। তখন মনে হয় যে বোনটা হয়তো আমাকে পছন্দ করে। এই কারণে আমিও তার প্রতি ঝুঁকে যাই। তাকে জানার কৌতূহল বাড়ে।

◆ হ্যা। তারপর তার প্রোফাইলে ঢুকে তার ছবি খোঁজার চেষ্টা করি। ছবি পেলে ফিতনায় জড়িয়ে যাই। ছবি না পেলে তেমন কোনো সমস্যা হয় না আজকাল। আগে ফেসবুকে বা মেসেঞ্জারে নক দেওয়ার মতো ফিতনায় পড়ে যেতাম। এখন আর এই সমস্যা নেই। প্রধানত আমি ছবির প্রতি আসক্ত। কেউ ছবি পোস্ট করলে (পর্দাসহ বা ছাড়া) আমি তার সাথে ভিডিও কল্পনা করে উত্তেজিত হয়ে যেতাম।

◆ জি হয়। ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠিয়ে লাইক, রিয়েক্ট, কমেন্ট করলে শয়তান এমনও কুমন্ত্রণা দেয় যে, ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট এক্সেপ্ট করে ফেলি। মনে হতে থাকে, সে স্ত্রী হিসেবে কেমন হবে।

◈ অনেক সময় পর্দানশীল বোনেরা নিজেদের অজান্তে বা জেনে-শুনে এমন কিছু অঙ্গভঙ্গি (ঢং) করে ফেলেন, সেসব কি আপনার কাছে দৃষ্টিকটু লাগে এবং কুচিন্তা আবির্ভাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়? এমন কিছু অঙ্গভঙ্গির বিষয়ে বলুন।

এর উত্তরে প্রায় ৭২% অংশগ্রহণকারী বলেছেন যে, তাদের সেসব অঙ্গভঙ্গিতে সামান্য অথবা অধিক ফিতনা হয় এবং অনেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে এমন বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির কথাও উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তাদের অধিকাংশের মন্তব্যগুলো তুলে ধরা হলো—

◆ অতিরিক্ত হাত নাড়ানো, কোমরে হাত দেওয়া।

◆ উচ্চস্বরে খিলখিল করে হেসে ওঠা, যা কণ্ঠের কমনীয়তা প্রকাশ করে দেয়। হাত উপরে তুলে বেশি নাড়া-চাড়া করার ফলে বোরকার হাতা সরে গিয়ে হাতের ত্বক অনেক সময় কনুই অবধিও অনাবৃত হয়ে যায়। মাথা ডানে-বামে ঘোরালে অনেক সময় অসতর্কতাবশত বুকের কাপড় সরে যায়। বুকের ওপরটা যে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে, তা অনেক সময়ই হয় হিজাবের নিচের অংশটুকু, অনেক সময় তা বুকের আকার আড়াল করতে যথেষ্ট হয় না।

◆ অনেক পর্দানশীল বা নিকাবী বোনদেরকে বাহিরে দেখেছি, তারা বোরকা পরেছেন অনেক ঢোলা মা শা আল্লাহ। খুবই সুন্দর করে নিকাব করেছেন। কিন্তু কেন জানি তাদের গোপন অঙ্গগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়। মানে আকৃতি, যেমন- পেছন দিকে বা বুকের মাপ স্পষ্ট বোঝা যায়।

◆ কোনো টেবিলে উপুড় হয়ে হাতের ভর দিয়ে দাঁড়ানো, যেমন: টেইলরের দোকান।

◆ মেয়েরা যখন নরম সুরে কথা বলে বা কিছু জানতে চায় তখন মনে ফিতনার সৃষ্টি হয়।

◆ পর্দানশীন নারীর অসতর্ক অবস্থায় অনাবৃত হয়ে পরা হাতও অনেক সময় ফিতনায় ফেলে দেয়।

◆ কোথাও হেলান দিয়ে শরীর বাঁকা করে দাঁড়ানো, ঘাড় হেলিয়ে দুলিয়ে এবং খুব বেশি শরীরী ভাষায় কথা বলা।

◆ কারো সাথে কথা বলার সময় অধিক হাত নাড়ানো। খুব বেশি নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গ নাড়া-চাড়া করা।

◆ ক্লাসে কেউ হাসির কথা বললে পর্দানশীল বোন যদি হেসে ফেলে, তাহলে তা তাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে। পরবর্তীতে মনে হয় আমিও আরেকটা এরকম কথা বলে ওই বোনকে হাসাই।

◆ হতে পারে সেটা সাধারণ হাত নাড়া, হতে পারে পায়ের ওপর পা তুলে বসা, ঠেস দিয়ে কোথাও দাঁড়ানো, নিজেদের মধ্যে গল্পের সময় সাধারণ অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি। এমন অনেক কিছুই হতে পারে।

◆ ফেসবুকে বোরকা বিক্রেতা পর্দা করা বোনেরা খুবই বিরক্তিকর। এখন তো বোরকার কোনো পেইজে ঢুকলেই বিপদ। আর নিউজফিডে তো সেসব পেজের বোরকা পরিহিতার ছবি, ভিডিও না চাইতেও এসে পড়ে।

◆ অনেক সময় দেখা যায় জনসম্মুখে পর্দা করা নারীরা বান্ধবীদের সাথে বাচ্চাদের মতো বিভিন্নভাবে হেলে-দুলে ঢং করছে। তখন দৃষ্টিকটু দেখায়। কুচিন্তা জাগায় না, বরং বিরক্ত হই।

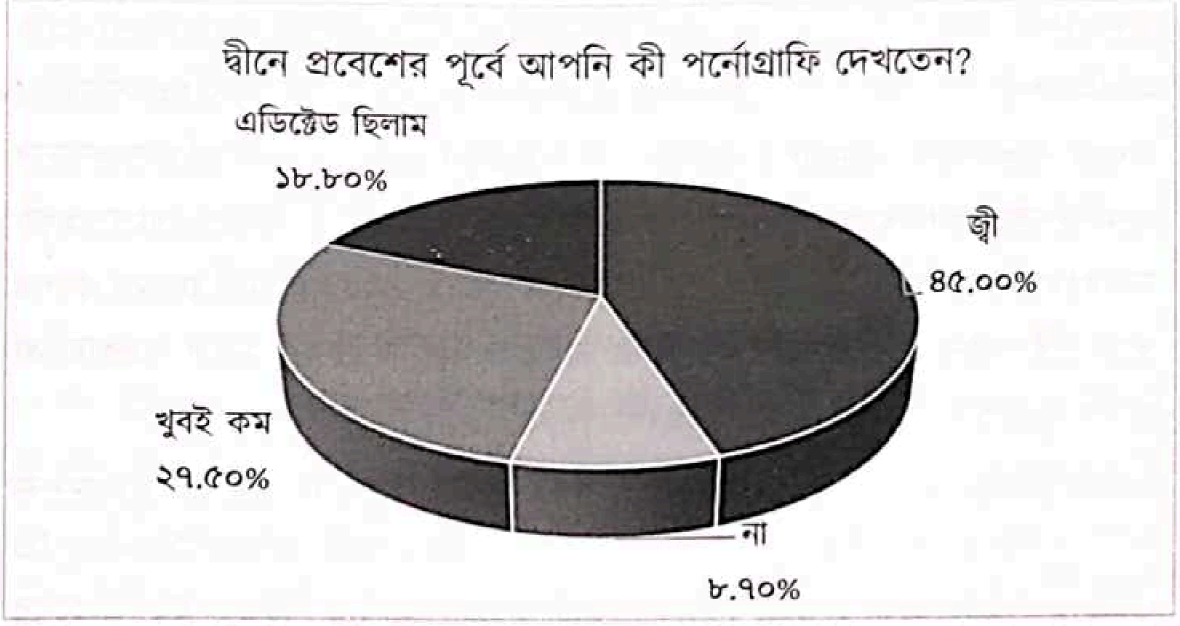
২. পাপের সাগরে নিমজ্জিত একজন পুরুষ

একজন পুরুষের অন্তরে এমন অনেক কিছুই উদিত হতে পারে, যা একজন নারী কল্পনাও করতে পারে না। হারাম সম্পর্ক, পরকীয়া, পতিতালয়ে গমন, ধর্ষণের ইত্যাদির মতো জঘন্যতম কাজগুলো সংঘটিত হয়ে থাকে পুরুষদের মাধ্যমেই। পুরুষদের জীবনে যৌনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়। কিন্তু অধিকাংশ নারীই পুরুষদেরকে নিজেদের মতো নিষ্পাপ চিন্তাধারার মনে করে থাকে। এরপর সেই অচেনা-অজানা পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব করে, অবাধ কথাবার্তা চালায়, ঘুরাঘুরি করে বেড়ায়। অতঃপর অধিকাংশ সময় সেই পুরুষের মাধ্যমেই সে নির্যাতিত হয়, ধর্ষিত হয় অথবা আপন ইচ্ছায় সেই নারী নিজের দেহ সেই পুরুষের উদ্দেশ্যে উজাড় করে দেয়। পুরুষদের

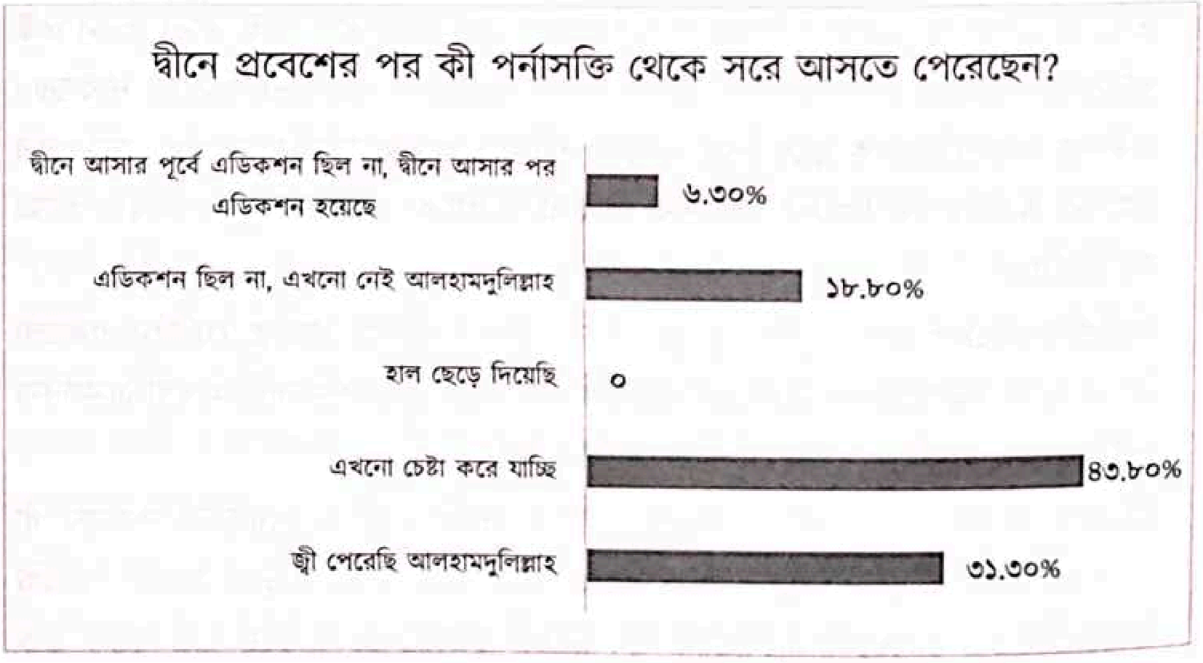
চায়ের আড্ডা মুখোরিত থাকে তাদের গার্লফ্রেন্ড-জাস্টফ্রেন্ডদের অঙ্গের মাপ, গোপনাঙ্গের ব্যাখ্যা অথবা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের গল্প দিয়ে। অধিকাংশ নারীই এসব বিষয়ে বেখবর।

তবে দ্বীনদার মহলে এই ফিতনা নেই বললেই চলে। কতিপয় দ্বীনের বুঝসম্পন্ন পুরুষদের অন্তরে যৌনতার যেসব ব্যাধি ভর করে বসেছে তার অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে পর্নোগ্রাফি। কেননা অন্তর রোগাগ্রস্থ দ্বীনদারদের ক্ষেত্রে পরকীয়া, পতিতালয়ে গমন, ধর্ষণের চেয়ে গোপন পাপ তথা পর্নোগ্রাফি ও হস্তমৈথুনে লিপ্ত হওয়া সহজতর। অনেক সংসার ভেঙে যাওয়ার জন্য দায়ী ওই নীল জগৎ। দ্বীনদার মহলের অধিকাংশ নারীই জানে না ওই জগতটা সম্পর্কে। অনেকের ধারণা দ্বীন মেনে চলা সকল পুরুষই সম্ভবত আল্লাহর বিধি-নিষেধ পুরোপুরিভাবেই মেনে চলে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কিছু দ্বীনদার পুরুষও এই মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্থ। জেনারেল পড়ুয়া দ্বীনদার পুরুষদের অতীত হয়ে থাকে ভয়ানক। অনেকেই যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়। অনেকে আবার সেই অতীতের কল্পনার হাতছানিতে বারবার সেই পাপের সাগরে ডুব লাগায়। তবু তারা যুদ্ধ করে অন্তরের বিরুদ্ধে, কিন্তু বেশ কিছু কারণেই অনেক সময় সফলকাম হতে পারে না। বিবাহিত পুরুষদের জন্যও পর্নোগ্রাফি হতে পারে ফিতনার কারণ। অন্তত আমাদের জরিপ তা-ই বলে। যদি এমনটাই হয় যে, বিবাহিত পুরুষরাও পর্নোগ্রাফির ফিতনায় পতিত হচ্ছে তাহলে বুঝে নিতে হবে সেখানে তাদের স্ত্রীদের কিছু গাফেলতি অবশ্যই রয়েছে। আর গাফেলতিটা এখানেই যে, সেই নারী হয়তো ধরেই নিয়েছে তার স্বামী সম্পূর্ণ ফিতনামুক্ত। পুরুষদের মানসিকতা ও এই পর্নোগ্রাফির দুনিয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকাও এর অন্যতম কারণ। পুরুষদের মুখ থেকেই আমরা এমনও শুনেছি যে, ২-৩ বছর ধরে বিবাহিত, অথচ স্বামী পর্নআসক্ত, তবে স্ত্রীর কাছে তা অজানা। তাই এটা একজন নারীর জন্য কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে যে, পুরুষদের বিষয়ে সে ভালো করে জানুক। কেননা, আল্লাহর লিখন থাকলে হয়তো তার জন্য এমনই একজন অন্তরের রোগী অপেক্ষমাণ রয়েছে, তাকে চিকিৎসার দায়িত্ব তো সেই নারীরই।

আমাদের জরিপ বলে, দ্বীনে প্রবেশের পূর্বে ৯১.৩০% পুরুষ পর্নদেখেছে। এর মাঝে ৪৫% পুরুষ সাধারণভাবে পর্নদেখতো, ২৭.৫০% খুব কম হলেও পর্নদেখতো আর ১৮.৮০% পর্নাসক্ত ছিল।



জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে দ্বীনে আসার পরও পর্নআসক্তি রয়ে গেছে ৫০.১০% পুরুষের। এর মাঝে দ্বীনে আসার পর পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্ত হয়েছেন ৬.৩০% পুরুষ। আসক্তি থেকে সরে আসতে পেরেছেন মাত্র ৩১.৩০% পুরুষ। আর আগে থেকেই আসক্তি ছিল না ১৮.৮০% পুরুষের।



৩. পর্নোগ্রাফি পুরুষদের অন্তরকে যেভাবে বিকৃত করেছে

আমাদের জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে যারা পর্নআসক্ত তাদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে, কোন ধরনের পর্নদেখে তারা অধিক অভ্যস্ত। অনেকেই একাধিক ধরনের প্রতি অভ্যস্ততার কথা জানিয়েছেন। সবগুলোকে আমরা ৬টি ধরনে একত্রিত করেছি। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

অস্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ- প্রায় ২৬.৬৬% পুরুষ অস্বাভাবিক মাপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট। অর্থাৎ স্তন কিংবা নিতম্বের অস্বাভাবিক মাপ যা পর্নতারকারা বিভিন্ন সার্জারির মাধ্যমে করে থাকে। সাধারণত নারীদের দেহের এসব বিশেষ অঙ্গের প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ রয়েছে। একজন পুরুষ যখন এধরনের পর্নদেখে অভ্যস্ত হবে তখন স্বভাবগতভাবেই তার দৃষ্টি বাস্তবেও এমন কিছুই খুঁজবে এবং নারীদের দেহের সেসব স্থানে দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করবে। আমাদের নারীদের পর্দাটা কেমন হওয়া দরকার তা আমরা এ থেকেই আঁচ করতে পারছি।

অত্যাচারমূলক- উত্তরদাতাদের মাঝে প্রায় ৩৩% পুরুষ বলেছেন তারা অত্যাচারমূলক পর্নদেখে অভ্যস্ত। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ বা গণধর্ষণজনিত পর্নো, রাস্তাঘাটে জোরপূর্বক নারীদের শরীরে হাত দেওয়া, নির্যাতন করা ইত্যাদি জাতীয় পর্নো। এই জরিপের অংশগ্রহণকারীগণ সামান্য হলেও দ্বীনের বুঝ রাখে। তারা এরকম ভয়ানক ধরনের পর্নদেখে অভ্যস্ত। যদিও আল্লাহর ভয়ে হয়তো তারা একে বাস্তবে রুপান্তর করে না। কিন্তু যাদের অন্তরে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ভয় নেই তাদের মাঝে এই ধরনের পর্নউপভোগ করার প্রবণতা নিসঃন্দেহে অধিক। আর তাদের অন্তরে তাক্বওয়ার অনুপস্থিতির কারণে তারা যা দেখে তা বাস্তবে রূপান্তর করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাই তারা তখন এই অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য নির্যাতন করে তাদের স্ত্রীদেরকে বা অন্য কোনো নারীকে। এমনকি রাস্তাঘাট থেকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের নযিরও আমরা অহরহ দেখছি। আমাদের সমাজে অগণিত মা-বোনের ধর্ষণের শিকার হওয়ার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে পর্নোগ্রাফি।

সম্মিলিত বা গ্রুপ- ৩০% পুরুষ বলেছেন তারা এমন পর্নদেখে অভ্যস্ত, যেখানে একজন নারীর সাথে একাধিক পুরুষ বা একজন পুরুষের সাথে একাধিক নারী অথবা একাধিক নারীর সাথে একাধিক পুরুষ যৌনমিলনে লিপ্ত হয়।

লিক হওয়া পর্নো- প্রায় ২৮% পুরুষ বলেছেন তারা নারী ও পুরুষের সজ্ঞানে বা গোপনে ধারণকৃত যৌনমিলনের লিক বা ভাইরাল হয়ে নেটে ছড়িয়ে যাওয়া ভিডিও দেখে অভ্যস্ত। এ ধরনের পর্নোগ্রাফি খুব দ্রুতই ইন্টারনেটে ছড়িয়ে যায় ফলে উক্ত নারী-পুরুষের জন্য তা চরম লজ্জার কারণ হয় যেহেতু তারা পেশাদার পর্নতারকা নয়। এই লজ্জার কারণে অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়।

বিকৃত যৌনাচার- ৪৩.৩৩% পুরুষ বলেছেন তারা বিকৃত কর্মকান্ড সংবলিত পর্নউপভোগ করে। পায়ুপথে সঙ্গম, উভয়লিঙ্গ, নারীদের পায়ের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ (foot fetishism), নারী সমকামী, অল্প বয়সী বা শিশুদের নিয়ে তৈরি

পর্নইত্যাদি এই ধরনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসবের কুফল ব্যাপক। আমাদের এমনও শুনতে হয়েছে যে, দ্বীনদার দম্পতি অথচ স্বামী তার স্ত্রীকে পায়ুপথে সঙ্গম করতে বাধ্য করে।

ইন্সেস্ট (incest) – 'ইন্সেস্ট' শব্দটির সাথে অনেকেই পরিচিত নন। ইন্সেস্ট বলতে মূলত বোঝায় নিজের রক্তের সম্পর্কের কারও সাথে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা। অর্থাৎ ভাই-বোন, মা-ছেলে, বাবা-মেয়ে একে অপরের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া (নাউযুবিল্লাহ)। আমাদের জরিপ অনুসারে প্রায় ২০% পুরুষ এই ধরনের পর্নদেখে অভ্যস্ত। আমাদের রক্তের পবিত্র বন্ধনগুলোকে কতটা ঠুনকো করে দিচ্ছে এই যৌনতা তা অভাবনীয়। আজ বাবার কাছে মেয়ে সুরক্ষিত না, ভাইয়ের কাছে বোন সুরক্ষিত না— এমনই এক জগতে আমরা বাস করছি। আমরা জানিও না, হয়তো আমাদের সমাজে হাজার হাজার পুরুষ এই ধরনের পর্নদেখে অভ্যস্ত হয়ে নিজেদের মা-মেয়ে-বোনের দিকেই কুদৃষ্টি দিচ্ছে। আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝতে এক বোনের লেখা আমরা এক নিশ্বাসে পড়ে নিতে পারি। আশা করি লেখাটি থেকে এই ভয়ানক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পেতে আমাদের সুবিধা হবে–

"

মাহরাম পুরুষ!! ইসলাম চৌদ্দ জন মাহরামের গণ্ডি ঠিক করে দিয়েছে আমাদের জন্য। মাহরামের সামনে শালীন পোশাকে থাকতে হয়, অর্থাৎ কেবল সতর ঢাকার বিধান রয়েছে। এই মাহরাম আমাদের কাছে 'সেফটি' স্বরূপ। আমরা চোখ বুজে তাদের বিশ্বাস করি। অথচ এই মাহরামের কাছ থেকেও যখন যৌন নিপীড়নের কথা শুনি বুক কেঁপে ওঠে! খণ্ড খণ্ড কয়েকটা ঘটনা বলি...

গতবছর, সম্ভবত জানুয়ারির দিকে এক বোনের জন্য মাসআলা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান প্রায়। বোনের সমস্যা ছিল— বোনের সম্মতিতেই তাঁর বাবার সাথে শারীরিক মেলামেশা হয়েছে। বোন তখন ছোট ছিল, দশ-এগারো বছর বয়স, সেসব বুঝতো না। বারো বছর বয়সে বাবা মারা যায়, সতেরো বছর বয়সে বোন দ্বীনের বুঝ পায়। আমাকে যখন কথাগুলো বলছিল, বোনের বয়স তখনও আঠারো পূর্ণ হয়নি। আমার দুনিয়া সেদিন থেমে গিয়েছিল। এটা কি করে হয়! বাবা কীভাবে মেয়ের দিকে হাত বাড়ায়? দশ বছর বয়সী মেয়েটা তো খুব বড়ও নয়। তাহলে!

তখন আমি মাসআলা কোর্সে একদম নতুন, সদ্য শিখছি-শিখছি অবস্থা। এর মাঝে এক বোন খুব ইতস্তত হয়ে উস্তাযাকে বললো তাঁর একটা মাসআলা জানা প্রয়োজন।

অসুস্থ শ্বশুরের সেবা করার সময় শশুরের হাত যদি পুত্রবধূর স্তন ছুঁয়ে যায়, তাহলে গুনাহ হবে কিনা.......

হুরমত, তালাক, নিকাহ এই তিন ধরনের মাসআলা-সিকিং পোস্ট আমাদের গ্রুপে এপ্রুভ করা হয় না। করলেও আমরা লিখিত মাসআলা আনার কথা বলে ডাক যোগাযোগের ঠিকানা দিয়ে কমেন্ট অফ করে রাখি। প্রায় দু-তিন মাস আগে হয়েছিল কি—একজন এডমিনের অসতর্কতাবশত হুরমত সংক্রান্ত একটা পোস্ট এপ্রুভ হয়ে যায়, যেখানে কন্যার সাথে বাবার কামনা বিষয়ক কোনো স্পর্শের ঘটনা ঘটলে বাবা মায়ের বিবাহ বন্ধন থাকবে নাকি ডিভোর্স হয়ে যাবে তার ওপর নির্ভর করে *আল কাউসারের* একটা উত্তর কপি করা ছিল।

আঠারো মিনিটের মাঝে ওই পোষ্ট এতো রিচ হলো আর কমেন্টবক্সে এতো এতো প্রশ্ন আসলো যে বলার বাইরে। আমি স্রেফ মুফতির সাথে যোগাযোগের কথা বলে কমেন্ট অফ করে দিই। ওই মুহূর্তে পোস্টটা ডিলিট করার কোনো রাস্তা ছিল না। সেখান থেকেই এক আপু আমাকে ইনবক্স করে। আপু জানতে চায় যে- বোন ঘুমাচ্ছে, এমন সময় যদি আপন ছোট ভাই তার বোনকে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করে, তখন বিধান কী? বাবা-মায়ের সম্পর্ক থাকবে তো?

আমি মেসেজটা দেখে থ হয়ে গিয়েছিলাম। ছোট ভাইটা বোনের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে কীভাবে? 'আপু, আপু' করে কি এখনও বোনকে ডাকে? আমার নিজের দুইটা ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়লো তখন। ভাই দুইটা আমাকে ছাড়া কিছু বুঝেনা, ছোটটা তো একদম পাগল আমার জন্য। ওই বোনের ভাইটাও কি এমন ছিল না? ভাই হয়ে মমতাময়ী বোনের দিকে কুনজর কীভাবে দিতে পারে!

গত সপ্তাহে এক আপার মেসেজ এলো। ইয়া বড় মেসেজ। একবার আপন দাদা, অতঃপর আপন মামা কর্তৃক যৌন নিপীড়নের ঘটনা শুনে আমি কেঁদেছিলাম। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা ছিল না। আমি শুধু তাঁর সাথে টুকটাক কথা বলে তাঁর বায়োটা নিয়ে রাখলাম। বোনটার বিয়ে হয়ে যাওয়া জরুরি। নয়তো এই নিপীড়নের যাতাকলে পিষে তাকে মরতে হবে আরও হাজার বার।

আধঘণ্টা আগে একটা ফোন এসেছে। কথা বলা শেষ করে আমি লিখতে বসেছি। আপা শুধু বিলাপ করছিল, আর বলছিল, "আপা বলেন, আমাদের সম্পর্কটা এখনও হালাল আছে! হারাম হয়ে যায়নি..." তাকে মুফতির নাম্বার দিয়ে ফোন রাখলাম। আমার এখনও মাথায় ঘুরছে আপার কথাগুলো শুনে। মাকে স্বীয় স্বামীর সাথে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখেও আমার বোনটা বেঁচে আছে কেমন করে! আমি হলে হয়তো দম আঁটকে মরে

যেতাম! নিজের মা, নিজের স্বামী। একজনের পায়ের নিচে জান্নাত আর আরেকজন জান্নাতের সাথি। এতবড় ভয়ানক দৃশ্য বোনটা সহ্য করলো কীভাবে!

......

মাহরামের এই ধরনের ঘৃণ্য কাজের পেছনে বড় একটা কারণ হলো এই ফিতনার জামানা তথা নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, পর্নো, আইটেম সং, সাধারণ সিরিয়াল টাইপ টিভি-প্রোগ্রামসহ নানাবিধ জলসা। পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানের অপ্রতুলতা, নারীকে পণ্যে পরিণত করে তোলাও এসবের বড় কারণ।

তবুও মাঝেমাঝে ভয় হয়। এসব শুনলে কেঁপে উঠি এটা ভেবে যে, আমার বাবা-ভাই-মামা-চাচা-দাদার কাছেই বা আমি কতটা নিরাপদ? তারা কি টিভির বেপর্দা নারীদের মতন করে চোখ দিয়ে আমাদেরও গিলে খায়? তাদের কি ভালোবাসা, সম্মান, সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ, লাজ-লজ্জা বলতে এখনো কিছু বাকী আছে? আর ভাবা যায় না, গলা শুকিয়ে যায়। আমাদের জন্য মাহরাম হচ্ছে গাইরে মাহরামদের কাছ থেকে নিজেদেরকে রক্ষার হাতিয়ার। কিন্তু মাহরামই যদি আমাদের ধ্বংস করতে আসে তাহলে আমরা যাব কই?

”

বোন *আমিনা বিনতে আব্দুল মুক্বীত*—এর লেখা। (কিছুটা পরিমার্জিত)

উপরের অংশের বিষয়বস্তু এমনভাবে সাজানো যাতে নারীগণ পুরুষদের মানসিকতা বুঝে নিজেদের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তারা যাতে এই বিষয়ে বেখবর না হন যে পুরুষেরা কতটা গভীর পাপে নিমজ্জিত থাকতে পারে। একজন নারীর জীবনে তার পিতা আছে, ভাই আছে। বিয়ের পর তার জীবনকে উজ্জ্বল করে তার জীবনসঙ্গী। কিন্তু হতেও তো পারে যে, তাদের মাঝে কেউ এই নীল সাগরের অথৈ পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের হাত ধরে পাড়ে তুলে আনার দায়িত্ব তো নারীরই। নারীদেরকে আল্লাহ ﷻ এক অসামান্য ক্ষমতা দিয়েছেন– নারীরা বেপর্দা, বেহায়া হয়ে গেলে সমাজ ভঙ্গুর হয়ে যায়; আবার নারীরাই একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাজকে তার প্রকৃত স্থানে ফিরিয়ে আনতে পারে। সার্বিক বিবেচনা করেই দারসটি সাজানো। পুরুষ জাতিকে খাটো করা কস্মিনকালেও আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বর্তমান সমাজ আমাদেরকে জানান দিচ্ছে যে ভবিষ্যৎ আরও ভয়ানক। আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অপেক্ষা করছে পর্নোগ্রাফির ঘুটঘুটে অন্ধকার। একজন মা তখনই তার সন্তানকে ওই মরণথাবা থেকে বাঁচাতে পারবে যখন তিনি নিজেই সেই

মরণথাবাকে চিনবে। তাই বর্তমান সমাজের এহেন পরিস্থিতি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখা প্রতিটি নারীর জন্য জরুরত বলেই আমরা মনে করি।

৪. শিশুরা কি পর্নোগ্রাফি থেকে মুক্ত?

শিশুদের নিষ্পাপ চেহারা দেখলে আমাদের অন্তরে একটা প্রশান্তি অনুভূত হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ের শিশুরা; বিশেষ করে ছেলে বাচ্চাগুলোর মাঝে একটু তাড়াতাড়িই পাকনামো টের পাওয়া যায়। বাসায় কোনো নারী বেড়াতে আসলে এরা তাদের সংস্পর্শে থাকতেই অধিক পছন্দ করে। মাঝে মাঝে কথা বার্তায় একটু অন্যরকম ভাব থাকে। ৬-৭ বছরের বাচ্চাদের মাঝেই এমন দেখা যেতে পারে, এর অধিক বয়সের যারা আছে তাদের কথা তো বাদই দেওয়া গেল।

মূল বিষয় হচ্ছে, আমাদের বর্তমান জামানার আল্ট্রাস্মার্ট পিতামাতাগণ খুব অল্প বয়সে বাচ্চাদের হাতে ইন্টারনেট সমেত ফোন বা কম্পিউটার তুলে দিচ্ছেন। আর এর পরিণতি কেমন হতে পারে এই বিষয়ে অভিভাবকগণ থাকে সম্পূর্ণ বেখবর। ইন্টারনেট আজ এতোটাই খোলামেলা যে, কেবল কয়েকটি টাচ বা ক্লিকের ব্যবধানে জিনায় জড়ানো সম্ভব। পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে কর্মরত একটি বিদেশি সংস্থার মতে, পর্নোগ্রাফি ভিডিও বা পর্নোসাইট আকস্মাৎভাবে বাচ্চাদের চোখের সামনে চলে আসাই ছোটকাল থেকে পর্নাসক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। পর্নসাইটগুলোতে বয়সের তথাকথিত সীমা ১৮ বা তার বেশি। অথচ কেবল একটি ক্লিক করেই ১৮ বছরের কম বয়স্ক শিশুরাও সাইটগুলোতে ঢুকতে পারে। পর্নোগ্রাফির সংস্পর্শে আসার গড় বয়স মাত্র ১১ বছর। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই প্রায় ৯৩.২% ছেলে এবং ৬২.১% মেয়ের সামনে পর্নোগ্রাফি উন্মুক্ত হয়।[২]

অস্ট্রেলিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ফ্যামিলি স্টাডি—এর এক জরিপে উঠে এসেছে আরও ভয়ানক তথ্য। সেখানে এক মাস ধরে জরিপ চালিয়ে দেখা গিয়েছে ৪৪% শিশু যাদের বয়স সর্বনিম্ন ৯ বছর, তাদের সামনে কোনো না কোনোভাবে অশ্লীল কন্টেন্ট প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

অনলাইন সিকিউরিটি কোম্পানি *বিটডিফেন্ডার*—এর নতুন গবেষণায় জানা যায় যে, পর্নোগ্রাফি সাইটে যারা প্রবেশ করে তাদের মাঝে ২২% ই দশ বছরের কম বয়সী

২]https://www.netnanny.com/blog/the-detrimental-effects-of-pornography-on-small-children/

৩] https://aifs.gov.au/publications/effects-pornography-children-and-young-people-snapshot

শিশু। সেখানে আরও বলা হয় যে, ১০ জনের মধ্যে ১ জন ১০ বছরের কম বয়সী শিশু অশ্লীল ভিডিওর সাইটে প্রবেশ করে।[8]

ইন্টারনেট ঘাটলে এমন আরও শত শত সার্ভে পাওয়া যাবে যেখানে এই ভয়ানক বিষয়টির সত্যতা উঠে এসেছে। পর্নোগ্রাফির এই ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্ত নয় কোমলমতি শিশুরাও।

এমতাবস্থায় আমাদের করণীয়

◐ নারীদের উচিত মাহরাম নয় এমন শিশুর সামনে নিজেদের পর্দার বিষয় খেয়াল রাখা। খুব ভালোভাবে বাচ্চাটির চাল-চলন, কথাবার্তা, চাহনী ইত্যাদির দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। এরপর যদি সেই শিশুর সামনে পর্দা জরুরি বলে মনে হয় তাহলে পর্দা নিশ্চিত করা নারীদের দায়িত্ব।

◐ নারীরা তাদের ঘরের বাচ্চাদের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবে। ছোট ভাই, ভাগ্নে, ভাতিজা কিংবা নিজের সন্তান—তাদের দিকে খুব ভালোভাবে নজর রাখতে হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত খুব প্রয়োজন না হলে তারা যাতে কোনোমতেই স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংস্পর্শে না আসতে পারে।

◐ বাচ্চারা বাসার বড়দের কারো মুঠোফোন লুকিয়ে লুকিয়ে চালাচ্ছে কিনা সেদিকেও নজর রাখা জরুরি।

◐ যখন তাদের যথেষ্ট বুঝ হবে তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাদের হাতে দেওয়ার প্রয়োজন হলে এর পূর্বে এসবের কুফল অবশ্যই বর্ণনা করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

◐ এরপরও তাদেরকে একদম ছেড়ে দিলে চলবে না। ইন্টারনেটে তারা কি করে সেদিকে জোর নজরদারিতা রাখতে হবে।

◐ সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বিভিন্ন প্যারেন্টিং সিকিউরিটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

8] https://www.netnanny.com/blog/the-detrimental-effects-of-pornography-on-small-children/



||৯ম দারস||

নারীবাদ

১. ফেমিনিজমের প্রবর্তনা এবং এর উদ্দেশ্য

চতুর্দশ শতাব্দীতে *'দ্য বুক অফ দ্য সিটি অফ লেডিস'* বইটির ইতালীয়-ফরাসি লেখিকা ক্রিস্টিন ডি পাইজান সামসাময়িক নারী বৈষম্যের বিরুদ্ধে লিখেছিল। এছাড়াও প্রাথমিক সময়ের অন্যান্য আরও অনেক লেখিকা রয়েছে যারা মূলত নারীবাদী মতধারার প্রাথমিক প্রবর্তনা করে।[১] তবে এরও পূর্বে প্লেটো নারীদের রাজনৈতিক ও যৌন সাম্যতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিল।[২]

চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপের অঞ্চলগুলোতে সত্যিকার অর্থেই নারীদেরকে অনেক নিচু করে দেখা হতো। ইউরোপে প্রচলিত ধর্মের দোহাই দিয়েই তারা মূলত নারীদেরকে নিচু করে দেখতো এবং তারা নারীদের অধিকারের বিষয়ে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। বস্তুত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তথা বিকৃত বাইবেলের শিক্ষা এরকমই ছিল। যখন নারী লেখিকারা নারী অধিকারের পক্ষে কলম চালাতে শুরু করে তখন সেটা সাধারণভাবেই খ্রিস্টধর্মের বিরোধিতায় রূপ নেয়।

এভাবেই নারীবাদীদের সাথে ধর্মের একটা ঠান্ডা মাথার যুদ্ধ নারীবাদী মতবাদের শুরু থেকে আজ অব্দি চলে আসছে। যে সকল দিক থেকে সমাজে নারীদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে সেসবের বিরুদ্ধেই মূলত নারীবাদীরা প্রাথমিকভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে যা সেই সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রশংসনীয় ছিল এবং অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। কিন্তু যুগের সাথে সাথে নারীবাদী মতবাদের মধ্যে অনেক নতুনত্ব এসেছে। নারীবাদী মতধারার ইতিহাসকে ৩টি সময়ে বিভক্ত করা হয়। বর্তমান সময়ে এসে পূর্বের মতধারার সাথে আরও অতিরিক্ত কিছু বিষয় বা দাবি যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো নারী-পুরুষ সমঅধিকার। পুরুষেরা যা কিছু করে ও করতে পারে তার সবই নারীরাও করবে। পুরুষেরা চাকরি-বাকরী করতে পারে তাই নারীরাও তা করবে। পুরুষেরা যেখানে-সেখানে, যখন-তখন, রাত-বিরাতে বের হতে পারে তাই নারীরাও রাত-বিরাতে রাস্তায় বের হবে। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বে এমন আন্দোলনও

---

[১] https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_feminism

[২] Women in Search of Utopia, পৃষ্ঠা- ২০৯ ও ২১১

হয়েছে এবং হচ্ছে যেখানে দাবি তোলা হয়— পুরুষেরা যেমন দেহের উপরিভাগের পোশাক তথা শার্ট-গেঞ্জি লোকসম্মুখে নির্দ্বিধায় খুলে ফেলতে পারে নারীদেরও সেই অধিকার থাকা দরকার। সেই জের ধরে নারীবাদী কর্মীরা নিজেদের বক্ষ উন্মুক্ত করে Free the Nipple ধ্বনিতে দাবি তুলেছিল। পরবর্তীতে আমেরিকার ৬টি রাজ্যে নারীদের জন্য দেহের উপরিভাগ অনাবৃত রেখে জনসম্মুখে চলাফেরার বৈধতা দেয়া হয়েছে। এরকম নিকৃষ্ট পর্যায়ে রয়েছে বর্তমানের নারীবাদীরা।

মূল কথা হচ্ছে নারীবাদীদের বর্তমান অবস্থান এই যে, তারা নারী বৈষম্য দূর করতে এবং নারী স্বাধীনতা কায়েম করতে গিয়ে নারীদের স্বকীয়তা হারাতে বসেছে। তারা পুরোপুরিরূপে পুরুষদের অনুকরণ করার মাধ্যমে যেন উল্টো এটাই মেনে নিচ্ছে যে পুরুষেরা অনুকরণীয়। এতে নারীবাদীদের মূল ধারার কর্মীরা নবীনদের এই বুঝের সমালোচনাও করেছে।

২. ফেমিনিস্টদের ইসলামবিরোধী অবস্থান

ইতিহাসের গোড়ার দিক থেকেই নারীবাদীরা ধর্মের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিল। সেই পরম্পরা আজও টিকে আছে। তারা ইসলামের অনেক বিধানের বিরোধিতা করে থাকে, এমনকি অনেক বিধান নিয়ে ঠাট্টাও করে থাকে। তারা ইসলাম সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান রাখে এবং এই বিষয়ে তাদের ধারণাও নেই যে, ইসলাম কীভাবে নারীদেরকে সম্মানিত করেছে। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তেমনই কিছু চিন্তাধারা নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে—

◈ পর্দার বিধান নারী স্বাধীনতার পরিপন্থি

নারীবাদীরা প্রচার করে পর্দার বিধান নারীদের জন্য লজ্জাজনক এবং এটি নারী স্বাধীনতার পথে বাঁধা। তাই তারা পর্দার বিরুদ্ধে তথাকথিত সামাজিক সচেতনতামূলক অনেক কর্মসূচী হাতে নিয়ে থাকে।

পূর্বেও আমরা পর্দার বিষয়ে জেনেছি যে বর্তমান সময়ে পর্দার প্রয়োজনীয়তা কতটা বেশি। পর্দা কখনই নারী স্বাধীনতার অন্তরায় নয় বরং পর্দা নারীদেরকে নফসের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। পুরুষদের অনুকরণের মাঝে স্বাধীনতা না খুঁজে বরং নিজেদের সকীয়তাকে চেনার সুযোগ করে দিয়েছে এই পর্দার বিধান। পর্দা নারীদেরকে সে সমস্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষদের থেকে আলাদা করেছে যারা নিজেদেরকে নিয়ে ভাবে না, যারা কচুরিপানার মতো ট্রেন্ডের স্রোতে গা ছেড়ে দিয়েছে।

◈ সংসার সামলানো নারীদের কাজ নয়

নারীবাদীরা বোঝাতে চায় যে, যুগ যুগ ধরে মানুষ কুসংস্কারের মাঝে ডুবে আছে। নারীরা কেবলই ঘর সামলাবে, বাচ্চা পালবে আর স্বামীর খেদমত করবে এসব কুসংস্কার, এই শিকল ভাঙতে হবে! তাদের এই যুক্তির যথেষ্ট অসারতা রয়েছে। অপরদিকে শরঈ বিধানগুলোর মাঝে যৌক্তিকতা আছে, রয়েছে সুদূরদর্শীতা। আল্লাহ ﷻ প্রতিটি মানুষকে তার যোগ্যতা, কার্যক্ষমতা ও অবস্থানের ভিত্তিতে দায়িত্বারোপ করেছেন। শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা, কঠিন কাজগুলো সহজে করতে পারার মতো সামর্থ্য দিয়ে পুরুষদেরকে আল্লাহ ﷻ সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া বাহিরের জগৎ মন্দ। কর্মক্ষেত্রে নানান চিন্তাধারার মানুষ একত্রিত হয়। হিংসা, অহংকার, রাগ ইত্যাদির কারণে অনেকসময়ই কলহের সৃষ্টি হয়। আর পুরুষদের আল্লাহ ﷻ দিয়েছেন আত্মরক্ষার ক্ষমতা। এছাড়া ঘরের বাহিরে যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা পুরুষদের নেই বললেই চলে। ফলে বাহিরের জগৎ পুরুষদের জন্যই মানানসই। তাই পুরুষদের ওপর দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে যে, তারা ঘর থেকে বের হয়ে রিযিক সন্ধান করবে আর তাদের ঘরের নারীদের জন্য ব্যয় করবে।

অপরদিকে নারীদেরকে আল্লাহ ﷻ সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ ধৈর্য্যশক্তি দিয়ে। নারীদের অন্তরে মায়া মমতাও অধিক দিয়েছেন তার সৃষ্টিকর্তা। পুরুষেরা এদিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। ঘরের কাজগুলোতে প্রয়োজন হয় ধৈর্য্যের। যেমন : গরমের মধ্যেও অসহনীয় তাপে দাড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রান্না করা, ঘরের মানুষগুলোর সাথে ভাব রেখে চলা, গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসামান্য ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। সন্তান লালন পালনের বিষয়টা মায়েদের সাথেই যায় কারণ এটাই নারীদের সহজাত। এমনকি সন্তানের রিযিকও নারীর শরীরেই বিদ্যমান রয়েছে যাতে ঘরে থেকেই নারীরা তাদের সন্তানের পরিচর্যা ও আহারের জোগান দিতে পারে। এছাড়া বাহিরের জগতের মারপ্যাঁচ নারীরা বুঝবে না, শক্তি সামর্থ্যের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে, আত্মরক্ষার দিক থেকেও দুর্বল। সেই সাথে যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ব্যাপক। তাই আল্লাহ ﷻ প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

আল্লাহ কারও ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত। [৩]

তাই পুরুষদের দায়িত্ব বাহিরের কষ্টের কাজগুলোর সম্পাদনা করা। আর নারীরা হচ্ছে সংসারের পরিচালিকা। সংসারের বিষয়ে আধিপত্য দেওয়া হয়েছে স্ত্রীরই হাতে।

---

[৩] সূরা বাকারাহ- ২৮৬

একারণেই আরবদের মাঝে নারীদেরকে ربة البيت অর্থাৎ 'ঘরের প্রতিপালনকারী' বলার প্রচলন রয়েছে।

◈ সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমানে সমান

ইসলাম কখনই সমতার কথা বলে না, বরং ইসলাম বলে ন্যায় ও ইনসাফের কথা। সমতা আর ইনসাফ একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। যার যেটা প্রয়োজন তাকে সেটার যোগান দেওয়া হচ্ছে ন্যায়তা। আর কোনো একটি বস্তুর প্রয়োজন কারও একদমই নেই, আবার কারও অধিক প্রয়োজন রয়েছে; এসত্ত্বেও উভয়কেই সেই বস্তুটি সমহারে প্রদান করা হচ্ছে সমতা।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। মনে করা যাক হাতি, বানর, মাছ, পাখি—এই চারটি প্রাণীর মাঝে গাছের চূড়ায় আরোহণের প্রতিযোগিতা হলো। স্বভাবতই চার প্রাণীর মাঝে পাখি উড়াল দিয়ে সবার আগে গাছের চূড়ায় পৌঁছে যাবে, বানর লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের চূড়ায় উঠে গিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে। হাতি চেষ্টা করবে গাছে উঠতে কিন্তু কস্মিনকালেও গাছের চূড়ায় উঠতে পারবে না। আর মাছতো পানি ছেড়ে ডাঙায় এসে গাছে ওঠার চেষ্টাটুকুও করতে পারবে না। একেক প্রাণীর সামর্থ্য একেক রকম। তবুও এদেরকে একই প্রতিযোগিতা দেওয়ার বিষয়টা সমতা দেওয়ার মতোই। এখানে ন্যায়বিচার হয়নি। এমনকি, ভালোভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে সমতাও হয়নি। পাখির জন্য প্রতিযোগিতায় অধিক সুবিধা ছিল, পক্ষান্তরে মাছের জন্য প্রতিযোগিতায় কোনো প্রকার সুবিধাই ছিল না যদিও সবার জন্য প্রতিযোগিতা একই ছিল।

প্রতিযোগিতাটিতে ন্যায় রক্ষা করা যেত যদি চার প্রতিযোগীর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিযোগিতা নির্ধারণ করা হতো। যেমন : হাতির জন্য প্রতিযোগিতা- একটা গাছ সে কত তাড়াতাড়ি উপড়ে ফেলতে পারবে, পাখির জন্য প্রতিযোগিতা- নির্দিষ্ট একটি দূরত্ব সে কতটুকু সময়ের মাঝে উড়ে পাড়ি দিতে পারবে, বানরের জন্য প্রতিযোগিতা হলো কতটুকু সময়ের মাঝে সে গাছের চূড়ায় উঠে যেতে পারবে আর মাছের জন্য প্রতিযোগিতা হচ্ছে কতক্ষণের মাঝে সে নির্দিষ্ট একটি দূরত্ব সাঁতরে পাড়ি দিতে পারবে। এবারই প্রকৃতপক্ষে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেই সাথে সত্যিকার অর্থে সমতাও নিশ্চিত হয়েছে।

জীবনে চলার পথে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে যা নারীদেরকে দেওয়া হয়নি। কেননা সেটা পুরুষের প্রয়োজন, নারীদের প্রয়োজন নয়। আবার অনেক

ক্ষেত্রেই নারীদেরকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে যা পুরুষদেরকে দেওয়া হয়নি। কারণ সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা নারীদের, পুরুষদের নয়।

বহুবিবাহের বিধান পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। কেননা সেটা পুরুষদের প্রয়োজন, নারীদের প্রয়োজন নয়। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে পুরুষেরা স্বভাবগতভাবেই নারীদের প্রতি দুর্বল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষেরা বহুগামী চিন্তাধারার হয়ে থাকে। এছাড়া পুরুষেরা অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরে থাকে, এতে তাদের ফিতনায় পতিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। পুরুষদের ওপর এমন অনেক কিছুই বাধ্যতামূলক যা নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। যেমন পুরুষদের দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার তাগিদে জিহাদ করতে হয়, দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত গমন করতে হয় ইত্যাদি। নিসঃন্দেহে এসব কষ্টসাধ্য। ফলে পুরুষদের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রশান্তির অধিক প্রয়োজন পড়ে। তাই বিধান রয়েছে যদি তাদের দরকার হয় তাহলে স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়প্রতিষ্ঠার শর্তে সে অনধিক চারটি বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু নারীরা পুরুষদের মতো জৈবিক চাহিদা দমনের দিক থেকে ততটা দুর্বল হয় না এবং বহুগামী চিন্তা নারীদের কাছে অভাবনীয় এবং লজ্জাজনক। নারীদের প্রয়োজন নেই বিধায় নারীদের জন্য এই বিধান দেওয়া হয়নি।

অপরদিকে, পুরুষেরা নারীদেরকে তার উপযুক্ত মোহরানা পরিশোধ করে তারপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কেননা এটা নারীর হক্ব ও প্রয়োজন। একজন নারী তার নিজের ঘর ছেড়ে স্বামীর সাথে ঘর বাঁধে। বিনিময়ে তাকে দেওয়া হয় এই উপহার। তুচ্ছ, তবে তা তার জন্য কিছুটা হলেও আনন্দের। অপরদিকে, যদি অমিলের কারণে তালাকের মাধ্যমে দম্পতি আলাদা হয়ে যায় তাহলে সেই মোহরানার অর্থ সেই নারীর সাময়িক জীবিকা নির্বাহের খোরাক হিসেবে কাজে দেবে। মোহরানা তাই নারীর প্রাপ্য, পুরুষের জন্য মোহরানার বিধান দেওয়া হয়নি।

এদিকে, হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, পিতার পায়ের নীচে নয় বরং মাতার পায়ের নীচেই সন্তানের জান্নাত।[৪] আবার আরেক হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় পিতার তুলনায় মাতার মর্যাদা তিনগুণ।[৫]

একজন মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে যেই পরিমাণ কষ্ট সহ্য করে, সন্তানকে বড় করতে যতটুকু শ্রম একজন মা দিয়ে থাকেন, সন্তানের জন্য মায়েরা যেভাবে বিসর্জন দিয়ে থাকেন; একজন পিতা তুলনামূলকভাবে এতোটা অবদান রাখতে পারেন না। তাই

---

[৪] সুনানুন নাসা'ই- ৩১০৪

[৫] বুখারী ও মুসলিম; রিয়াদুস স্বলেহীন- ৩১৬

ইসলামে এইক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মাতার তথা পুরুষের তুলনায় নারীর মর্যাদাটাকে বড় করে দেখা হয়েছে। কারণ নারী এই বাহবার প্রাপ্য। এখান থেকেও আমরা বুঝি যে, যদি পিতা-মাতাকে সমান মর্যাদা দেওয়া হতো তাহলে সমতা হতো কিন্তু ন্যায় হতো না। তাই সমতার চেয়ে ন্যায়তা অধিক যুক্তযুক্ত; যা ইসলাম নিশ্চিত করেছে।

৩. যেসকল অবস্থায় নারীবাদীদের ঈমান ভেঙে যায়

ফেমিনিজম তথা নারীবাদ বলতে শরীয়তে কিছু নেই। এর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সবই ভ্রান্তি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তদের গোমরাহ বলা গেলেও কাফির বলা যায় না। কিন্তু যদি শরী'আতের অকাট্য ও সুস্পষ্ট কোনো বিষয়কে কেউ অস্বীকার করে, অভিযোগ করে কিংবা বিদ্রুপ করে তাহলে তাদের ঈমান চলে যাবে।

এসব নারীকে বিয়ে করে থাকলে ঈমান ভেঙে যাওয়ার কারণে সাথে সাথে সেই বিয়েও ভেঙে যাবে। ঐ অবস্থায় বাচ্চা হলে তা জারজ হবে! এবং তাওবা না করলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে মুরতাদ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

◈ যেসব বিষয়গুলোর কারণে ঈমান চলে যায় সেসবের মাঝে অন্যতম হচ্ছে-

◐ ***সকল বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার। তাদের মাঝে কেবল লিঙ্গ ও গঠনাকৃতির ব্যবধান রয়েছে! বাকি সব ক্ষেত্রে পুরুষ যা করতে পারবে নারীরাও তাই করতে পারবে, এতে বাধা দেওয়া ধর্মান্ধতা ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কার— এসব বললে ঈমান চলে যাবে।***

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وليس الذكر كالأنثى﴾

পুরুষেরা তো নারীদের মতো নয়। [৬]

ইমাম কুরতুবী রহ. ও ইবনে ইসহাক রহ. থেকে এর ব্যাখ্যায় এনেছেন-

لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنثى

কেননা পুরুষেরা এই (টীকায় উল্লিখিত মানত পূরণের) ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়। [৭]

---

[৬] সূরা আলে ইমরান- ৩৬, আল্লাহ এখানে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য করেছেন। মূলত উক্তিটি মারইয়াম ০—এর মায়ের। তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্য মানত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি দেখলেন তাঁর কন্যা সন্তান হয়েছে। তখন তিনি উক্তিটি এই উদ্দেশ্যে করলেন যে, তিনি যেই মানত করেছেন তা তো কন্যা সন্তানের মাধ্যমে সম্পাদনা করা সম্ভব না। কেননা পুরুষেরা তো নারীদের মতো নয় আর নারীরা তো পুরুষদের মতো নয় উক্ত মানত পূরণ করার ক্ষেত্রে।

[৭] তাফসীরে কুরতুবী- ৬/৩৩৫

◆ *বোরকা পরিধান করা ও পর্দা একটি সেকেলে ও মধ্যযুগীয় প্রথা; অনুরূপ নারীদের হিজাব ও পর্দাকে ব্যাঙ্গাত্মক ও বিদ্রুপাত্মকভাবে ট্যান্ট/তাবু, ক্যাত, জঙ্গি, ঝোপঝাড়, জঙ্গল ইত্যাদি বললেও ঈমান চলে যাবে।*

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[৮]

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

আর তোমরা যখন তাদের কাছ থেকে কিছু চাইবে, তখন পর্দার পিছন থেকে চেয়ে নাও।[৯]

◆ **আল্লাহ ﷻ কুরআনে উত্তরাধিকার হিসেবে পুরুষেরা নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ পাওয়ার বিধান রেখেছেন তা বে-ইনসাফ, আল্লাহ ﷻ মেয়েদের অবহেলা করেছে ইত্যাদি বললে ঈমান চলে যাবে।**

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে ওসীয়ত করছেন যে, ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে।[১০]

◆ **পুরুষেরা নারীর উপর কর্তৃত্ববান হবে কেন? কেনই বা নারী তার স্বামীর আনুগত্য করবে? নারীরা স্বাধীন থাকবে, কারো কর্তৃত্ব ও আনুগত্য মেনে নারীরা পরাধীন থাকবে না- এমন বললে ঈমান ভেঙে যাবে।**

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

[৮] সূরা আহযাব- ৫৯

[৯] সূরা আহযাব- ৫৩

[১০] সূরা নিসা- ১১

পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল কারণ আল্লাহ একের ওপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। [১১]

আল্লাহ ﷻ আরো বলেন,

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾

নারীদের উপর পুরুষদের একধাপ অধিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। [১২]

◆ ***পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অযৌক্তিক, অন্যায় ব্যবস্থা, ধর্মীয় গোঁড়ামি বৈ কিছুই না ইত্যাদি বলা। অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা, যেমন : অভিভাবকত্ব, সংসারের দায়ভার, রাষ্ট্র পরিচালনা, ইমামতি ইত্যাদি পুরুষ কর্তৃক সম্পাদনা হওয়া অযৌক্তিক, অন্যায় ও ধর্মীয় গোঁড়ামি; এরূপ ধারণা পোষণ করলে ঈমান থাকবে না।***

১৫, ১৬ ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

◆ ***দেশ পরিচালনায় নারী নেতৃত্ব হারাম এ কথা অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না।***

হযরত আবু বাকরাহ ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لما هلك كسرى قال من استخلفوا؟ قالوا ابنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

যখন কিসরা পদানত হলো তখন বলতে শুনেছি- "কে তার পরবর্তী খলীফা?" বলা হলো- "তার মেয়ে।" তখন রাসূল ﷺ বললেন, "সে জাতি সফলকাম হয় না, যাদের প্রধান হলো নারী।" [১৩]

হযরত আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন,

وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها

যখন তোমাদের নেতারা তোমাদের মাঝের বদলোক হয় আর তোমাদের ধনীরা হয় কৃপণ, আর তোমাদের নেত্রী হয় নারী; তখন জমিনের পেট তার পিঠের তুলনায় তোমাদের জন্য উত্তম। (অর্থাৎ জমিনের ওপরে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তোমাদের জন্য উত্তম।) [১৪]

---

[১১] সূরা নিসা- ৩৪

[১২] সূরা বাক্বারাহ- ২২৮

[১৩] সহীহ বুখারী- ৬৬৮৬; সুনানে তিরমিযী- ২২৬২; সুনানে নাসায়ী কুবরা- ৫৯৩৭; সুনানে বায়হাকী কুবরা- ৪৯০৭

[১৪] সুনানে তিরমিযী, হাদীস- ২২৬৬

عن أبي بكرة -رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أتاه بشير يبشره بظفر خيل له، ورأسه في حجر عائشة -رضي الله عنها، فقام، فخر لله -تعالى- ساجدا. فلما انصرف، أنشأ يسأل الرسول، فحدثه، فكان فيما حدثه من أمر العدو -وكانت تليهم امرأة، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: "هلكت الرجال حين أطاعت النساء

হযরত আবু বাকরাহ ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলে করীম ﷺ একবার কোথাও সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। সেখান থেকে এক ব্যক্তি বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে এলে বিজয়ের সুসংবাদ শুনে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। সিজদার পর তিনি সংবাদ বাহকের কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ শুনছিলেন। সংবাদদাতা বিস্তারিত বর্ণনা দান করলেন। উক্ত বিবরণে শত্রুদের ঘটনাবলির মধ্যে একটি বিষয় এও ছিল যে, একজন নারী তাদের নেতৃত্ব করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে বললেন, "পুরুষরা যখন নারীদের আনুগত্য করা শুরু করে দেবে, তখন তারা বরবাদ-ধ্বংস হয়ে যাবে"।[১৫]

ইমাম ইবনে হাযাম ﷺ বলেন, সকল ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো নারীর জন্য 'রাষ্ট্র প্রধান' হওয়া জায়েয নেই।[১৬]

◆ ***মুখে তালাক দিলে তালাক হবে না এবং মুখে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি মানবতাবিরোধী ও বর্বর—এমন মন্তব্য করলে। অনুরূপ তিন তালাক দিয়ে দেওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য আর হালাল থাকে না এ বিষয় অস্বীকার করলে ঈমান চলে যাবে।***

কুরআনের পরিষ্কার নির্দেশ-

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

তালাক (তথা তালাকে 'রাজঈ' হলো) দুবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে ছেড়ে দেবে।[১৭]

عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل

[১৫] মুসতাদরাকে হাকীম- ৪/২৯১, হাদীস ৭৮৭০; আখবারু আসবাহান ২/৩৪; মুসনাদে আহমাদ ৫/৪৫- ইমাম হাকেমের মতে এর সনদ সহীহ এবং যাহাবী একে সমর্থন করেছেন।

[১৬] মারাতিবুল ইজমা, ইবনে হাযাম, পৃষ্ঠা - ১২৬

[১৭] সূরা বাক্বারাহ- ২২৯

قروء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية

হযরত হাসান ﵁ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﵁ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আপন স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় এক তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর ইচ্ছা করলেন যে, দুই তুহুরে (হায়েয থেকে পবিত্র অবস্থায়) অবশিষ্ট দুই তালাক দিয়ে দেবেন। হুজুর ﷺ এই বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বলেন, "হে ইবনে উমার! এভাবে আল্লাহ ﷻ তোমাকে হুকুম দেননি। তুমি সুন্নাতের বিপরীত কাজ করেছ (হায়য অবস্থায় তালাক দিয়ে)"। তালাকের শরী'আহ সমর্থিত পদ্ধতি হলো, 'তুহুর' বা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা, প্রত্যেক 'তুহুর'-এ এক তালাক দেওয়া। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ 'রুজু' করার নির্দেশ দিলেন। এ জন্য আমি 'রুজু' করে নিয়েছি। অতঃপর তিনি বললেন, "সে পবিত্র হওয়ার পর তোমার এখতিয়ার থাকবে। চাইলে তুমি তালাকও দিতে পারবে, বা তাকে নিজের কাছে রাখতে পারবে।" হযরত ইবনে উমার ﵁ বলেন, তারপর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি যদি তিন তালাক দিই তখনও কি 'রুজু' করার অধিকার থাকবে?" হুজুর ﷺ বলেন, "না। তখন স্ত্রী তোমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। এবং তোমার এই কাজ (এক সাথে তিন তালাক দেওয়া) গুনাহের কাজ বলে সাব্যস্ত হবে।" [১৮]

◆ পুরুষেরা যেহেতু একাধিক বিয়ে করতে পারে তাই নারীদেরও একাধিক বিয়ে করার অধিকার থাকা উচিত—এরকম ভাবলে ঈমান চলে যাবে; অথচ সে জানে যে, আল্লাহ ﷻ নারীদের জন্য স্বামী থাকা অবস্থায় অন্য পুরুষকে বিয়ে করা হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া কোনো সতীসাধ্বী বিবাহিতা নারী তোমাদের জন্য হারাম। [১৯]

---

[১৮] সুনানে দারা কুতনী- ২/৪৩৮ হাঃ৮৪ ; যাদুল মা'আদ- ২/২৫৭; সুনানে বায়হাকী কুবরা- ১৪৭৩২

[১৯] সূরা নিসা- ২৪

ইমাম ইবনু কাসীর ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات

তোমাদের জন্য হারাম হচ্ছে বেগানা সতীসাধ্বী বিবাহিতা নারী। [২০]

ইমাম ত্বাবারী ﷺ তার তাফসীরে ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন,

كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام

প্রত্যেক মহিলা যার স্বামী রয়েছে সে তোমার ওপর হারাম।

আল্লামা শানক্বিতি ﷺ তার 'আদ্বওয়াউল বায়ান'-এ এর ব্যাখায় বলেন-

المراد بالمحصنات المتزوجات؛ وعليه فمعنى الآية: وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره

এখানে আল্লাহ ﷻ 'মুহস্বানাত' দ্বারা বিবাহিত হওয়া বুঝিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো- তোমাদের ওপর বিবাহিত নারীদের হারাম করা হলো, কেননা স্বামী আছে এমন নারী অন্যের জন্যে হালাল নয়।

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নারী স্বামী থাকা অবস্থায় আরেকটি বিয়ে করতে পারবে না।

◆ ***পুরুষদের জন্য আল্লাহ ﷻ প্রদত্ত একাধিক বিয়ের অধিকার রয়েছে জানা সত্ত্বেও কেউ তা অস্বীকার করলে কিংবা "আল্লাহর এই আইন আমি মানি না", "আল্লাহর এই আইন নারীদের সাথে অন্যায়"—ইত্যাদি বললে ঈমান চলে যাবে।***

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾

আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সংগত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে একটিই (বিবাহ কর) অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে। [২১]

---

[২০] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ১/৪২৯

[২১] সূরা নিসা- ৩

তবে স্বামীর একাধিক বিয়ের বিষয়ে আল্লাহর আইন মেনে নিয়ে কোনো নারী যদি স্বভাবসুলভ আচরণ থেকে ঈর্ষা করে কিংবা স্বামীকে একাধিক বিয়ে না করতে অনুরোধ করে তাহলে তা ঈমান ভঙ্গের কারণ বলে বিবেচিত হবে না।

◆ *কুরআনে লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইজন নারীর সাক্ষী এবং একজন পুরুষের সাক্ষীর যেই তুলনা রয়েছে, তা যদি কেউ অস্বীকার করে বলে– "সাক্ষীর ক্ষেত্রে নারী পুরুষ এক, তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই"; "এগুলো মোল্লাদের বানানো নীতি" ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে ঈমান চলে যাবে। অনুরূপ আল্লাহ ﷻ–এর এই বিধানকে অযৌক্তিক ও অনৈতিক বললেও ঈমান থাকবে না।*

সব ক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান হয় না। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়টি কুরআনে সুস্পষ্ট। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ﴾

অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যে দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। তখন যদি দুজন পুরুষের আয়োজন না করা যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও যাদের সাক্ষীর ব্যাপারে তোমরা আস্থাশীল এমন দুজন নারী বেছে নাও, যাতে একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।[২২]

উপরে উল্লিখিত ১০টি বিষয় রয়েছে যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এর বাহিরেও ইসলামের এধরনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়াবলি ও ইসলামের শি'আর তথা নির্দেশনাবলি অস্বীকার করলে অথবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে ঈমান চলে যাবে। এটিই চার মাযহাবসহ সকল উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ মত। মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞাস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক-ঠাট্টা করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? তোমাদের কোনো ওজর চলবে না, তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ।[২৩]

---

[২২] সূরা বাকারা- ২৮২

[২৩] সূরা আত তওবা- ৬৫ থেকে ৬৬

ইমাম ইবনুল হুমাম আল হানাফী ﷺ বলেন,

مناط التكفير هو: التكذيب أو الاستخفاف بالدين

তাকফীরের মূল উপাদানই হচ্ছে দ্বীনি কোনো বিষয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অথবা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। [২৪]

ইমাম ইবনু নুজাইম আল হানাফী ﷺ বলেন,

من تكلم بكلمة الكفر هازلا، أو لاعبا، كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده، كما صرح به قاضي خان في فتاواه

কেউ কোনো কুফরি কথা ঠাট্টা করে, দুষ্টুমি কিংবা খেল তামাশার ছলে করলে সে সকলের ঐক্যমতে কুফুরি করেছে। এক্ষেত্রে তার ঈমান ও আক্বীদা ধর্তব্য হবে না। যেমনটি কাযী খান ﷺ তাঁর ফাতাওয়ায় স্পষ্ট করেছেন।

জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে বললে সকলের ঐকমত্যে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা হবে। তবে কেউ যদি ভুলঃবশত কিংবা অন্তরে ঘৃণা রেখে (বাধ্য হয়ে) বলে থাকে, তাহলে সকলের ঐকমত্য এই যে, তাকে তাকফীর করা হবে না।[২৫]

ইমাম ইবনু রজব আল হাম্বলী ﷺ এর মতে, "মুসলিম ও ঈমানদার ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি রুকন কে অস্বীকার করলেও ঈমানহীন হয়ে যাবে।"[২৬]

ইমাম ইবনু নুজাইম আল হানাফী ﷺ এর মতে, "শরী'আতের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো হারামকে হালাল মনে করলে তাকে কাফির সাব্যস্ত করতে হবে।"[২৭]

মুল্লা আলী কারী আল হানাফী ﷺ বলেন, "যখন অকাট্যভাবে কোনো গুনাহ প্রমানিত হবে চাই সেটা সগীরাহ গুনাহ হোক কিংবা কবীরাহ গুনাহ হোক, তা হালাল মনে করা এবং এমনিভাবে তা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা সুস্পষ্ট কুফুরি..." [২৮]

ইমাম ইবনুল আরাবী আল মালেকী ﷺ এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কুফর ও রিদ্দাহ (ধর্মচ্যুত) হওয়ার হুকুম পেশ করেছেন এবং যতক্ষণ না তারা খালেস তাওবা

---

[২৪] আল মাসাঈরাহ- ৩১৮

[২৫] আল বাহরুর রায়েক- ৫/২১০

[২৬] আল জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম- ১/৩৪৪

[২৭] আল বাহরুর রায়েক- ৫/১৩২

[২৮] শারহু ফিক্বহিল আকবার- ১০৬

করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করবেন না বলে মত দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি ইজমার দাবি করেছেন।[২৯] ইমাম নববী ﵀ বলেন,

الردة هي قطع الإسلام بنية، أو قول كفر، أو فعل، سواء قاله استهزاء، أو عنادا، أو اعتقادا

রিদ্দাহ তথা ইসলামচ্যুত হওয়া হচ্ছে- স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগ করা, কুফুরি কথা বলা বা কুফুরি কাজ করা; যদিও মজা করে কিংবা বিদ্বেষ করে অথবা অন্তর থেকে সায় দিয়েই বলে থাকুক না কেন।[৩০]

ইমাম ইবনু কুদামাহ ﵀ বলেন,

ومن سبّ الله تعالى كفر، سواءً كان مازحاً أو جادًا وكذلك من استهزأ بالله تعالى، أو بآياته أو برسله، أو كتبه

যে ব্যক্তি আল্লাহ কে গালি দেয়, হোক মজা করে কিংবা স্বেচ্ছায়; অনুরূপভাবে কেউ আল্লাহ, তাঁর আয়াত, তাঁর রাসূলগণ অথবা তাঁর কিতাবসমূহ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে সে কুফরি করল।[৩১]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ﵀ একে কুফর বলেছে,

إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر، يكفر به صاحبه بعد إيمانه

মহান আল্লাহ, তার আয়াত ও তার রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা (সুস্পষ্ট) কুফর। এধরনের ব্যক্তিকে ঈমান আনয়নের পরেও কাফির ঘোষণা করা হবে।[৩২]

ইমাম ক্বাযী ইয়ায আল মালেকী ﵀-ও অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন[৩৩] এবং মালেকী মাযহাবের অন্যান্য ইমামগণও এ ব্যাপারে একমত।[৩৪]

ইমাম ইবনু কুদামা ﵀ বলেন,

من اعتقد حلّ شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر

---

[২৯] আল জামে লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী- ৮/১৯৭

[৩০] গনী আল মুহতাজ-৪/১৩৩-১৩৪

[৩১] আল মুগনী, কিতাবুল মুরতাদ- ১২/২৯৮-২৯৯

[৩২] মাজমূউল ফাতাওয়া- ৭/২৮৩, ১৫/৪৮

[৩৩] আশ শিফা- ২/১০৭৩

[৩৪] আশ শারহুস সগীর- ৬/১৪৮-১৪৯; হাশিয়াতুদ দাসূকী- ৪/৩০৪; বুলগাতুস সালেক, সাউই- ২/৪১৮; হাশিয়ায়ে খিরাশি আলা মুখতাসারিল খলীল- ৭/৬৫

যে ব্যক্তি এমন একটি হারাম বিষয়কে হালাল করল, যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে ও তার বিধান সুস্পষ্ট এবং 'নস' থাকার কারণে উক্ত বিধান সন্দেহমুক্ত, যেমন: শুকরের মাংস, জিনা ইত্যাদি বিষয় যে হালাল করবে তার কুফুরির ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। [৩৫]

আল্লামা শাওকানী ﷺ-ও এই বলে উল্লেখ করেছেন যে, শরী'আতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোন বিষয় অস্বীকার করলে কিংবা তার হারাম হুকুমকে হালাল জ্ঞান করলে সে কাফির হয়ে যায়।[৩৬]

৪. পুরুষই কেন নারীর অভিভাবক?

মানুষ যখন থেকে সামাজিকভাবে বসবাস শুরু করেছে তখন থেকেই নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়েছে। কারণ, একাধিক মানুষ যখন একত্রিত হয় তখন চিন্তাধারার তারতম্যের কারণে মতের ভিন্নতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় নেতৃত্বস্থানে কাউকে না কাউকে বসতেই হয়, যে সমস্ত বিষয় পরিচালনা করবে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। মানব ইতিহাস সাক্ষী; এই যাবৎ অনেক জনপদ, দেশ ও সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে বা সঠিক নেতৃত্বের অভাবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এজন্যে যে, পুরুষেরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। [৩৭]

উপরোক্ত আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ ﷻ এর নির্দেশনা হচ্ছে নারীদের জন্য অভিভাবক তাদের স্বামী। কারণ হিসেবে উল্লেখ হয়েছে- তিনি এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানব জীবনের স্তরে স্তরে কেউ কখনো দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়, আবার কখনো বা সে হয় অধীনস্থ। এই রীতির অনুপস্থিতিতে মানব জীবনের গতিধারা চিন্তা করাও মুশকিল।

একটা পরিবারে দায়িত্বশীল কাউকে না কাউকে তো হতেই হবে। তাই আল্লাহ ﷻ সেই দায়িত্ব আরোপ করেছেন পুরুষদেরকে আর দায়িত্বের দিক থেকে নারীর উপর পুরুষ শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। কেননা সে সংসারের চালিকাশক্তি। সংসার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পেছনে পুরুষের বড় একটা অবদান হলো এই যে, সে অর্থের জোগান দেয়। এদিকে

---

[৩৫] আল মুগনী- ৮/১৩১

[৩৬] আদ দাওয়াউল আজিল ফী দফয়িল আদুউইস সয়িল- ৩৪

[৩৭] সূরা নিসা- ৩৪

সন্তানদের দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে মূলত মায়েদের ওপরই। এভাবেই প্রতিটি মানুষই কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আবার কিছু ক্ষেত্রে অধীনস্থ। কিন্তু সাধারণ এই বিষয়টিকে নারীবাদীরা প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাদের কথা হচ্ছে সংসারে কেউ কারও ওপর প্রাধান্য পাবে না। দুজনই থাকবে সমানে সমানে। তাদের এই থিউরি অবলম্বন করেই আজ আমাদের সমাজে প্রতিনিয়তই শত শত দাম্পত্য জীবন কাঁচের মতো ভেঙে বিনাশ হয়ে যাচ্ছে, হু হু করে বেড়ে চলছে তালাকের সংখ্যা।

মা-বাবা আমাদের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমরা কি কখনও বলি যে, মা-বাবা আর সন্তান কেউ কারও ওপর দায়িত্বশীল হবে না, সবাই সমান? অথবা দেশের নেতৃত্ব স্থানীয় প্রধানকে টেনে হেঁচড়িয়ে গদি থেকে নামিয়ে কেউ কি বলবে যে, জনগণ সবাই সমান, কাউকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন নেই! অথবা অফিসের ম্যানেজার বা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের টাই ধরে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দিয়ে কেউ কি কখনও বলেছে যে, সব কর্মকর্তা-কর্মচারী সমানভাবে কাজ করবে, কেউ কারও উপর দায়িত্বশীল থাকবে না, কেউ কারও ওপর ক্ষমতা দেখাবে না! স্যালারিও সবার সমানে সমান! এই বিষয়গুলো যেমন হাস্যকর ঠিক তেমনি, সংসারে কেউ প্রধান দায়িত্বশীল থাকবে না এমন ভাবাটাও বোকামি।

৫. ক্যারিয়ার বনাম সন্তানের তারবিয়াত

নারীদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তাদের মাতৃত্ব। তাদের পরিশ্রমেই গড়ে ওঠে সভ্য জাতি। এই কারণেই ইবনুল কইয়্যিম ﷺ বলেছেন, "উম্মাহর অর্ধেক হচ্ছে নারী আর অর্ধেককে জন্ম দিয়েছে নারী। তাই বলা যায় পুরো উম্মাহই হলো নারী।"[৩৮]

কিন্তু আফসোস, আজকের যুগের নারীরা তাদের প্রকৃত সম্মান ভুলে যাওয়ার পথে। নারীরা আজ বহির্মুখী। আজ নারীদের কাছে সন্তানের চেয়ে ক্যারিয়ার বড়। ক্যারিয়ারের কথা ভেবে অনেকেই সন্তান দেরি করে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করে। যে বয়সে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা মনে জাগে ততদিনে অনেকের মাতৃত্বের ক্ষমতাও হয়ে যায় দুর্বল।

বহু কষ্টে ও অনেক অপেক্ষার পর ভাগ্য ভালো থাকলে কোল জুড়ে জায়গা করে নেয় ছোট্ট একটা জীবন। তারপর ৬-৭ মাস যেতে না যেতেই সন্তান অর্ধদিনের জন্য মা হারা হয়ে যায়! গৃহ পরিচারিকার হাতে সন্তানকে তুলে দিয়ে মা ক্যারিয়ার গড়ার নিমিত্তে আবার কর্মমুখী হয়। দুধের শিশু মাতৃত্ব খুঁজে পায় গৃহ-পরিচারিকার আঁচলে। কাজের লোকের তারবিয়াতেই অবশেষে সন্তান বড় হতে থাকে।

---

[৩৮] তুহফাতুল মাওলুদ ফী আহকামিল মাওলুদ, পৃষ্ঠা- ১৬

খবরে আমরা অহরহ দেখছি যে, সন্তানকে রেখে বাবা এবং মা কর্মক্ষেত্রে গিয়েছেন, এদিকে কাজের লোক সন্তানকে নির্যাতন করছে।[৩৯] আবার সন্তান মায়ের কাছে আকুতি-মিনতি করছে যে, তার মা যাতে তাকে ব্যাগে করে অফিসে নিয়ে যান। অথচ এসব মায়েদের ভাষ্য হলো, সন্তান পালনের দায়িত্ব কি শুধুই নারীদের, পুরুষদের না? সন্তান পালন কি আজ এতটাই তুচ্ছ বিষয় হয়ে গেল যে দায়িত্ব ছুড়াছুড়ি করতে হচ্ছে![৪০]

বাবার সংস্পর্শ সন্তান কিছুটা কম পেয়ে থাকে। আদব-কায়দা, মু'আমালাত, দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা সন্তান সাধারণভাবে মায়েদের কাছ থেকেই শিখে থাকে। যখন মা থেকেও অনুপস্থিত হয়ে যায় সেটা সন্তানের জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব সন্তানেরা তাদের কৈশোর কিংবা যৌবনে মাদক, চুরি-ছিনতাই, পর্ণাসক্তি, ব্যাভিচারের মতো অসৎ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের জীবনটা বিষিয়ে উঠেছে অথচ অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে; ফিরে আসার রাস্তা যখন আর খুঁজে পায় না তখন তারা ঠিকই তাদের পরিবার তথা মা-বাবাকে দোষ দিতে থাকে। মা-বাবার সুষ্ঠু প্যারেন্টিং-এর অভাবে সন্তান এভাবেই বিগড়ে যায়। ফলে ব্যাক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন এমনকি সমাজও ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

---

[৩৯] https://youtu.be/6kkFbYVEfh0

[৪০] https://www.shorturl.at/nyQS6



||১০ম দারস||

সাইকোলজি: পুরুষদের মনস্তত্ত্ব

একজন দ্বীনদার নারী সর্বাবস্থায় পর পুরুষদের থেকে নিজেকে হেফাজত করবে। পর্দার ক্ষেত্রে এমন অনেক খুটিনাটি বিষয় রয়ে যায় যেসব না জানার কারণে পর্দা লঙ্ঘন হতে পারে। পূর্বের দারস থেকেও আমরা এই বিষয়ে ধারণা পেয়েছি যে, একজন নারীর জন্য নিজের আব্রু রক্ষার্থে পুরুষদের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখা কতটা প্রয়োজনীয়। সেই সাথে নিজের স্বামীর মানসিকতা বোঝা ও সন্তানদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করতেও উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই দারসটিতে আমরা সরাসরি পুরুষদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জানবো যাতে পুরুষদের মানসিকতা বোঝার পথচলা আমাদের জন্য আরও একটু সহজ হয়ে যায়।

১. পুরুষদের কিছু কমন 'সাইকোলজিক্যাল এনালাইসিস'

নারী-পুরুষের পার্থক্য সহজাত। কিন্তু এই পার্থক্যটা অনেক নারী বুঝে উঠতে পারে না। ফলস্বরূপ দেখা দেয় অনিবার্য অমিল। দুই পক্ষেরই অনুযোগ থাকে যে, কেউ কাউকে বুঝতে পারে না বা বোঝার চেষ্টা করে না। যখন এটা মেনে নেওয়া হয় যে, নারী-পুরুষের চিন্তা বা আচরণের পদ্ধতি ভিন্ন; তখন এইসব সমস্যার সমাধান সহজেই করা যায়। চেষ্টার মাধ্যমেই একটি চমৎকার এবং সফল সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

পুরুষদের মনস্তত্ত্বকে কিছুটা হলেও বোঝার মাধ্যমে নারীরা ভুল বোঝাবুঝির সমস্যা সমাধান করতে পারবে। স্বামীকে সর্বোত্তম উপায়ে সমর্থন দিতে পারবে এবং সংসার জীবনে পরিতৃপ্ত রাখতে পারবে। তাই পুরুষদের কিছু সাধারণ মনস্তত্ব নিয়ে জেনে নেয়া যাক :

❖ পুরুষেরা নারীদের থেকে ভিন্ন উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করে

পুরুষেরা সাধারণত তথ্যবহুল কথা বলার চেষ্টা করে। তাই তাদের কথাগুলো হয় অনেকটা সোজাসাপ্টা এবং আক্ষরিক। এমনকি যখন কথা শুনে তখনও অন্তর্নিহিত অর্থটা না ধরে আক্ষরিক ব্যাপারটা গ্রহণ করে। অপরদিকে নারীদের কথায় অনেক অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। সাধারণত তারা কথা বলার মাধ্যমে তাদের আবেগ প্রকাশ করে থাকে।

◈ পুরুষদের আবেগের চাহিদা নারীদের থেকে ভিন্ন!

একজন পুরুষের সাধারণত অনুপ্রেরণা, সমর্থন, সম্মান, আনুগত্য, নিজস্ব জগৎ, শারীরিক চাহিদা ইত্যাদির চাহিদা থাকে। অন্যদিকে মেয়েদের আবেগ জড়িত থাকে ভালোবাসা, আদর, নমনীয়তা, নিরপত্তা, মন বুঝতে পারা, অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদির সাথে। নারী-পুরুষের এই ভিন্ন আবেগের চাহিদা বুঝতে পারলে তাদের মনস্তত্ত্বকে বুঝা সহজ হয়।

◈ সেন্স অফ সেল্ফ

পুরুষদের নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থাকে এবং সেই জায়গাটা থেকে অনেকটা নিজের মতন করে জীবন যাপন করতে ভালোবাসে। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে সকল সমস্যা সমাধান করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যে কোনো উপায়ে পৌছানো। অধীনস্থদের দেখভাল করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটা বড় টার্গেট হিসেবে দেখে তারা। নেতৃত্ব প্রদান, নিজের উপর ভরসা, সক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্য, সফলতা ইত্যাদি তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

◈ চিন্তা ও কাজের ধরণ

তারা একটি সময়ের মধ্যে একটি প্রকারের কাজ খুব ভালো মনযগের সাথে করতে পারে। তাদের কাজে তারা এতটাই শ্রম প্রয়োগ করে যে তারা চায় তাদের সে কাজ এবং চেষ্টাকে মূল্যায়ন করা হোক। একটা কাজ করার মাধ্যমে তারা সেই কাজের দক্ষতাটাকে দেখানোর চেষ্টা করে। স্ত্রীরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে এটা তারা অনুভব করতে চায় না। তারা কষ্টকে সাধারণত রাগ ও 'ইগো' দিয়ে প্রকাশ করে থাকে। আর্থিক উপার্জন এবং ফ্যামিলি সাপোর্ট দেওয়াকে তারা ভালোবাসার একটা ধরণ হিসেবে বিবেচনা করে।

◈ অনুভূতি প্রকাশ

তারা সাধারণ তাদের কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকে। মৌখিক প্রকাশের তুলনায় কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা দেখানোতে তারা বিশ্বাসী। অপরদিকে নারীরা চায় তাদেরকে 'ভালোবাসি' শব্দটা বারবার বলার মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করা হোক। আপনার স্বামীর ভালোবাসা প্রকাশের ধরণটা বুঝতে পারলে আপনার জন্য তাকে বোঝা আরো সহজ হবে।

আরেকটি বিষয় মনে রাখা উচিত, পুরুষদের দক্ষতা নিয়ে যখন সন্দেহ প্রকাশ করা হয় তখন তারা রেগে উঠতে পারে। তাই কখনো তাদেরকে এভাবে প্রশ্ন করা উচিত না, "আপনি কি এটা করতে পারবেন বা আপনার দ্বারা কি এটা সম্ভব?" বরং এইভাবে বলবেন যে, "আপনি এটা করে দিন বা আপনি কি এটা করে দিবেন?"

❖ কনফ্লিক্ট সাইকেল!

মাঝে মাঝে এটা মনে হতে পারে যে, একটা সম্পর্কে আপনি দিয়েই যাচ্ছেন কিন্তু বিনিময়ে কিছুই যেন পাচ্ছেন না! হয়তো আপনি আপনার প্রাপ্য বিনিময়টুকু ঠিকই পাচ্ছেন কিন্তু অনুধাবনের পদ্ধতিটা বুঝে উঠতে পারছেন না। এর সমাধানে একে অপরকে নির্দেশনা প্রদান করা উচিত যে, ভালোবাসা প্রকাশের কোন মাধ্যম ও পদ্ধতিটি সে পছন্দ করে। যেমন : একজন পুরুষ সাধারণত ভালোবাসা অনুভব করে যখন তাকে বিশ্বাস করা হয়, মুগ্ধ হয়ে সম্মান করা হয়, তার কাজের সমর্থন দেওয়া হয়, তাকে উৎসাহ দেওয়া হয় ইত্যাদি।

আবার দু'জন দু'জনকে বুঝতে গিয়ে সম্মুখীন হতে হয় আরেক ঝামেলার! ধরুন আপনি একটা কাজে হতাশ হয়ে সঙ্গীর সাথে অনেক কথা বলছেন। এমন সময় বিপরীত পার্টি আপনাকে ঠাস ঠাস দিয়ে দিলো আপনার সকল সমস্যার সমাধান! আপনি গেলেন রেগে! কারণ আপনি চাচ্ছেন আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে, সমাধান না। এদিকে উনি ভাবলেন উনি তো সমস্যার সমাধান দিয়েই দিয়েছেন! সমাধান দেওয়ার পরও আপনি গেলেন রেগে, যার জন্য ওনারও মন খারাপ হয়ে গেল, আবার ওনার এই মন খারাপের জন্য এবার ওনি আপনাকে দায়ী করলেন, এই হলো 'কনফ্লিক্ট সাইকেল'!

❖ সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি

পুরুষদের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি নারীদের থেকে অনেকটা ভিন্ন হয়। যেমন : তারা কোনো সমস্যায় পরলে সাধারণত নিজে সেটা সমাধানের চেষ্টা করে। অনেক সময় সমস্যাকে বার বার উল্লেখ করাকে নিজের দুর্বলতা মনে করতে পারে। এই সময় যদি স্বামী নিজের সমস্যা ব্যক্ত না করে তাহলে তাকে সমস্যা বর্ণনা করতে চাপ প্রয়োগ করার দরকার নেই। বরং নিজ থেকে সমস্যা বুঝে নিয়ে সমাধানের জন্য যথাযথ চেষ্টা করতে হবে। ফলে সম্পর্ক মধুর হবে এবং আশা করা যায় স্বামীও এতে বিরক্তি প্রকাশ করবে না।

আমরা নারী-পুরুষের সাধারণ ও প্রধান কিছু মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য দেখলাম। কিন্তু সব পুরুষের মানসিকতা একই হবে, তা নয়। ব্যক্তিত্বের ভিন্নতার জন্য একেক পুরুষের চিন্তা, আচরণ, ভালোবাসার ধরণ, রাগ প্রকাশের ধরণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তাই স্বামী বা মাহরামদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য তাদেরকে নিজ নিজ জায়গা থেকে ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

২. সম্পর্ক উন্নয়নে আমার করণীয়

◆ যখন সঙ্গীর সাথে কথা বলবেন তখন তার দিকে মুখোমুখি বসে, পূর্ণ মনোযোগের সাথে কথা শোনার চেষ্টা করবেন। কথা শোনার সময় মুঠোফোন, সামাজিক যোগাযগ

মাধ্যম, হাতের কাজ; সবই একপাশে রেখে নিন। এতে আপনি বুঝাবেন যে, আপনি তাকে পরিপূর্ণ মনযোগ ও গুরুত্ব দিচ্ছেন। কথার মাঝখানে থামাবেন না বা নিজের মতামত ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

◆ প্রশংসা করবেন, তার কাজের তারিফ করবেন, তা যত ছোটই হোক না কেন। সবসময় তাকে অনুভব করাবেন যে, তিনি আপনার জন্য যথেষ্ট করছেন। ফলাফল যাই আসুক না কেন, তার চেষ্টাটাই আসলে গুরুত্বপূর্ণ।

◆ জাযাকাল্লাহ, থ্যাংক ইউ, শুকরিয়া ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে তাকে ধন্যবাদ জানাবেন সাথে মিষ্টি একটা হাসি।

◆ স্বামী কাজ সেজে বাসায় ফেরার পর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, আজ তার দিন কেমন গেল, মন ভালো কিনা, শরীর ভালো আছে কিনা ইত্যাদি।

◆ স্বামী বাইরে যাওয়ার আগে এবং বাইরে থেকে ঘরে ফিরলে তাকে অভ্যর্থনাস্বরূপ আলিঙ্গন করতে এবং চুমু খেতে ভুলে যাবেন না!

◆ তাকে সবসময় বলুন যে, আপনি তার সাথে কতটা ভালো আছেন। বলুন, তার সাথে দুনিয়ায় ও আখিরাতের জীবন আপনি কাটাতে চান।

◆ তার কোনো ব্যাপার পছন্দ না হলে রাগারাগি বা ঘ্যান ঘ্যান করবেন না। রাগ হলে ওই সময়টা কথাবার্তা না বলে চুপ থাকবেন। পরবর্তীতে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবেন।

◆ সবসময় ভালো কাজে উৎসাহ দিবেন। আপনার প্রেরণা তাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। কখনো ছোট করে কথা বলা, খোঁটা দেওয়া বা গালি-গালাজ, বাজে শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। এতে সঙ্গী নিজে অপমানিত বোধ করবে যা দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে যথেষ্ট।

◆ তার পছন্দ ও অপছন্দকে সম্মান জানাবেন। তাকে হুট করে পরিবর্তন করতে যাবেন না। তাকে আপনার মতো বানানোর দরকার নেই, তাকে তার মতো থাকতে দিন। তাঁর ওপর জোর করে নিজের মত চাপিয়ে দিবেন না।

◆ তার ভালো বিষয়গুলো দেখবেন এবং চেষ্টা করবেন তা লিখে রাখতে। সবসময় মন্দ বিষয় নিয়ে হতাশ হবেন না। কৃতজ্ঞ থাকুন আপনার রবের প্রতি।

◆ ভালোবাসা প্রকাশ করুন। ভালোবাসা মাখা চিঠি লিখুন। মাঝে মাঝে তার বইয়ের ফাঁকে বা ওয়ালেটে রেখে দিতে পারেন! তার ভালোলাগার কাজগুলো করুন। তাকে বিভিন্ন কাজ করে চমকে দিন।

◆ বেশি বেশি দু'আ করুন।

◆ সীরাহ বা অনুসরণীয়দের জীবনী পড়ুন, শিখুন।

◆ নিজের দোষগুলো আগে দেখুন, আত্ম সংশোধনে মনোযোগ দিন। তাকওয়া অন্তরে ধারণ, আল্লাহভীরু হোন। পর্দায় নিজেকে ঢেকে রাখুন।

◆ অন্য পুরুষের সাথে কখনো তুলনা করবেন না। এমনকি অন্য পুরুষের ব্যাপারে কোন আলোচনারও দরকার নেই।

◆ ভুল হলে নিজের ভুল মেনে নিবেন। জোর করে এটাকে সঠিক বানানোর দরকার নেই। ভুল মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করুন।

◆ বাসায় তার সামনে থাকাকালীন সময় খুশি খুশি থাকুন। চরম কষ্টের দিন আসলেও সবর করুন। বিনিময় আল্লাহ ﷻ দিবেন।

◆ তাকে তার মতো থাকার কিছুটা সুযোগ দিন।

◆ তার প্রিয় কাজগুলোতে সঙ্গী হোন।

◆ একই সাথে কুরআন পড়ুন, ইসলামিক কোর্স করুন, ইলম অর্জনের সঙ্গী হোন।

◆ বিছানায় 'না' বলবেন না। তার মন বুঝে সহবাসের শুরুটা মাঝে মাঝে আপনি করুন!

◆ তার মা, বাবা, সন্তানের খেয়াল রাখুন এবং যত্ন নিন। আত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলুন, বিপদে তাদের পাশে থাকুন।

◆ সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল হোন।

◆ শিখার এবং মানার চেষ্টা করুন কিভাব একজন ভালো ওয়াইফ হওয়া যায়। আপনি একটু চেষ্টাই করলেই একটি সুন্দর পরিবার উপহার দিতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।

৩. নারীকণ্ঠ

নারীকণ্ঠ পুরুষদের জন্য অনেক বড় একটি দুর্বলতা। নারীদের কণ্ঠ যতটা মধুর এবং মিহি হয় পুরুষদের ফিতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কাও ততটাই বেড় যায়। নারীদের কণ্ঠস্বর প্রকৃতপক্ষেই পুরুষদের কণ্ঠের চেয়ে অধিক জটিল। নারী এবং পুরুষের ভোকাল কর্ড ও ল্যারিংক্সের আকারের পার্থক্যের কারণে এবং নারীদের কণ্ঠে আল্লাহ প্রদত্ত 'সুর' থাকার কারণে পুরুষ কণ্ঠের চেয়ে নারীদের কণ্ঠের শব্দ তরঙ্গ অধিক হয়, যা পুরুষদের অন্তরেও তরঙ্গের সৃষ্টি করতে যথেষ্ট হয়![১] পুরুষেরা নারীকণ্ঠের নির্দিষ্ট কিছু তরঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এক গবেষণায় কিছু পুরুষকে দুটি কণ্ঠ শোনানো হয়। একটি হলো নারীর মূল কণ্ঠ। আর অপরটি নকল কণ্ঠ, তবে কণ্ঠের তরঙ্গ বাড়িয়ে দিয়ে নারীকণ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আবার তাদেরকে নারীদের উচ্চস্বরবিশিষ্ট একটি কণ্ঠ শোনানো হয় এবং আরেকটি নারীকণ্ঠ শোনানো হয় যা মূলত তরঙ্গ কমিয়ে নিম্নতর স্বরে রূপান্তর করে উপস্থাপন করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে পুরুষ

১] Male and Female Voices Effects Brain Differently, Journal from University of Sheffield

অংশগ্রহণকারীরা উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট কণ্ঠটাকেই অধিক আকর্ষণীয় মনে করেছে যদিও সেগুলো কৃত্রিম।[২]

অপরদিকে আরেকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, নারীরা পুরুষদের সাথে তখনই উচ্চ কম্পাঙ্কে কথা বলতে শুরু করে যখন তারা সেই পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে।[৩] তাই পরপুরুষদের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর প্রয়োজনে যদি কথা বলতেই হয় তাহলে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিচুস্বরে এবং গাম্ভীর্য বজায় রেখে কথা বলা উচিত।

৪. নারীদের দৃষ্টিপাত

নারীদের অবয়ব বা দেহের আকৃতি-গঠনের দিকে নজরপাত করতে একজন পুরুষের মনে যে পরিমান ইচ্ছা জাগে সেই তুলনায় নারীর মনে ঐ রকম ইচ্ছা জাগে না বললেই চলে। পুরুষের দিকে নজরপাত করাটা নারীদের ফিতরাতের মধ্যে অন্তর্গত নয়। তবুও নারীদের মাঝে জৈবিক চাহিদার তারতম্য, নজরপাতের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অনেকেই পরপুরুষের দিকে খেয়ালে কি বেখেয়ালে দৃষ্টিপাত করে ফেলে। এতে পুরুষদের মনে কীরূপ প্রভাব পড়ে তা আমরা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে জানবো।

যখন কোনো নারী একজন পুরুষের দিকে তাকায় তখন সেই পুরুষের মনে এটাই জাগ্রত হয় যে, হয়তো সেই নারীটি তাকে পছন্দ করেছে অথচ এমনটা সবসময় নাও হতে পারে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন নারী অন্য কোনো পুরুষের দিকে নিজের অজান্তেই নজরপাত করে ফেলে আর সেই নজরপাত তার অন্তরে তেমন একটা প্রভাবও ফেলে না। কিন্তু নারীর সামান্য চাহনিটুকুও সেই পুরুষকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

পুরুষেরা খুব সহজেই নারীদেরকে নিয়ে দূর-দূরান্তর পর্যন্ত চিন্তা করে ফেলতে পারে। যেমন : কোনো নারী একজন পুরুষের কাছে একটা কলম চাইলো। পুরুষটি তখন ভাবতে শুরু করবে নিশ্চয় মেয়েটা তাকে পছন্দ করেছে তাই তার কাছ থেকে কলম চাচ্ছে, অথচ সেই নারী এমন কিছুই ভাবেনি। কিছু কিছু পুরুষ নারীদের সাথে সামান্য কথা বার্তা বা এক দুই পলক দৃষ্টিপাতে এতোটাই গভীরে চলে যায় যে, সেই নারীদেরকে নিয়ে তারা অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে দেয়। তাই পুরুষদের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

২] The role of femininity and averageness of voice pitch in aesthetic judgments of women's voices. Perception,37(4), পৃষ্ঠা ৬১৫-৬২৩

৩] Journal of Evolutionary Psychology, 2011, পৃষ্ঠা ৫৭-৬৭

৫. নীলশহরের হাতছানি

পর্নআসক্তি মানবাত্মার মরণব্যাধি। পূর্বের দারসে পর্নোগ্রাফির ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। মেন'স সাইকোলজি সার্ভের রিপোর্ট দেখেছি, পর্নোগ্রাফি নিয়ে পুরুষদের ভাবনা জেনেছি। এবার আমরা জানবো পর্নোগ্রাফি কীভাবে মানব মস্তিষ্ককে কাবু করে ফেলে এবং কেবল দৈহিক তুষ্টি অন্বেষণ কীভাবে ভয়ানক আসক্তিতে পরিণত হয়।

মানুষ স্বভাবগতভাবেই নগ্নতা অপছন্দ করে। তবুও মানুষ তার স্বীয় গতিধারার বিপরীতে হেটে পর্ণাসক্তিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। নগ্নতা অপছন্দ করা একটা মানুষ রাতারাতিই যে পর্নআসক্ত হয়ে যায় ব্যাপারটা অবশ্য এমন নয়। পর্নোগ্রাফিকে বলা যেতে পারে স্লো পইজন। এর বিষ ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের সাথে মিশে। ফলে এই আসক্তির প্রতিক্রিয়াও হয় অত্যন্ত ধীরগতিতে।

পুরুষেরা সাধারণত প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা নেওয়ার উদ্দেশ্যে পর্নোগ্রাফি দেখতে শুরু করে। অনেকে ভাবে একবারই দেখবে, এরপর আর কখনো দেখবে না। কিন্তু সেই 'একবার'–ই তাকে হাজারবার পর্নোগ্রাফির চৌকাঠে নিয়ে আছড়ে ফেলে। প্রথম প্রথম তার কাছে স্বাভাবিক ধরনের পর্নোগ্রাফি ভালো লাগে, কিন্তু একই বিষয় বারবার দেখতে দেখতে একঘেয়েমি এসে পরে। ফলে মস্তিষ্ক নতুন কিছুর স্বাদ চায়। স্নায়ুর এই প্রবল তাড়না উপেক্ষা করাটা যে কতটা প্রয়োজনীয় অনেকেই সেটা বুঝে না। নতুন নতুন স্বাদ খুঁজতে গিয়ে ধীরে ধীরে নোংরা থেকে বিদঘুটে ধরনের সব পর্ণের দিকে ধাবমান হতে থাকে। মরীচিকার স্ক্রিনে ফুটিয়ে তোলা আকর্ষণীয় (!) যৌনক্রিয়া তার কাছে বাস্তব যৌনক্রিয়া থেকে অধিক উপভোগ্য মনে হতে থাকে, ফলে স্ত্রীর প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে কলহ। এভাবেই ডোপামিনের তাড়নায় মানুষগুলোর সহজ-সরল মস্তিষ্ক আজ এক ক্ষুধার্ত দানবে পরিণত হয়েছে। মস্তিষ্কের এই খাই খাই স্বভাবকে পুঁজি বানিয়ে পর্নইন্ডাস্ট্রিগুলো তাদের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার ধরণের পর্নক্যাটাগরির ভিরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে মানব জীবনের মূল্যবোধ। যেখানে তোয়াক্কা নেই পারিবারিক বন্ধনের। যেখানে অগ্রাহ্য হয়েছে মানবতা।

একজন মানুষ যখন পর্নোগ্রাফিকে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে, এ থেকে ফিরে আসার কোনো রাস্তা খুঁজে পায় না, বাস্তবিক যৌনতার চেয়েও আয়তাকার স্ক্রিনের যৌনতাকে অধিক উপভোগ করতে শুরু করে তখনই বুঝে নিতে হবে যে, সেই ব্যাক্তি পর্নআসক্ত।

এমন অনেকে আছে যারা ৬-৭ বছরেরও অধিক সময় ধরে পর্নআসক্ত। অথচ তাদের ঘরে স্ত্রী রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় পর্নআসক্তি দৈহিক সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত না বরং এর সম্পর্ক সরাসরি মস্তিষ্কের সাথে। গবেষণা বলে, পর্নোগ্রাফির সাথে আস্টেপৃষ্টে থাকা লোকেরা জীবনের কোনো না কোনো মুহূর্তে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। সেটা হতে পারে যৌন নির্যাতন, অবহেলা, শারীরিক-মৌখিক বা মানসিক নির্যাতন ইত্যাদি।[8]

পুরুষদের যৌন চাহিদা ঘন ঘন আসে এবং সেটা কোনো সময় বুঝে না, বাঁধা মানতে চায় না। স্ত্রীদের এই বিষয়টা খুব ভালোভাবে বোঝা উচিত। পুরুষের সৃষ্টি এভাবেই। যদি একজন নারী তার স্বামীর চাহিদাকে প্রাধান্য না দেয়, অবহেলা করে তাহলে নিশ্চয় তার এই আচরণ তার স্বামীর পদস্খলন ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী হবে। পুরুষেরা বাহিরে কঠিন হলেও তারা ভিতর থেকে নরম। তারা খুব সহজে চিন্তা করে। ভালোবাসার মানুষের বিনা প্রয়োজনে বলা 'না' তার কাছে অবহেলা মনে হতেই পারে। আর সেই অবহেলা এবং ভগ্নহৃদয় তাকে ধাবিত করতে পারে পূর্বের স্বভাব, পর্নোগ্রাফির নীল জাগতে।

৬. ডোপামিনের কাঠের চশমা

ডোপামিন হলো এমন একটি হরমোন, যা মস্তিষ্কে অবস্থান করে। আমাদের অনুভূতি ও কাজের সাথে এটি দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। এটি মূলত একটি নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে, যা মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের মধ্যে সংকেত আদান-প্রদান করে।

ডোপামিন আমাদের মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সেন্টারের সাথে জড়িত থাকে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে 'রিওয়ার্ড সেন্টার' কী? রিওয়ার্ড সেন্টারের মূল কাজ আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ডোপামিন উৎপাদনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা। অর্থাৎ রিওয়ার্ড সেন্টার যখন এটা বুঝতে পারে যে আপনাকে পুরস্কার দেওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেছে তখন প্রচুর ডোপামিন ও অক্সিটোসিন উৎপাদন করে আপনার মাঝে আনন্দের অনুভূতি জাগায়।

ডোপামিন নির্গত হওয়ার মাধ্যমে আপনার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত আনন্দের অনুভূতি হয় এবং আপনি এই আনন্দটা বার বার পেতে চান। যখন রিওয়ার্ড সেন্টার ডোপামিন উৎপাদন করে তখন আমরা ভালো অনুভব করি এবং আমরা ওই কাজটি বার বার করতে চাই।

যখনই আমরা কোনো কাজ করি, সেটা হোক খেলাধুলা করা বা খাওয়া-দাওয়া করা—আমাদের মস্তিষ্ক তখন সেটা নির্ধারণ করে দেয় যে আমার কাজটি কেমন লাগলো।

8] Kristi Pikiewicz এর আর্টিকেল Accepting and embracing the personal purpose of porn addiction may overcome it.

আমাদের মস্তিষ্ক এই ঘটনাগুলোকে ভালো অথবা মন্দ নির্ধারণ করে এই হরমোনগুলোর নিঃসরণের মাধ্যমে। যখন আমরা মজার কোনো খাবারে ভালো স্বাদ পাই বা কোনো কাজে আনন্দ পাই তখন ডোপামিন নিঃসরণ হয় যেটা আমাদের পুনরায় সেই কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। এটাকে বলা যায় 'ন্যাচারাল রিএনফোর্সমেন্ট'।[৫]

যখন কেউ মাদক গ্রহণ করে তখন তার মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণে ডোপামিন উৎপাদিত হয়। পর্নআসক্ত ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই রকম ঘটনা ঘটে এবং তাদের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে দেখা যায় যে, এই দুইয়ের মস্তিষ্কের গঠন হুবহু এক।[৬]

ডোপামিন যখন স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করে তখন পুরস্কার পাবার নতুন রাস্তা তৈরি হয়। এর ফলে যে কাজটার কারণে প্রথমবার ডোপামিন নির্গত হয়েছিল, মস্তিষ্ক ডোপামিনের লোভে বার বার সেটাতে ফিরে যেতে চায়। এই কারণেই একবার পর্নদেখলে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে।[৭]

এভাবে যতবার একজন পর্নদেখবে ততবার ডোপামিনের নিঃসরণ বাড়তে থাকবে এবং যত বেশি বাড়তে থাকবে ততই আগের পরিমাণের ব্যাপারে কম সংবেদনশীল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ একটু আগে নির্দিষ্ট ডোজের পর্নদেখে সে যতটুক আনন্দ পেয়েছে, দ্বিতীয়বার সেই ডোজে পর্নদেখে সে ততটা উত্তেজিত হবে না এবং আনন্দ পাবে না। তাই তার নতুন ও আরও আনন্দ দেবে এমন কোনো কিছু দেখতে হবে যার ফলে ডোপামিনের ক্ষরণ আরও বাড়বে ফলে সে অধিক বেশি আনন্দ লাভ করবে। এই ডোপামিনের ক্ষরণ একজনকে প্রতিনিয়ত নতুন কিছুর প্রতি চাহিদা জোগাবে। এভাবেই মানুষ সফটকোর থেকে হার্ডকোর এবং ধীরে ধীরে এনাল সেক্স, ফুট ফেটিশ, শিশুপর্নো, সমকামী, গ্রুপ সেক্স ইত্যাদিতে আসক্ত হয়ে যায়।[৮]

৭. পর্ন আসক্ত পুরুষকে পর্নোগ্রাফি থেকে ফিরিয়ে আনার উপায়

একজন নারী যখন জানতে পারে যে, তার ভালোবাসার মানুষটি পর্নআসক্ত তখন ব্যর্থতা ও আশাহীনতা নিজের অনুভূতিকে বিচূর্ণ করে দেয়। তার মাঝে জন্ম নেয় হতাশা, রাগ, ক্ষোভ, যন্ত্রণা। নারীদের জন্য ব্যাপারটি একটি মানসিক আঘাত। একজন নারী যখন জানতে পারে পায় যে তার এত কাছের ভালোবাসার মানুষটি এমন একটি জঘন্য কাজের সাথে লিপ্ত, তখন সে মনের অজান্তে নিজের ওপরই দোষটা চাপিয়ে

৫] https://www.psychologytoday.com/basics/dopamine

৬] https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/26/brain-scans-porn-addicts-sexual-tastes

৭] মুক্ত বাতাসের খোঁজে, পৃষ্ঠা- ২৮

৮] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600144/#__ffn_sectitle;
https://fightthenewdrug.org/how-porn-changes-the-brain/

নেয়। নিজেকে মনে হয় প্রতারিত আর অপমানিত। কাছের মানুষের ওপর থেকে উঠে যায় সকল ভালোবাসা ও বিশ্বাস।

নারীদের অনুভূতি বর্ণনা করার কারণ হলো এই যে, আমরা নারীদের কষ্টটা বুঝি। আমরা তাদের প্রতি এই পরীক্ষায় সহানুভূতিশীল হতে চাই। এর সাথে তাদের এইটাও বলতে চাই আপনার, হ্যা শুধু আপনার একান্ত চেষ্টাতেই কাছের মানুষটি ফিরে আসতে পারে সেই অন্ধকার জগৎ থেকে! তাই অন্যকে সাহায্য করার আগে নিজেকে সাহায্য করুন। আপনি পারবেন, আপনার দু'আ ব্যর্থ হবে না। আল্লাহ ﷻ আপনার ডাকে সাড়া দেবেন.. আপনার কষ্ট বিফলে যাবে না। পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি থেকে বেড়িয়ে আসাটা হয়তো অতি সহজ কোনো কাজ না কিন্তু আপনার সহযোগিতায় তা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

◐ আপনি যদি জানতে পারেন যে আপনার স্বামী পর্নআসক্ত, তাহলে প্রথম প্রশ্ন আসবে তিনি আসক্ত হয়েছেন কেন ও কীভাবে। আপনার প্রথম দায়িত্ব থাকবে তা খুঁজে বের করা। আপনি তার সাথে কথা বলে জেনে নিতে পারেন অথবা নিজ থেকে ভালোভাবে চিন্তা করে আপনি কারণটা বের করে নিতে পারেন। এমন হতে পারে যে, আপনাদের বিয়ের আগে থেকেই তিনি আসক্ত ছিলেন। আবার এমনও হতে পারে তার এই আসক্তি বিয়ের পর থেকে শুরু হয়েছে। এইখানে আপনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন আপনার কোনো কমতি তার আসক্তির কারণ কিনা। এমন হতে পারে আপনি যৌন মিলনে আগের মতো আগ্রহী না, আপনি তাকে পর্যাপ্ত সময় দেন না অথবা আপনি খারাপ আচরণ করেন বিধায় আপনার প্রতি ক্ষোভ থেকে তিনি পাপে জড়ান। এমনও হতে পারে অতীতের কোনো দুঃখ, ক্ষত ভুলার জন্য অথবা চাকরি/ব্যবাসার মানসিক চাপের কারণে তিনি এমনটা করে থাকেন। আপনি তাকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। আপনি যদি সমস্যাটার কারণ খুঁজে বের করে নিতে পারেন তাহলেই অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো।

◐ তার সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করুন। আমরা জানি, এই বিষয় নিয়ে কথা বলা কিছুটা লজ্জাজনক; যদিও তা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়। কিন্তু এখানে আপনাকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যে, আপনি আপনার ভালোবাসা দিয়ে তার মন জয় করে নিতে পারবেন। একটি সুস্থ আলোচনা দিতে পারে সুন্দর উপলব্ধি। তাই স্বামীর সাথে খোলাখুলি আলোচনা করুন এবং আপনি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত তা জানান। কিন্তু এখানে তার সাথে রাগারাগি করা যাবে না বা তাকে আঘাত করে কোনো কথা বলা যাবে না। প্রথমেই সরাসরি তার আসক্তির ব্যাপারে কথা না বলে তাকে আগে তৈরি করে নিন। প্রথমবার মুখোমুখি কথা বলার সময় যতটা পারবেন নম্র হোন, আপনার নারীত্বকে কাজে লাগান, তার হাতটা ধরে চোখ ছলছল করে কথা বলুন।

বলুন তাকে আপনি কতটা ভালোবাসেন, তার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে আপনি কতটা চিন্তা করেন। আপনার জীবনের অতীতের সুন্দর স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিন এবং আপনাদের একসাথে দেখা সুন্দর ভবিষ্যতের কথা মনে করিয়ে দিন। জান্নাতের কথা মনে করিয়ে দিন, যেখানে আপনি তার সাথে চিরকাল থাকবেন। এভাবে তাকে তৈরি করে নেওয়ার পর মূল কথায় এগোতে হবে। এতে তিনি হয়তো লজ্জা পাবেন। এই লজ্জাটাকে কাজে লাগিয়ে সেইদিনই একটা পরিকল্পনা করুন। দরকার হলে খাতা-কলম নিয়ে বসুন এবং আপনাদের দুজনের লক্ষ্যগুলো লিখুন, যা আপনারা আগামী ১ সপ্তাহ/৩ মাস/১ বছর সময়কাল যাবৎ অনুসরণ করবেন। যেমন: এত সংখ্যক দিন পর্নথেকে দূরে থাকতে হবে, প্রয়োজনে পিসি-মোবাইলে পর্নোগ্রাফি সাইট ব্লক করা যায় এমন সফটওয়্যার ইন্সটল করতে হবে, কোনো কাউন্সেলরের কাছে সপ্তাহের অমুক অমুক দিন কাউন্সেলিং-এর জন্য যেতে হবে, দৃষ্টি হিফাজত করতে হবে ইত্যাদি। এতে করে আপনার প্রাথমিক কাজগুলো গোছানো হয়ে যাবে।

◆ পরবর্তী ধাপ হলো আপনি যেই লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করেছেন তা বাস্তবে মেনে চলা। এই পুরো সময়টা আপনি নিজেকে উত্তমভাবে উপস্থাপন করুন। উত্তমভাবে উপস্থাপনের মধ্যে প্রথমেই আসবে সুন্দর ব্যবহার ও সুন্দর আখলাকের অধিকারী হওয়া। তাই সর্বদা হাসি মুখে থাকুন, রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, ভালো কথা বলুন, ইতিবাচক চিন্তা করুন। দেখুন, তারা যা করছে তা নিঃসন্দেহে গুনাহ। কিন্তু আমরা নারীরা তাদের সেই অপরাধবোধেরও সম্মান জানাবো। কারণ দিন শেষে তারা এই আসক্তির সাথে প্রতিনিয়ত লড়ে চলছে। আমরা যদি তাদের সাথে সহানুভূতিশীল হই তাহলে তারা তাদের অপরাধ আরো ভালোভাবে অনুভব করতে পারবে এবং আমাদের ভালো আচরণ তাদেরকে উৎসাহ দেবে এর থেকে বেড়িয়ে আসতে। ভালোর বিনিময় ভালো ছাড়া আর কিই বা হতে পারে....

◆ নিজেকে উপস্থাপনের বাহ্যিক দিক হচ্ছে ভালো জামা-কাপড় পরিধান, সাজগোজ-মেকআপ করা, সুন্দর করে চুল বাধা, তার পছন্দের সুগন্ধি ব্যবহার করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নম্র গলায় কথা বলা ইত্যাদি। এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনার বাহ্যিক অবয়ব তার মনে একটা ভালো লাগার প্রভাব ফেলবে। যদি এমন হয় যে, সাংসারিক কাজের চাপে আপনি ভালোভাবে নিজের যত্ন নিতে পারছেন না তাহলে সাংসারিক ঝামেলা থেকে কিছু দিনের জন্য ছুটি নিন। নিজের কাজগুলো গুছিয়ে নিন এবং সময়ানুবর্তিতা শিখুন। আপনি চাইলেই ব্যস্ত জীবন থেকে নিজের যত্ন নেওয়ার জন্য সময় বের করে নিতে পারবেন। এখন প্রচেষ্টা আপনার নিজের।

◆ তার সাথে ভালো কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করুন। যেমন : তার অফিসের বা ব্যবসার কোনো কাজে সাহায্য করা; তার পছন্দের কোনো কাজ যেমন : বাগান করা বা খেলাধুলা করা ইত্যাদিতে তাকে সঙ্গ দেয়া; দ্বীনি ইলম অর্জনে তাকে ব্যস্ত রাখা যেমন : হাদীস, কুরআন, তাফসীর, সীরাহ ইত্যাদি একত্রে মিলে অধ্যয়ন করা, তার সাথে অনলাইন/অফলাইনে বিভিন্ন ইসলামিক কোর্সে এনরোল করা ইত্যাদি। ইসলামিক ইলম অর্জন তার অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি করবে, আল্লাহর ভয় তখন তাকে পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে। এ ছাড়া দ্বীনি ইলম অন্তরে একধরনের প্রশান্তি দেবে যা তার অন্তরের শূন্যতা পূরণ করবে।

◆ তার আধ্যাত্মিকতা (spirituality) বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করুন। আমরা জানি মানুষের ঈমান বাড়ে এবং কমে। দুনিয়াবি ব্যস্ততায় ডুবে গেলে মানুষের অন্তর দুনিয়ামুখী হয়ে যায়। তাই তার দ্বীনমুখিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করুন। তার সাথে বিভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, তার পেছনে সালাত আদায়, তার সাথে কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি আমল একত্রে করুন। রাত জাগা কমিয়ে তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস গড়ুন এবং দিনের শুরুর বরকতময় সময়টা কাজে লাগান। তাই তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যান ও সকাল সকাল উঠে পড়ুন। সুরা ফালাক্ব-নাসের মাধ্যমে রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা রয়েছে। আর অধিকাংশ পর্নআসক্ত মানুষ রাতের ঘোর অন্ধকারেই এই পাপকাজটি করে থাকে। অতএব, সুরা ফালাক্ব-নাস—এ শিফা'র সন্ধান করুন।

◆ অন্তরঙ্গতায় আপনি তাকে সাহায্য করুন। বিছানায় আবেদনময়ী হয়ে উঠুন। পূর্বে আমরা জেনেছি একজন পুরুষের এই বিষয়ক ফ্যান্টাসি কেমন হয়ে থাকে। তাই নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করুন, যেমন—সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা বা তার পছন্দ অনুসারে সাজগোজ করা ইত্যাদি। বিছানা সুন্দর করে সাজান, সুন্দর বিছানার চাদর বিছান, অন্তরঙ্গতার জন্য ঘরকে তৈরি করে নিন। অতঃপর হালকা আঁধার আলোয় দুইজন একসাথে হোন। অন্তরঙ্গতার আগ মুহূর্তে তার প্রশংসা করুন যে—তিনি কতটা সুপুরুষ, আপনাকে তিনি কতটা ভালোবাসেন, আপনাকে তিনি বিছানায় যথেষ্ট সুখী করতে পারেন। নিজের বিভিন্ন অনুভূতিগুলো প্রকাশ করুন, আপনি বুঝতে দিন আপনি তার সঙ্গ সবসময় উপভোগ করেন। অন্তরঙ্গতা শেষে তাকে কাছে টেনে নিয়ে ঘুমান। তাকে জানান আপনি তৃপ্ত হয়েছেন। পুরুষেরা তার স্ত্রীকে তৃপ্ত করতে পারলে অন্যরকম আনন্দ অনুভব করে এবং তারা তাদের পুরুষত্ব জাহির করার জন্য কাজটি বার বার করতে চায়। তাই কখনও তার সামনে এই বিষয় নিয়ে তার সমালোচনা করবেন না; বরং উৎসাহ দিয়ে যান। তবে হ্যা, আপনাকে যদি তিনি হারাম কোনো কাজে লিপ্ত হতে

বলেন সেক্ষেত্রে আপনি শক্ত গলায় না বলুন এবং তার চিন্তাধারা অন্যদিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করুন।

◐ তাকে নিয়ে হাঁটতে যান, কোথাও বেড়াতে বা দূরে কোথাও ঘুরতে যান। কিছুদিন প্রকৃতি-সমুদ্র দেখে কাটিয়ে আসুন।

◐ তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নজর দিন। তাকে সুষম খাদ্য দিন। তার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। তাকে ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করতে পারেন। অথবা তার সাথে ফ্রী-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে পারেন। এতে আপনাদের দুজনের মনই ভালো থাকবে।

◐ দুজন মিলে যে টার্গেট বানাবেন তা আপনার স্বামী পূরণ করতে পারলে তাকে পুরস্কার দিন। আর যদি না পারে তাহলে রাগারাগি না করে তাকে পরবর্তী সময়ের জন্য অনুপ্রেরণা দিন। আপনার প্রেরণা পেলে তিনি আরও বেশি উৎসাহিত হবে এবং পরবর্তীতে টার্গেট পূরণ করা তার জন্য সহজ হবে।

◐ দ্বীনি ভাইদের সাথে মিশতে উৎসাহিত করুন, যারা তার ঈমান বাড়াতে সাহায্য করবে। কাছের আত্মীয় বা শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের সাথেও মিশতে উৎসাহ দিন। কারণ অন্ধকার জগতের বাসিন্দারা এমন আসক্তির পর সবার সাথে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। নতুন করে সম্পর্ক জোড়া দেওয়া তাকে আরও সামাজিক হতে সহায়ক হবে এবং অন্ধকার থেকে বের হতে সাহায্য করবে।

◐ আপনার স্বামীকে গাইরে মাহরামদের সামনে দৃষ্টি সংযত রাখতে তাগাদা দিন। আপনি আপনার দিক থেকে অন্য নারীদের সাথে তার মেলামেশা বন্ধ করার চেষ্টা করুন। বাসায় কোনো গাইরে মাহরাম নারীকে না আনার চেষ্টা করুন।

◐ মনে রাখবেন, আপনার স্বামীর মুঠোফোন বা কম্পিউটার যেন কখনো পরিবারের অন্যান্য সদস্য; বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের হাতে না পড়ে। এতে ওইসব সাইট বা কন্টেন্ট তাদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

◐ যদি তাকে কখনো পর্নোগ্রাফি দেখা অবস্থায় স্বামীকে ধরে ফেলেন তাহলে সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। তাকে একা ছেড়ে দিন। পরবর্তীতে টাকে ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন।

◐ রুকইয়াহ করাতে পারেন। অন্তরের রোগগুলোর জন্য রুকইয়াহ খুবই কার্যকরী একটি চিকিৎসা। রুকইয়াহকে দৈনন্দিন কাজের অংশ করে নিন।

এই সবগুলো ধাপ ছিল আপনার একান্ত নিজস্ব প্রচেষ্টা। বর্তমানে অনেক কাউন্সেলিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি নিয়ে কাজ করে। আপনি আপনার স্বামীকে এই বিষয়ে দক্ষ কারও কাছে নিয়ে যান।

সাইকোলোজিক্যাল কাউন্সেলিং তার এই আসক্তি কাটাতে বড় রকমের সাহায্য করবে ইন শা আল্লাহ। এ ছাড়া কোনো আলিমের সাথেও এ নিয়ে কথা বলা যায়, যারা তাকে অন্তরের পরিশুদ্ধতার বিষয়ে উত্তম নাসীহা দিতে পারবেন।

আপনাকে এই পুরো পথ জুরে সবর করতে হবে। হয়তো এটাই আপনার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত পরীক্ষা। ধৈর্য্যহারা হলে চলবে না। কোনো আসক্তি থেকে মানুষ এক-দুইদিনেই বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হবে এমটি নয়। আপনি বুঝুন, নিজেকে অভয় দিন। আপনি পারবেন। শুধু একটু সবর দরকার।

নিজেকে এর জন্য দায়ী ভাববেন না। আপনার খুব কষ্ট হবে, আপনার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে কিন্তু দিন শেষে আল্লাহ ﷻ আপনাকে এর বিনিময় দেবেন। দুজনে একসাথে দু'আ করুন, আল্লাহ সাহায্যকারী।

আপনার নিজের যত্ন নেওয়াটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। আপনি যদি নিজে দুর্বল হয়ে পড়েন তবে এই পথটা আপনার জন্য আরো কঠিন হয়ে যাবে। তাই নিজের যত্ন নিন।

যদি এমন হয় যে আপনার একান্ত চেষ্টার পরও তিনি কথা শুনছেন না বা শুনতে চাইছেন না সেক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপে যেতে পারেন। আপনার পরিবারের মুরুব্বি কাউকে উক্ত সমস্যার কথা জানান এবং প্রয়োজনে তাকে ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিন। নিঃসন্দেহে এরকম কোনো ঘটনা কাম্য নয়। কিন্তু আপনার সর্বাত্মক চেষ্টার পরও যদি আলো না দেখা যায় তাহলে আপনাকে পরবর্তী ধাপ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।[১]

৮. পুরুষের যৌনতা বনাম নারীর যৌনতা

পুরুষদের জীবনে অনেক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হচ্ছে তার যৌন জীবন। পুরুষ ও নারীর যৌনতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। একজন নারী যৌনতা নিয়ে যেভাবে চিন্তা করে পুরুষেরা সেভাবে চিন্তা করে না। যৌনতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের চিন্তাধারার মাঝে বেশ খানিকটা ফারাক রয়েছে। যৌন জীবন নিয়ে চিন্তাধারার সেসব ফারাক ও অমিল সম্পর্কে অধিকাংশ নারীর কোনো প্রকার ধারণা নেই। উল্টো পুরুষদের আবেগটাকে অনেক নারী নিজের মতো করে চিন্তা করতে থাকে। ফলে

১] https://www.aboutislam.net/counseling/ask-the-counselor/marital-obstacles/when-your-husband-is-a-porn-addict/
https://www.islamweb.net/en/fatwa/103113/her-husband-is-addicted-to-pornography
https://muslimmatters.org/2020/09/26/sex-and-porn-addiction-advice-for-the-wife/
মুক্ত বাতাসের খোঁজে, লস্ট মডেস্টি, ইলমহাউস পাবলিকেশন

দেখা দেয় মতপার্থক্য, মনোমালিন্য। তাই পুরুষদের যৌনতা সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রতিটি নারীর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

❖ পুরুষদের যৌনতা শুরু হয় দেহে

নারীদের যৌন আকাঙ্ক্ষা তাদের মন, স্মৃতি বা সংযোগের সংবেদনশীল অনুভূতি দ্বারা উৎসাহিত হতে পারে। কিন্তু পুরুষদের যৌন আকাঙ্ক্ষা শারীরিক। পুরুষদের দেহে প্রচুর পরিমাণে টেস্টোস্টেরন (testosterone) হরমোন রয়েছে যা তাদেরকে যৌন আকাঙ্ক্ষার দিকে ঠেলে দেয়। কম বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সামান্যতম যৌন উস্কানিও তার যৌন ইচ্ছাকে সক্রিয় করে তুলতে পারে। পুরুষদের দেহ রসায়ন যেভাবে তার মনস্তত্ত্বকে যৌনতার দিকে পরিচালিত করে তা দমন করা কষ্টসাধ্য।

❖ পুরুষদের জন্য যৌনতা হলো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

পুরুষদের দেহ একটি দুর্দান্ত আনন্দ যন্ত্র যা থেকে সে পুরোপুরিভাবে উপভোগ করতে চায়! যেহেতু পুরুষদের জন্য বীর্যপাত সহজ এবং এটাই পুরুষদের জন্য এই আনন্দঘন মুহূর্তের ইতি; তাই বিভিন্ন যৌনক্রিয়া, আসন (position) এবং ফ্যান্টাসি দ্বারা তারা এই মুহূর্তটা দীর্ঘায়িত করে উপভোগ করতে চায়। প্রেয়সীর সামান্য মিষ্টি দুষ্টামি, মিষ্টি হাসি বা উদ্ভাস পুরুষ মস্তিষ্ককে জাগ্রত করে তুলে। সামান্য একটু ইশারায় বা যৌনতা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে পুরুষদের মস্তিষ্ক আন্দোলিত হতে পারে।

❖ পুরুষদের কাছে সহবাস মানেই চূড়ান্ত মুহূর্ত

নারীরা ধীর-স্থিরতা পছন্দ করে। তারা চায় তাদের স্বামী গল্প করবে, অনেক দুষ্টু-মিষ্টি কথা বলবে, তার আবেগকে বুঝবে, যৌনমিলনের জন্য ধীরে ধীরে আগাবে ইত্যাদি। ফলে যৌনমিলনের প্রতি নারীদের আকাঙ্ক্ষাও ধীর গতিতে বাড়ে। এক্ষেত্রে নারীদের জন্য যৌনমিলনটা মুখ্য না, বরং তার কাছে মুখ্য হলো পূর্ব-মুহূর্ত ও মধ্যকার সময়টুকু। কিন্তু পুরুষেরা এক্ষেত্রে ভিন্নভাবে চিন্তা করে। পুরুষেরা খুব সহজে সহবাসের জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়। তাই এই অবস্থায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যেতে চায়। চূড়ান্ত মুহূর্তটাই তার কাছে অধিক উপভোগ্য।

❖ পুরুষদের জন্য যৌনমিলন ভালোবাসা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম

নারীদের কাছে ভালোবাসা প্রকাশের সংজ্ঞা কিছুটা ভিন্ন। উপহার দেওয়া, রোমান্টিক আলাপ করা, অফিসে গিয়েও খোঁজখবর নেওয়া, একসাথে চাঁদনী রাত উপভোগ করা এসব হচ্ছে নারীদের কাছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু পুরুষেরা কিছুটা ভিন্নভাবে চিন্তা করে। পুরুষদের কাছে ভালোবাসা মানেই যৌনমিলন অথবা যৌনমিলনকে কেন্দ্র করেই তাদের ভালোবাসা। কিন্তু অধিকাংশ নারীই এই বিষয়টা বুঝতে পারে না। তাই

দাম্পত্য জীবন সুখী করতে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পারস্পরিক সমঝোতা খুব প্রয়োজনীয়।[১০]

উপরোক্ত বিষয়গুলো যখন একজন নারী জানবে এবং বুঝবে তখন সে তার স্বামীর সাথে তাদের মাঝের যৌন সম্পর্ক নিয়ে পরস্পর সমঝোতায় যেতে পারবে। নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও একজন নারীর ঝেড়ে কাশতে হবে। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনে একটা শূন্যতা থেকে যাবে আজীবন। আর এসব কারণেই বৈবাহিক জীবন অনেকের কাছে বিষিয়ে ওঠে।

৯. স্বামীকে বশ করে রাখার টোটকা!

পুরুষদের জীবনটা খুব যৌনমুখী। সে সারাটা জীবন তার মনের মতো একজন সঙ্গী খুঁজে বেড়ায়। যার কাছে সে দুঃখের সময় আশ্রয় পাবে, যাকে ঘিরে তার স্বপ্ন, যার আঁচল ধরেই সেই পুরুষের পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে নিষ্ঠুর এই পৃথিবী। কিন্তু মস্তিষ্কের এককোণে ঠিকই থেকে যায়—পুরুষেরা খুঁজে একজন প্রেমময়ী নারী। যেই নারী তার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকবে। যেই নারী স্বামী-সোহাগী, স্বামীকে ছাড়া সে এক মুহূর্ত কাটাতে পারে না। পূর্বে আমরা যেমনটা জেনেছি যে, পুরুষদের কাছে সহবাস হচ্ছে ভালোবাসা প্রকাশের সংজ্ঞা, সেও চায় তার প্রিয়তমা তার ভালোবাসার এই সংজ্ঞাই নিজের মননে প্রোথিত করে নিক।

◆ পুরুষেরা তার স্ত্রীর মাঝে আবেদনময়িতা খুঁজে ফিরে।

◆পুরুষেরা চায় তাদের স্ত্রী হবে তাদের প্রতি উৎসুক।

◆ সেই ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে সংগোপনে অবস্থানের সময় উদ্দীপনামূলক পোশাক পরিধানের বিকল্প নেই।

◆ পোশাক—বিশেষ করে অন্তর্বাস জাতীয় কাপড়গুলো পুরুষদেরকে খুব সহজে আকৃষ্ট করে।

◆ আর পুরুষদের চোখে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নারীদের পোশাকের রং হচ্ছে লাল।[১১]

কিন্তু বিয়ের পরপরই সাংসারিক নানান ব্যস্ততার কারণে দাম্পত্য জীবনের আনন্দগুলো ধীরে ধীরে অবহেলিত হতে থাকে ফলে স্বামীও ধীরে ধীরে আকাঙ্ক্ষা হারাতে থাকে। নারীদের উচিত এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বোঝা এবং তাদের স্বামীদের এই হক যথাযথভাবে আদায় করা।

১০] Laurie J Watson-এর আর্টিকেল The Truth About Men and Sex

১১] Journal of experimental Psychology: General- Red, Rank and Romance in Women viewing men, পৃষ্ঠা- ৩৯৯-৪০১

১০. পুরুষের কল্পজগৎ

জীবনকে উপভোগ করতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্কের সাথে আর অন্য কিছুর তুলনা হয় না। কিন্তু দিন যত গড়ায় আকর্ষণের আগুন ততই নিভু নিভু করতে থাকে। অথচ এই দাম্পত্য জীবনকে তো নিয়ে যেতে হবে বহুদূর। তাই স্বামী যাতে কিছু বছরের মাথায় নিমিষেই আকর্ষণ হারিয়ে না ফেলে সেই বিষয় মাথায় রাখা উচিত। এক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে—

◆ সহবাসের আসন পরিবর্তন করা এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সৃজনশীলভাবে নতুন নতুন আসন আবিষ্কার করা যেতে পারে। এতে পুরুষেরা সহবাসের প্রতি আরও উৎসাহিত হয়।

◆ মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করা যেতে পারে। অর্থাৎ, বেডরুম থেকে ড্রইংরুম বা লিভিং রুম, বিছানা ছেড়ে সোফা, চেয়ার বা মেঝেতে ইত্যাদি। তবে সেক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে যাতে সেই মুহূর্তের গোপনীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে।

◆ ব্যস্ততাকে কিছুদিনের জন্য ইস্তফা দিয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সমুদ্র, পাহাড়, খোলা আকাশ, চাঁদনী রাত; এরকম পরিবেশ দম্পতিকে রোমান্টিক করে তুলে।

◆ এ ছাড়াও সহবাস বা যৌনতা নিয়ে স্ত্রীদের সম্পর্কে পুরুষদের আরও অনেক ধরনের জল্পনা-কল্পনা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে। স্ত্রীদের উচিত সেগুলো নিজ থেকে জেনে নেওয়া এবং তাকে খুশি রাখতে সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা, যদি না স্বামীর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাগুলো শরী'আহর সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

বলা হয়, পুরুষেরা তাদের বীজ ছড়িয়ে দিতে পৃথিবীতে এসেছে, এটাই তার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু নারীরা এমন একজন সাথির সন্ধান করতে থাকে; যে তার সন্তানদের রক্ষা করবে, পরিবারের দায়িত্ব নিবে, আর্থিকভাবে সাবলম্বী হবে ইত্যাদি। রটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জৈব নৃবিজ্ঞানী হেলেন ফিশার বলেন— পুরুষদের মস্তিষ্কের দুটি অংশ একটি অপরটির সাথে ততটা উত্তমভাবে যুক্ত নয়। এই গঠন প্রকৃতির কারণে পুরুষেরা সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল একটি বিষয়বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে; অর্থাৎ শমস্তিষ্কের এরূপ গঠন পুরুষকে অত্যন্ত লক্ষ্যমুখী ক্ষমতা দেয়।

অন্যদিকে নারীদের মস্তিষ্কের গঠন পুরুষদের বিপরীত। নারীরা একসাথে অনেকগুলো অনুভূতি একীভূত করতে সক্ষম। পুরুষ আর নারীর এই সাধারণ একটা তারতম্য যদি দম্পতির কাছে অজানা থেকে যায় তাহলে তা দাম্পত্য জীবনের সুখকে মাটি করতে যথেষ্ট হবে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছ থেকে সুখ পাবে, নানান আবদার করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এতটুকু আপনাকে বুঝতে হবে যে, অপর লিঙ্গের মানুষটিকে তার স্রষ্টা আপনার থেকে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই তার বিষয়গুলোকে তার দৃষ্টিকোণ থেকেই বোঝার চেষ্টা করতে হবে, সেই সাথে অনেক বিষয়ে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।



||১১তম দারস||

অর্ধেক দ্বীন: পূর্বপ্রস্তুতি

﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা। [১]

মানুষ সৃষ্টিলগ্ন থেকেই একলা বসবাস করতে অপারগ। এ কারণেই জান্নাতের এত নিয়ামতও আদিপিতা আদম ﷺ–এর কাছে ফিঁকে মনে হয়েছিল কেবল একজন সঙ্গিনীর অভাবে। তাই আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ–এর একাকিত্ব দূর করতে হাওয়া ﷺ–কে তাঁর স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করেছেন। আজ আমরা এক জাহালতপূর্ণ সমাজে বসবাস করছি। জান্নাতের নায-নিয়ামত ভোগের পরও যেখানে আদম ﷺ–কে একাকিত্ব কুঁড়ে খেয়েছে সেখানে আমরা আমাদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে চলবো সেটা অভাবনীয়। সামাজিক ব্যাধি গ্রাস করে নিয়েছে আমাদের যুবসমাজকে। এমতাবস্থায় বিয়ে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

বিয়েকে বলা হয়েছে দ্বীনের অর্ধেক।[২] যেই মানুষটি দ্বীনকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে বিয়ে করতে চায় তার জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে।[৩] বিয়ে মানুষের জীবনের পথচলায় পরিপক্বতা আনে। সেই পরিপক্বতা আসে দ্বীনের দিক থেকেও। কিন্তু বিয়ের মতো পবিত্র এই বন্ধনও অনেক সময় অপবিত্র হয়ে যায় কেবল এই কারণে যে, সেসব বৈবাহিক সম্পর্কে জেনে কিংবা না জেনে আল্লাহর বিধি-বিধান লঙ্ঘন হয়।

---

[১] সূরা রূম- ২১

[২] বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান- ৫৪৮৬, মিশকাতুল মাসাবীহ- ২/২৬৮

[৩] সুনানে তিরমীযী- ২/২৯৪-২৯৫

আবার অনেক সম্পর্ক অচিরেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যেতেও দেখা যায় নানান কারণে। তাই বিষয়টা ভাবনীয়। বিয়ে আমাদের দ্বীন ও জীবনে তখনই নিয়ামত হয়ে আসবে যখন আমরা এই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানার্জন করবো। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই দারসটি সাজানো।

১. দ্বীনদার নারীদের জন্য বর্তমানে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা

খুব ছোট্ট থেকেই প্রতিটি নারী নিজের অজান্তেই নিজেকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে। রান্না-বাটি খেলা, পুতুলখেলা ইত্যাদি দিয়েই তার বিয়ের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়। সময় ঘনাতে থাকে আর সে তার এই প্রস্তুতির বিষয়ে ধীরে ধীরে অবগত হতে থাকে। একটা সময়ে পৌঁছে সে নিজের একটা কল্পনার জগৎ তৈরি করে। সেই জগতে তার পাশে কোনো এক রাজকুমারকে কল্পনা করতে থাকে সে। সেই রাজকুমারের সাথে বাস্তবে সাক্ষাৎ করার জন্য তার হৃদয়ে থাকে প্রবল ব্যাকুলতা। আর এ ব্যাকুলতার অবসান ঘটিয়ে একে বাস্তবরূপ দিতে পারে 'বিয়ে'।

কিন্তু আমাদের সমাজে সেই 'বিয়ে' শব্দটাই খুব কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। যেই বিয়েকে রাসূল ﷺ সহজ এবং সাদামাটা করতে আহ্বান করেছেন সেই বিয়েকে নিয়ে আমাদের সমাজে রয়েছে বহু বাগবিতণ্ডা। একজন নারী যে মুহূর্তটাতে সেই কল্পনার জগতের স্বপ্ন বুনতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিকূলতার শুরুটা হয় পরিবার থেকে এবং এভাবে এটি সমাজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কোনো পরিবার চায় মেয়ে পড়াশোনা শেষে চাকরি করে তারপরে বিয়ে করবে। কোনো পরিবার আবার তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও পাত্র নির্বাচনের বেলায় বেদ্বীন পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য জোরজবস্তি করতে থাকে। জেনারেল পড়ুয়া দ্বীনদার নারীদের ক্ষেত্রেই মূলত এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তাকে তার নিজের দ্বীন মেনে চলা থেকে শুরু করে বিয়ে পর্যন্ত প্রতিটা ক্ষেত্রে ভীষণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে যাদের মা-বাবারা দেরিতে বিয়ে দিতে চান, তাদের জন্য তো এই অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে তাদের সেই কল্পনার রাজ্যের রাজকুমারকে নিজ থেকে খুঁজতে গিয়ে ভুল মানুষকে পছন্দ করে হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে চরম গুনাহের অতলে হারিয়ে গিয়েছে এমনও নজির ভুরি ভুরি।

এ ছাড়াও একটি দ্বীনি মেয়েকে আরও নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় শুধু সেই উত্তম অর্ধেককে পেতে গিয়ে। আর এসব সমস্যা থেকেই সৃষ্টি হয় বিয়ের প্রয়োজনীয়তার।

◈ দ্বীনি ইলম অর্জন

দ্বীনি নারীরা সাধারণত ঘরের ভেতরে থাকে। ফলে তারা বাইরের জগৎ সম্পর্কে একটু কম অবগত থাকে। পুরুষেরা যেভাবে নানান হালাকা, মাজলিস, দ্বীনি আসর, আলিমদের সোহবতে থেকে ইলম অর্জন করতে পারে সেই সুযোগটা নারীদের থাকেনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেনারেল পড়ুয়া দ্বীনদার নারীদের পরিবারের সদস্যদের দ্বীনের বুঝ কম হয়ে থাকে। ফলে কোনো মাহরামের সাথে গিয়ে আলিমদের হালাকায় উপস্থিত হবে এটা সম্ভব হয় না। তাই দ্বীনের ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে তার শেষ আশ্রয় হয়ে যায় একজন দ্বীনি জীবনসঙ্গী। সুতরাং ইলম অর্জনের এই সংকীর্ণতা থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় পরিত্রাণ দিতে পারে একজন দ্বীনদার স্বামী।

◈ গাইরে মাহরাম থেকে নিজেকে হেফাজত করা

বর্তমান যুগের এই ব্যস্ত সময়ে পৌঁছে দ্বীনি নারীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানান প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হচ্ছে। এতে তাদের গাইরে মাহরামদের সম্মুখীন হতে হয়। এমন এক অবস্থা তৈরি হয় যে, কথা না বলে উপায় থাকে না। যেমন: গণপরিবহনে যাতায়াতের সময়, কোনোকিছু কেনার ক্ষেত্রে দোকানির সাথে কথোপকথন ইত্যাদি নানানভাবে গাইরে মাহরামদের সংস্পর্শে আসতেই হচ্ছে। কিন্তু বিয়ের মাধ্যমে একজন দ্বীনদার নারীর জন্য তার স্বামীই এসব সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ।

◈ নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য

একজন দ্বীনি নারী তার আব্রু রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কিন্তু নষ্ট এই জামানায় তার জন্যে বিষয়টা অনেক কঠিন হয়ে যায় যদি তার পরিবার দ্বীনের বুঝসম্পন্ন না হয়ে থাকে। তাই অনেকে ঘরে-বাহিরে নানানভাবে যৌন হয়রানির শিকারও হয়ে থাকে। একজন দ্বীনি নারীর কাছে তার আঙুলে কোনো গাইরে মাহরামের ইচ্ছাকৃত সামান্য স্পর্শও যৌন হয়রানির সমতুল্য। এই ভয়াবহ জামানায় তার পর্দা রক্ষার জন্য তার লেবাস হয়ে স্বামীই তাকে সাহায্য করতে পারে। আর নারীদের সাথে যদি কোনো পুরুষ থাকে তাহলে উত্ত্যক্তকারীরা সেই নারীকে উত্ত্যক্ত করতে ততটা সাহস পায় না।

◈ সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণ

বর্তমান এই হাইপার-সেক্স সমাজে সর্বাধিক ফিতনায় পতিত হয় একজন দ্বীনদার পুরুষ। যেখানে জিনা-ব্যাভিচার, অশ্লীলতা-নগ্নতা, পর্নোগ্রাফির মত নোংরা আর জঘন্য গুনাহগুলো অতীব সহলোভ্য যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই কঠিন সময়ে এসে একজন দ্বীনদার পুরুষের জন্য একাকীত্বের মাঝে টিকে থাকাটা অনেক কঠিন। যেহেতু

পুরুষদের যৌন চাহিদা নারীদের চেয়ে অনেক বেশি সেহেতু তাদের জন্য অবিবাহিত সময়গুলো পার করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় একজন দ্বীনি নারীর উচিত আরেক দ্বীনি পুরুষকে দ্বীনের খাতিরেই এ সকল ফিতনা থেকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে বিয়ের পন্থা বেছে নিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

❖ হারাম সম্পর্ক থেকে সরে আসা

এই ফিতনার জামানায় সবচেয়ে বহুল প্রচলিত এবং অন্যতম সহজলোভ্য গুনাহ হলো অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক। নারী এবং পুরুষদেরকে সময়মতো বিয়ে না দেওয়ার কারণে তারা জড়িয়ে যায় হারাম সম্পর্কের মতো ভয়াবহ গুনাহে। আর শয়তানের ওয়াসওয়াসার জন্য এই গুনাহ থেকে দ্বীনি নারী ও পুরুষরাও নিরাপদ নয়। তারাও পরিবারকে বিয়ের জন্য না মানাতে পেরে নিজেরাই এই গুনাহে পতিত হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের কথা-বার্তার নামে তারা নিজেরদের মধ্যে গোপনে যোগাযোগ করে অনেক দূর পর্যন্ত এই অবৈধ সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিবাহ বহির্ভূত এই প্রেমের সম্পর্কে ঘটে নানান কুরুচিপূর্ণ কার্যাদি। জিনার সম্পর্কতো ঘটেই, সেই সাথে অনেকে মোবাইল ফোনে নানান অশ্লীল ও গোপন ছবি, ভিডিও আদান প্রদানও করে থাকে। যা একটা ডকুমেন্ট হিসেবে থেকে যায় সেই তথাকথিত 'বয়ফ্রেন্ড' কিংবা 'উড বি হাসবেন্ড'—এর মুঠোফোনে। এর ফলে আমরা দেখতে পাই আমাদের চারপাশে কত নারী নানানভাবে এ সকল ছবি ও ভিডিও দ্বারা হুমকির শিকার হয়ে থাকে। এমনও হতে পারে, জাহিলিয়্যাহ থেকে দ্বীনে ফেরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কালো বোরকা-নিকাবে নিজেকে ঢেকে চলা কোনো বোন, যাকে এখন কোনো গাইরে মাহরাম কোনোভাবেই দেখতে পারেনা, অথচ পূর্বে আদান-প্রদান করা অশ্লীল ছবি আরেকজন পুরুষের কাছে রয়ে গিয়েছে কিংবা এও হতে পারে যে তা এখন ইন্টারনেটের নীল জগতে ঘুরাঘুরি করছে। যার অনুশোচনাবোধ ওই বোনের অন্তরকে চিরে খায় প্রতিনিয়ত।

জাহিলিয়্যাহ থেকে দ্বীনে এসে পূর্বের হারাম সম্পর্ক থেকে তাওবা করে ফিরে আসাটা অনেকের জন্য কঠিন হয়ে যায়। তবুও তারা আল্লাহর জন্য সেসব ত্যাগ করে ফিরে আসে। কিন্তু এ সময়টাতে তাদের অন্তরে সেই আগের সম্পর্কের প্রভাবটা থেকে যায়। তার জন্য সেসব ভুলে থাকাটা কঠিন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সেই নারীর জন্য বিয়েটা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

২. বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি

বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে থাকবে কিনা এ বিষয়ে আমাদের দ্বীনদার সমাজে দুইটি প্রান্তিক মত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করে থাকেন বিয়ে নিয়ে কোনো ফ্যান্টাসিই রাখা উচিত না, বিয়ের পরের জীবন অনেক কঠিন, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদি। আবার অনেকে বিয়ে নিয়ে এতোটা বেশি চিন্তা করতে থাকেন যে উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে তাদের মুখে কেবল বিয়ে শব্দটাই লেগে থাকে।

বস্তুত বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি একদম মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কাঠকোট্টা হয়ে পড়ে থাকা যেমন উচিত না ঠিক তেমনি বিয়ে নিয়ে অতিরিক্ত ফ্যান্টাসি থেকেও নিজের নফসকে বিরত রাখতে হবে।

মানুষের আবেগ থাকে, জৈবিক চাহিদা থাকে। আর যৌবনের সময়ে সেই আকাঙ্ক্ষা আরও প্রগাঢ় হতে থাকে। তাই বিয়ে নিয়ে ফ্যান্টাসি থাকবেই, এটা খুবই স্বাভাবিক মানবীয় গুণ। একে পুরোপুরি অস্বীকার করা বোকামি। এতে দাম্পত্য জীবনের সুখ থেকে নিজেকে যেমন বঞ্চিত হতে হয় ঠিক তেমনি জীবনসঙ্গীরও হক্ব নষ্ট হয়। আবার অধিক ফ্যান্টাসিতে ভোগাও ঠিক না। এতে আমল, ইবাদতের মাঝেও বিয়ের কথা চিন্তায় আসে ফলে আমলের স্বাদ নষ্ট হয়। আবার অধিক ফ্যান্টাসি থেকে অনেক গুনাহও আরম্ভ হতে থাকে। যেমন: কোনো দ্বীনদার ছেলে দেখলেই ভালো লেগে যাওয়া, তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাবা-মার অনুপস্থিতিতে বিয়েও করে ফেলা হয়। আবার এমনও হয়ে থাকে যে হবু উত্তম অর্ধেককে নিয়ে ভাবতে ভাবতে আর তার সাথে বিয়ের পর কীভাবে কীভাবে সময়গুলো কাটাবে এগুলো চিন্তা করতে করতে বিয়ে পরবর্তী কঠিন বিষয়গুলো নিয়ে অনেকে একদম বেমালুম থেকে যায়। বিয়ের মাধ্যমে জীবনে কেবল একজন নতুন মানুষের আগমনই ঘটে বিষয়টা এমন নয়, বরং বিয়ের মাধ্যমে পুরো জীবনটাই বদলে যায়। সংসার বদলে যায়, ঘর বদলে যায়, বদলে যায় ঘরের মানুষগুলো। তাই সেই দিক থেকে প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই এই বিষয়গুলো নিয়ে তেমন একটা চিন্তা ভাবনা না থাকার ফলে এবং অপ্রস্তুতির কারণে স্বামীর সংসারে যাওয়ার পর অনেকের জীবন ওলটপালট হয়ে যেতে দেখা যায়। বিষয়টা তার জন্য হয়ে যায় আকস্মিক। এজন্যই বলা হচ্ছে, হবু উত্তম অর্ধেককে নিয়ে সীমার মধ্যে থেকে চিন্তা করা যেতেই পারে কিন্তু সেই সাথে জীবনে আসন্ন পরিবর্তনটাকে গ্রহণ করার মানসিকতা ও পূর্বপ্রস্তুতিও রাখা জরুরি। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের আবেগের লাগাম নিজেদের হাতে রাখা এবং এসব ক্ষেত্রে আবেগের ওপর বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া।

অপরপক্ষে এটাও মাথায় রাখা জরুরি যে অন্তর যাতে অধিক শক্তও না হয়ে যায়। বিয়ে নিয়ে অনেকের ধারণা এমন যে, বিয়ে পরবর্তী জীবন অনেক কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা তাদের কোনো নিকট আত্মীয়, বান্ধবী, প্রতিবেশি বা অনলাইনের পরিচিত কারো বৈবাহিক অবস্থার শোচনীয়তা দেখে এমন চিন্তা-ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ ﷻ সকলের তাক্বদীর একইভাবে লিখেন নি। এরকম মানসিক অবস্থার কারণে তাদের মাঝে বিয়ে সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণার জন্ম নেয়। ফলে ধারণা থেকে জন্ম নেওয়া সেই বিতৃষ্ণা প্রতিফলিত হয় তার নিজেরও বৈবাহিক জীবনে। এই কারণেই এরকম চিন্তা ভাবনা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

৩. বিয়ের উদ্দেশ্য

নিয়তের উপরই আমল নির্ভরশীল। তাই প্রতিটি বিষয়ে আমাদের নিয়ত শুদ্ধ রাখা দরকার। বিয়ের ক্ষেত্রেও নিয়তের পরিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই নিয়ত পরিশুদ্ধ করার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে যে ইসলাম মোতাবেক বিয়ের উদ্দেশ্য কী।

◆ মানুষের জৈবিক চাহিদা রয়েছে। সেই জৈবিক চাহিদা মেটানোর হালাল পন্থা হচ্ছে বিয়ে। হাদীসে এসেছে যে, কেউ যদি হারামকে বর্জন করে হালাল বিয়ের মাধ্যমে সঙ্গী গ্রহণ করে এবং সে যদি তার সাথে মিলনে লিপ্ত হয় সেটাও সদকা হিসেবে গণ্য হবে।[৪]

◆ বিবাহের মাধ্যমে আমলে তুষ্টি আসে ফলে রবের নৈকট্য হাসিল করা সম্ভব হয়। তাই এই নিয়ত রাখা উচিত যে— বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি যাতে এর মাধ্যমে রবের নৈকট্য অর্জন করা যায়।

◆ বিয়ের মাধ্যমে চরিত্র হেফাজত করা সহজ হয়। গোপনাঙ্গ, নজর, জবান ও অন্তরের জিনা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় বিয়ের মাধ্যমে।

◆ বিয়ের মাধ্যমে ইলমে এবং রিযিকে বারাকাহ আসে। দ্বীনের বিষয়ে পরিপক্বতা আসে।

---

[৪] সহীহ মুসলিম- ১৬৭৪

হাদীসটির মূল আরবী পাঠ- عن أبي ذر: "أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر

◆ বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটানো। এই নিয়ত রেখে প্রত্যেকের অধিক সন্তান প্রসবের মানসিকতা ধারণ করা উচিত।

◆ দ্বীনের বুঝ সম্পন্ন দম্পতি পরিকল্পিত তারবিয়াতের মাধ্যমে সুসন্তান গড়ে তুলতে পারে। ফলে বিশ্বে দ্বীনদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়।

৪. শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের পূর্বে বিয়ে নিয়ে পড়াশোনা করার গুরুত্ব

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। মানুষের অগাধ ও উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরা সত্যিকার অর্থে অভিশাপ। এই অভিশাপ ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে, তাই ইসলাম জোর তাগিদ দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা বলেছে। শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেমন খাদ্য প্রয়োজন তেমনি মনের পবিত্রতা, চরিত্র ও সতীত্বকে বাঁচিয়ে রাখে বিয়ে। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামের রীতি অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বাঁচিয়ে রাখে। ইসলাম যেমন স্বামীকে স্ত্রীর জন্য করে দিয়েছে তেমনি স্ত্রীকে করেছে স্বামীর জন্য। শরী'আতে বিবাহ বলতে বোঝায়, নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত হওয়া এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়; বরং এর সঙ্গে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত।

বিয়ের ইহকালীন ও পরকালীন গুরুত্ব এবং উপকারিতা-

- বিবাহ একটি অসম্পূর্ণ মানুষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে।
- বিয়ে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রদান করে।
- বিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন।
- বিয়ে ভালোবাসা এবং সুখের অন্যতম একটি উৎস।
- বিয়ে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ–এর রেখে যাওয়া সুন্নাহ।
- বিয়ে প্রশান্তি দেয়, পার্থিব চিন্তামুক্ত রাখে।
- বিয়ে আল্লাহর বিশেষ দান বা উপহার।
- বিয়ে মন্দ চিন্তা, অস্থিরতা ও পাপ থেকে দূরে রাখে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়।
- বিয়ে পুণ্য অর্জনের দিকে ধাবিত করে।
- বিয়ের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের কল্যাণকামী হয়।
- বিয়ের মাধ্যমে সন্তান, বংশ ও মুসলিদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইবাদাত বৃদ্ধি হয়।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

আর তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।[৫]

বিবাহ নবী-রাসূলদের সুন্নাহ। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾

আর অবশ্যই তোমার আগে আমি রাসূলদের পাঠিয়েছি এবং তাদের দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।[৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বিবাহ করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

বিবাহ আমার সুন্নাহ। অতএব, যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।[৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যে এর সামর্থ্য রাখে না, তার কর্তব্য রোজা রাখা। কেননা তা জৈবিক উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।[৮]

---

[৫] সূরা রূম- ২১

[৬] সূরা রা'দ- ৩৮

[৭] সহীহ বুখারী- ৫০৫৬ ; সহীহ মুসলিম- ১৪০১; সুনানে ইবনু মাজাহ- ১৮৪৬

[৮] সহীহ বুখারী- ৪৭৭৯, ৫০৬৬; সহীহ মুসলিম- ১৪০০।

নবী কারিম ﷺ আরও বলেন,

إذا تزوَّجَ العبدُ؛ فقد استَكمَلَ نِصفَ الدِّينِ، فليتَّقِ اللهَ في النِّصفِ الباقي

কোনো ব্যক্তি যখন বিয়ে করল তখন সে দ্বীনের অর্ধেকটা পূর্ণ করে ফেলল। এখন সে যেন বাকি অর্ধাংশের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। [৯]

সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বিবাহের গুরুত্ব ব্যাপক। তাই বিয়ের পূর্বেই বিয়ে সম্পর্কে ইসলামী বিধিমালা সুবিস্তর জেনে নেওয়া খুব জরুরি। নতুবা পরবর্তীতে দাম্পত্য জীবন কলহময় ও জটিলতর হয়ে উঠবে।

হজরত উমার ؓ বলেন,

تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا

তোমরা নেতৃত্ব পাওয়ার আগেই (শরী'আতের যাবতীয়) ফিক্বহ জেনে নাও। [১০]

সাংসারিক জীবনে পদার্পণ করার সাথে সাথেই নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর বিশাল এক দায়িত্ব চলে আসে। সেই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে অবশ্যই পূর্ব থেকে তা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া জরুরি।

৫. স্বামীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে গান (হালাল), নাশীদ, নাচ, আবৃতি শেখা

স্ত্রী স্বামীর মনোরঞ্জন করতে চাইলে নাশীদ, নাচ ও কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি শিখতে ও শোনাতে পারে। তবে গানের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত মাথায় রাখতে হবে। যথা-

- ভাষা শালীন হতে হবে, অশ্লীল হতে পারবে না।
- অন্য কোনো গাইরে মাহরামের দিকে ইঙ্গিতবহ কিংবা উল্লেখমূলক হতে পারবে না।
- বাজনাবিহীন হবে।
- শরী'আহ গর্হিত কথা থাকতে পারবে না।
- স্বামী-স্ত্রী একদম নির্জন থাকবে।
- এসব শ্রবণে দুনিয়ামুখিতা বাড়বেনা বরং আখিরাতের স্বরণ হবে।

৬. দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নারীদের ব্যায়াম করা

পাশ্চাত্য সমাজে লজ্জাহীন নারীরা যেখানে একাধিক পুরুষকে আকর্ষণের উদ্দেশ্যে দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, সেখানে দ্বীনদার লজ্জাশীল নারীরা

---

[৯] শুয়াবুল ঈমান- ৫৪৮৬; মিশকাতুল মাসাবীহ- ২/২৬৮; মুদ্বেহু আওহামিল জামঈ ওয়াত তাফরীক, বাগদাদী- ২/৬৭; মু'জামুল আওসাত্ব- ৮/৩৩৫, হাদীস- ৭৬৪৭, সনদ হাসান।

[১০] সহীহ বুখারী- ৬৮৭

আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় স্বামীর আকর্ষণ ধরে রাখতে ব্যায়াম করলে সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে সেক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত মনে রাখতে হবে-

- এসব ব্যায়াম সম্পূর্ণ নারী মহলে বা একদম নির্জনে হবে। এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থাকা যাবে না।
- পর্দার খেলাফ হবে এমন পরিবেশে ব্যায়াম করা যাবে না।
- ব্যায়াম চর্চা কালীন কোন গান-বাদ্য শোনা যাবে না।
- নারীদের মহলে হলে যেন কোনো মতেই এক নারীর সামনে অন্য নারীর যে আওরাহর অংশ রয়েছে তা প্রকাশিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৭. দ্বীনদার পুরুষদের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা

বিবাহ বন্ধনে যুগলবন্দি ঘটে নারী ও পুরুষের মাঝে। তাই বিয়ের বিষয়ে কেবল নিজের দিক থেকে চিন্তা করলেই হয় না, জীবনসঙ্গীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়ার কথাও মাথায় রাখা দরকার। এর আগের দারসটিতে আলোচনা হয়েছিল পুরুষদের মানসিকতা সম্পর্কে। সেখান থেকে আমাদের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, পুরুষেরা যৌন চাহিদার দিক থেকে অনেকটাই দুর্বল। আর দ্বীনদার পুরুষদের জন্য পারিপার্শ্বিক সমাজ, বেপর্দা ও বেহায়া মহল, নগ্নতা, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি একেকটি ফিতনার কারণ। এসব ফিতনা থেকে বাঁচতে এবং সমাজকে রক্ষা করতে বিয়ের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। পূর্ববর্তী দারসে Men's Psychology Survey থেকে আমরা জেনেছিলাম পুরুষদের পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তির কথা। সেই জরিপে পর্নোগ্রাফি ও অন্যান্য ফিতনা থেকে বাঁচতে তাদের কাছে বিয়ের কেমন গুরুত্ব রয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমরা তাদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে ইন শা আল্লাহ–

- বিয়ে পুরোপুরি কার্যকর বলে মনে করি। একাকীত্বের কারণে এই ফিতনা গ্রাস করতে পারে ভালোভাবে।

- বিয়ে ছাড়া এটা (পর্নোগ্রাফি) থেকে বাঁচতে পারব বলে মনে হয় না। ট্রিগার হলেই পর্নোগ্রাফি থেকে আর দূরে থাকা যায় না।

- আসলে বিয়ে করলে যেই জৈবিক চাহিদাটা রয়েছে সেটা ইন শা আল্লাহ পূর্ণ হবে। তাহলে ফিতনায় আপতিত হওয়ার আর কোনো উদ্দেশ্যই থাকলো না।

- পর্নোগ্রাফি খুবই ক্ষতিকর। সবই বুঝি। কিন্তু সব সময় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি না। যখন শারীরিক চাহিদা তৈরি হয়, তখন তো নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন হয়। একজন স্ত্রী থাকলে সমস্যা হতো না। কিন্তু স্ত্রী না থাকায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করতে

হয়। যা সব সময় সম্ভব হয় না। এসব অত্যন্ত হতাশার। এই হতাশা স্বাভাবিক জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আমাকে। মানসিক অবস্থা অনেক করুণ হয়ে গেছে।

◈ আমি মনে করি তাকওয়া অবলম্বন করলেই ইন শা আল্লাহ বাঁচা যায়। তবে বিয়েও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।

◈ নিঃসন্দেহে বিয়ে অনেকটাই সাহায্য করবে। তবে বৈধ পন্থায় যৌনমিলন করতে পারলেই পর্নএডিকশন চলে যাবে তা সকলের জন্য সমানভাবে সত্যি নয়। অনেকে এডিকশনের এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, স্ক্রিনে উত্তেজক কিছু না দেখলে তাদের আর বীর্যপাতই হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নারীকে স্ত্রী হিসেবে পেলেও একটা সময় তাদের সেই স্ক্রিনের উত্তেজনার দ্বারস্থ হতে হয়।

◈ বিয়ের কার্যকারিতা ৬/১০। এটা ছাড়ার জন্য তাকওয়া এবং নেক আমলই সর্বাধিক কার্যকরী। বহুবিবাহও আরেকটা সমাধান হতে পারে।

◈ ফরয হয়ে গেছে বিয়ে। কারণ নিজেকে ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

◈ আমার কাছের তেমন বন্ধু নেই। একা একা থাকি সবসময়ই। তাই বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একজন বন্ধু পেলে তার কাছ থেকে সার্বিক সহযোগিতা পাবো।

◈ আমার মতে একজন পুরুষের জৈবিক চাহিদা নিবারণে ব্যাঘাত ঘটলেই মানুষ পর্নোর দিকে ধাবিত হয় (যেহেতু সেটা সহজলভ্য), তাই এসব থেকে বাঁচতে আমি বিয়েটাকেই উত্তম উপায় মনে করি।

◈ এত বেশি কার্যকরী যে, এটাই একমাত্র শরী'আহ সম্মত উপায়। আর কোনো উপায় আছে বলে আমার জানা নেই।

◈ অনেকটাই কার্যকরী মনে করি। অবসরে বা যখন একা থাকি শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয়। আবার স্বভাবতই পুরুষের মনে কাম-বাসনা সৃষ্টি হয় যার থেকে একজন পর্নদেখে বা হস্তমৈথুন করে। বিবাহ হলে এমন করার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

◈ এটা অত্যাবশ্যক। কারণ এতে একদিকে স্ত্রীর হক রক্ষা করা সম্ভব হয়, অন্যদিকে হালালভাবে বেঁচে থাকাও সম্ভব।

◈ বিয়ে প্রচুর প্রয়োজন। কারণ যারা পর্নোগ্রাফিতে নেশাগ্রস্ত ছিল বা হস্তমৈথুনে লিপ্ত ছিল, এগুলো ছেড়ে দিলে প্রথমে অনেক ভালো লাগে, অন্তরে একটা প্রশান্তি আসে কিন্তু একটা লম্বা সময়ের পর খুব মানসিক যন্ত্রণা কাজ করে। কিছুই ভালো লাগে না তখন। শারীরিক চাহিদা খুব বেড়ে যায়। ওই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে আবার ওগুলোর মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। আমি মনে করি, যারা সত্যিকারেই আল্লাহকে ভয় করে এগুলো ছেড়ে দিতে চায়, তাদের জন্য বিয়ের চেয়ে উত্তম আর সহজ সমাধান হয় না।

◆ আমি মনে করি শতভাগ কার্যকরী। মনের মাঝে যেই আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় সেটা স্ত্রীর মাধ্যমে শতভাগ পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন আর ফিতনার দিকে ধাবিত হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না।

◆ খুব বেশি কার্যকর বলে মনে করি। মানুষের চাহিদা থাকে স্বাভাবিকভাবেই। বিয়ের মাধ্যমে সেগুলাতো পূরণ হয়-ই, সঙ্গে এও মনে হয় যে, বিয়ের পর ফিতনার দিকে ঝুঁকতে গেলেও স্ত্রীর কথা মাথায় আসবে, মায়া হবে।

◆ আমি প্রচণ্ড আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রায় ৭/৮ বছরের আসক্তি। সেই বিভীষিকা থেকে লাস্ট ৩ মাস বেরিয়ে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি। তাও যে ভুল হয়নি একেবারে সেটা না। হয়েছে ২ /৩ বার ভুল। কিন্তু যেটাকে আসক্তি বলেছি সেটার কাছে কিছুই না এবং এখান থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে আর যাতে মনের মধ্যে ভুল করেও ইচ্ছা না জাগে তাই প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছি। আর এই এতটুকুর জন্য বিয়েকে আমি অতীব জরুরি মনে করছি।

◆ কিছুটা কার্যকর। তবে একবার পর্নোগ্রাফিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে শুধু বিয়ে করে এটা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব না। বরং বিয়ে এক্ষেত্রে কিছুটা সাপোর্টমাত্র। আর স্ত্রীও একজন মানুষ। তার নানা ব্যস্ততা থাকবে। গুনাহ থেকে সবসময় স্ত্রী এসেই বাঁচিয়ে দেবে না। বরং নিজে আল্লাহ ﷻ এর কাছে অনেক কান্নাকাটি করে যথাসম্ভব দৃষ্টি ও শ্রুতির হেফাযত করে যেতে হবে। নাহলে বারবার পর্নোগ্রাফির ফাঁদে পড়ে যেতে হবে।

◆ যখন খাহেশাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, সেটা থামানো অনেক কঠিন। হালাল পন্থা (বিয়ে) ছাড়া খুবই কষ্টকর। মাথা ঠান্ডা করতে নিজের মনকে অন্যদিকে অনেক কিছু করে ভুলিয়ে দিতে হয়। তাই বিয়ের বিকল্প নেই।

◆ এই জামানার ফিতনা থেকে বাঁচতে বিয়েও কার্যকরী নয়, যদি স্ত্রী স্বামীর মন-মানসিকতা না বুঝে। স্বামীর চাহিদার তোয়াক্কা করে না এমন অনেক দ্বীনদার নারীই আছে। আর এসব কারণে অনেকে বিয়ের পরও বিভিন্ন ফিতনায় জড়িয়ে যায়।

৮. পুরুষদের বহুগামী চিন্তাধারা, এই অবস্থায় নারী হিসেবে করণীয়

পুরুষেরা সাধারণত বহুগামী স্বভাবের হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তারা একাধিক নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এভাবেই তারা সৃষ্ট। ব্যতিক্রম থাকতে পারে, সেটা উদাহরণ হিসেবে আনা যায় না। সকলেই এরকম না তবে অধিকাংশই। আর এ কারণে বিয়ের কিছু বছরের মাথায় বেদ্বীনদের মাঝে দেখা যায় পরকীয়া কিংবা পতিতালয়ে গমনের প্রবণতা। তবে আলহামদুলিল্লাহ বিবাহিত দ্বীনদার পুরুষদের মাঝে পতিতালয়ে গমনের মতো স্পর্ধা নেই। তবে পরকীয়ায় জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় যেহেতু প্রথমেই

উল্লিখিত হয়েছে একের অধিক নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া পুরুষদের সহজাত। আর এ কারণেই আল্লাহ ﷻ বহুবিবাহের বিধান দিয়েছেন যাতে প্রয়োজন বা ফিতনার আশঙ্কা হলে পুরুষেরা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমানার বাহিরে গিয়ে হারামের দিকে অগ্রসর না হয়ে বিবাহের মাধ্যমে হালাল করে নেয়।

বিয়ের পর স্বামী যাতে পরকীয়ায় জড়াতে না পারে সেদিকে খেয়াল রেখে স্ত্রীদের বেশ কিছু করণীয় রয়েছে—

◆ স্ত্রীদের উচিত স্বামীদেরকে এমনভাবে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখা যাতে অন্য কোনো নারীর প্রতি তার কোনো চাহিদাই তৈরি না হয়। এই বিষয়ে উপরে কিছুটা আলোচনা হয়েছে, তবে পরবর্তী দারসে এ নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হবে ইন শা আল্লাহ।

◆ স্ত্রীদের উচিত সর্বক্ষেত্রে স্বামীদেরকে নজরদারিতার মধ্যে রাখা যাতে কোনোভাবেই সে গুনাহে জড়াতে না পারে। এক্ষেত্রে স্বামীর সাথে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসা যেতে পারে। তার সাথে বিষয়গুলো নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে পরামর্শ করা, একে অপরের মুঠোফোন, ল্যাপটপ, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদিতে যাতে উভয়েরই সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার থাকে এ বিষয়ে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

◆ কিন্তু এর মানে এই না যে, তাকে প্রতিটি বিষয়ে সন্দেহ করতে হবে। সন্দেহ করলে সম্পর্কের মাধুর্যতা নষ্ট হবে। তাই সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রিয়তমের প্রতি সবসময় ভালো ধারণা রাখতে হবে।

◆ যদি স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের মুঠোফোন, ল্যাপটপ, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদিতে প্রবেশাধিকার দিতে না চান তাহলে জোর-জবস্তি করা উচিত হবে না। অথবা যদি কিছু বিষয় এড়িয়ে যেতে চান তাহলে ভেবে নিতে হবে যে, স্বামী নিরাপত্তাজনিত কারণে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। হয়তো তার এমন কোনো গোপন নেক আমল রয়েছে যা স্ত্রীর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাক এটা স্বামী চান না।

◆ স্বামীর কাছে নিজের গাইরাত (রক্ষণশীল ঈর্ষাপরায়নতা)- এর কথা এভাবে উল্লেখ করা যে, স্ত্রী তার স্বামীকে এতোটাই ভালোবাসেন যে, তিনি অন্য কোনো পরনারীর দিকে নজর দেবেন এটা স্ত্রী চান না।

◆ স্বামী যদি নিজ থেকে তার পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তির কথা জানিয়ে সাহায্য চায় তাহলে সেটা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখানো যাবে না বরং তাকে আশ্বাস দেওয়া উচিত যে স্ত্রী তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করবে।

◆ স্বামীর পূর্বের হারাম সম্পর্ক, পর্নআসক্তি ছিল কিনা এসব জিজ্ঞাস করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এসব প্রকাশ হয়ে গেলে স্ত্রীর সামনে স্বামীর হায়া কমে যেতে পারে। তাই স্বামী নিজ থেকে সাহায্য চেয়ে যদি কিছু না বলে তাহলে তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গোপন কিছু জানার চেষ্টা করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কেননা মুসলিমদেরকে আদেশ করা হয়েছে যাতে কেউ নিজেদের পাপ প্রকাশ না করে।

◆ যদি স্বামী নিজ থেকে পরকীয়ার কথা জানায় অথবা কাউকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার আশা ব্যক্ত করে অথবা তার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করে তাহলে তার এই ইচ্ছাকে সম্মান করা উচিত। যদি মেনে নিতে কষ্ট হবে বলে মনে হয় তাহলে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এতে কাজ না হলে আল্লাহ ﷻ–এর বিধানের উপর বিশ্বাস ও তাক্বদীরের উপর ভরসা রেখে স্বামীর মতে সায় দেওয়া উচিত। কেননা এটা তার হক্ব যেহেতু আল্লাহই তার জন্য সুযোগ রেখে দিয়েছেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ উত্তম পরিকল্পনাকারী।

সার্ভেতে অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে পরকীয়া, পর্নোগ্রাফি বা এ জাতীয় ফিতনা থেকে বাঁচতে বহুবিবাহ কতটুকু কার্যকরী বলে তারা মনে করে। প্রায় ৩৩.৭৫% পুরুষের মতে বহুবিবাহের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। প্রায় ৯% বলেছেন মোটামুটি প্রয়োজন। অংশগ্রহণকারীর মাঝে কয়েকজনের ভাষ্য তুলে ধরা হচ্ছে—

◆ বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ঘটানো জরুরি। পরকীয়া, পর্নোগ্রাফিসহ এধরনের ফিতনায় এটা আল্লাহর ইচ্ছায় খুব বেশি কার্যকর হবে বলে আশা করি। বহুবিবাহের ব্যাপারে ভাইদের এবং বোনদের উভয়পক্ষকেই এগিয়ে আসা উচিত এবং সামাজিকভাবে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়ে বহুবিবাহ নিয়ে আমাদের সমাজে যে ট্যাবু রয়েছে তা দূর করা উচিত।

◆ একটি বিয়েই যথেষ্ট বলে মনে করি।

◆ বহুবিবাহ একটি ভালো সমাধান হতে পারে যেহেতু একজন স্ত্রী থাকলে তার সাথে মিলন কোনো কারণে বন্ধ থাকলে তা পুরুষদের জন্য সবর করা কষ্টের হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা ফিতনায় পড়ে যেতেই পারে। একাধিক স্ত্রী থাকলে এই সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে পর্নআসক্তি সমাধান না করে বহুবিবাহ করলেও নানাবিধ সমস্যা লেগেই থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়।

◆ বহু বিবাহ সমাজ থেকে অনেকটা উঠে যাওয়ার ফল— বিবাহের পরেও পর্নোর প্রতি আসক্তি। মানুষ বিয়ের পরেও পর্নদেখছে কারণ একজনে হয়তো তার সব চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে না। সামর্থ্য থাকলে বহু বিবাহ ভালো সমাধান।

◆ ছেলেরা ফিতরাতগতভাবেই একাধিক নারীর সঙ্গ চায়। একজন স্ত্রী হলে, মনে মনে আরো তিনটা চায়, যদিও সে নিজে মানুষ কেবল একজন। হালালভাবে একটির বেশি স্ত্রী না পেলে হারামভাবে ইন্টারনেটে অনেক নারীকে ফ্রিতে দেখতে পাওয়া যায়। চাকরি/ব্যবসা আর একজন স্ত্রীকে সময় দিয়ে গায়ে শক্তি বাকি থাকলে অনেকেই এই ফ্রি সময়ে এই হারামের দিকে চলে যেতে পারে। একাধিক স্ত্রী থাকলে একজনের পরে আরেকজনকে সময় দিয়ে আর অন্য হারাম কিছুতে মন দেওয়ার সময় থাকে না।

◆ বর্তমান সময়ে বা যুগে কোনো মেয়েই তার স্বামীর বহুবিবাহ খুশি মনে মেনে নেবে না। তবে আমার মতে দুটা বিয়ে করা যেতে পারে যদি উভয়জনকে ন্যায়ভাবে চালানোর সামর্থ্য থাকে।

◆ সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে এর প্রচলন খুবই জরুরি। আমি অবিবাহিত, তবুও বহুবিবাহের বাসনা লালন করি!

◆ আমার মনে হয় সাহায্যকারী হলে একজনই যথেষ্ট আমার জন্য, বাকিটা আল্লাহু 'আলাম।

◆ বহুবিবাহ কুরআন এ বর্ণিত হালাল বিধান। যাকে এতটা অপছন্দ করা হয় যতোটা গীবত, সুদ, ঘুষ, পরকীয়াকেও করা হয় না।

৯. ইসলামের বহুবিবাহের বিধান

ইসলামে পুরুষদের ৪টি পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তবে শর্ত হচ্ছে, সকল স্ত্রীর যথাযথ হক আদায় করতে হবে, পরস্পরের মাঝে সার্বিকভাবে ইনসাফ করতে হবে। তবে কোনো পুরুষের যদি মনে হয় যে, ইনসাফ কায়েম করতে সে ব্যর্থ ও অক্ষম হবে তাহলে তার জন্যে একাধিক বিয়ে জায়েয নেই। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾

বিবাহ করো নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমাদের ভালো লাগে- দুই, তিন অথবা চারটি। আর যদি আশঙ্কা কর যে (স্ত্রীদের মাঝে) সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে (মাত্র) একটি (বিবাহ করো)। [১১]

এই আয়াতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোনো মুসলিম পুরুষ ইচ্ছা করলে একের অধিক বিয়ে (চারের বেশি নয়) করতে পারবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো, তাকে তার স্ত্রীদের মাঝে

---

[১১] সূরা নিসা- ৩

সুবিচার অর্থাৎ একই রকম ভালোবাসা, একই মানের খাদ্য, বস্ত্র প্রদান করতে হবে এবং তাদের একের উপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়া চলবে না। আর যে একাধিক বিয়ে করতে ইচ্ছুক কিন্তু তার মনে হচ্ছে যে, সে তার স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার রক্ষা করতে পারবে না তাহলে তাকে একটি বিয়েতেই সন্তুষ্ট থাকতে বলা হচ্ছে। স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার করা নিশ্চয় কঠিন কাজ। আল্লাহ ﷻ মানুষকে সাবধান করে বলেছেন,

﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾

তোমরা যতই আগ্রহ রাখো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। [১২]

অর্থাৎ বোঝা গেল, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। একজনের ওপর অন্যজনকে প্রাধান্য দিয়ে কারও হক নষ্ট করা যাবে না। তবে উপরি-উক্ত আয়াতে উল্লেখিত ইনসাফের দুটি অংশ। প্রথম অংশে আল্লাহ বলছেন, পুরুষেরা পরিপূর্ণভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এখানে বোঝানো হচ্ছে, ভালোবাসা ও স্বাভাবিক মনের টান যা অবস্থার ভিত্তিতে অদল-বদল, কম-বেশি হবেই। কোনো মানুষই দুজনকে সব দিক থেকে সমান ভালোবাসতে পারে না। কখনো কখনো প্রথমজনের প্রতি কিছুটা বেশি ভালোবাসা অনুভূত হবে, কখনো আবার দ্বিতীয়জনের প্রতি। ভালোবাসা, মায়া, অন্তরের টান নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পুরুষ কেন, কোনো মানুষেরই নেই। সুতরাং মানসিক টান ও প্রবৃত্তিগত আবেগ কারও প্রতি কিছুটা অধিক থাকা আদল বা ইনসাফের বিপরীত নয়। কেননা, তা মানবমনের ক্ষমতার বাইরে। তবুও যতটুকু সম্ভব তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন বলেই আয়াতের শেষে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য হলো, শরী'আহ নির্ধারিত অধিকার যেমন : ভরণ-পোষণ, সময় দেয়া, রাত্রিযাপন, সহবাস, ইত্যাদির ব্যাপারে ইনসাফ বজায় রাখার ব্যাপারে তাগাদা দেয়া হয়েছে—যা নিশ্চিত করা কঠিন কিছু না। এ ব্যাপারে নবী ﷺ বলেন,

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

যে ব্যক্তির দুজন স্ত্রী আছে, কিন্তু তার মধ্যে একজনের দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে। [১৩]

---

[১২] সূরা নিসা- ১২৯

[১৩] আবু দাউদ- ২/২৪২; তিরমিযী- ৩/৪৪৭; ইবনু মাজাহ- ১/৬৩৩; নাসাঈ- ৭/৬৪; মুসনাদে আহমাদ- ২/৩৪৭; মুস্তাদরাকে হাকেম- ২/১৮৬; সহীহ ইবনে হিব্বান- ৪১৯; বুলুগুল মারাম- ৩/৩১০

১০. বর্তমান সমাজে বহুবিবাহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ পুরুষদের জন্য বহুবিবাহের বিধান উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমেও এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, একজন পুরুষের জন্য সর্বাধিক ৪টি বিয়ে করা জায়েয। আর পূর্বের দারস থেকে আমরা জেনেছি যে, কেউ যদি এই বিষয়টি অস্বীকার করে অথবা আল্লাহ ﷻ না-ইনসাফী করেছেন বা এই বিধানকে সেকেলে, অপ্রয়োজনীয়, বর্তমান সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়, আমাদের ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষদের জন্য নয়; এরকম কিছুও যদি বলে তাহলে তার ঈমান চলে যাবে।

বহুবিবাহ এমন একটি রীতি যা পূর্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আরবসহ বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত রয়েছে। আজ থেকে ৭০-৮০ বছর পূর্বেও আমাদের দেশে এই রীতি সাধারণভাবেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজ এসে আল্ট্রামডার্ন (!) মানুষগুলোর কাছে এই বিধানটি হয়ে গেছে স্পর্শকাতর। অথচ আল্লাহর বিধান হিসেবে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

এই বিষয়টা নিয়ে অনেক দ্বীনদার বোনও একদমই কথা বলতে চান না। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত, জানা উচিত যে আমাদের মগজ কয়েক দফা ধোলাই হয়ে গিয়েছে বিধায় আমরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা লালন করছি বেধর্মীদের মতো। যে নারীগণ দ্বীনকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়েছেন তাদের মাঝেও এই বিধানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে কিছুটা এমন যে, "আল্লাহ বিধান আরোপ করেছেন তাই মানতে হচ্ছে।" অনেকেই আবার সরাসরি বিরোধিতাও করে বসেন। বিষয়টা আজ যতটা স্পর্শকাতর হয়েছে ততটা স্পর্শকাতর হওয়ার কথা ছিল না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, কালের পরিক্রমায় বিষয়টাকে অস্বাভাবিক করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বেশি দূর না, আমাদের দাদা-নানাদের যুগের খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে, অনেকের দাদা-নানা একাধিক বিয়ে করেছেন। সেই সময়ের নারীদের মাঝে দ্বীনের বুঝ ততটা ছিল না। স্বভাবগতভাবেই সেই যুগের নারীগণ লজ্জাশীল ছিলেন, ইবাদতকারিণী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ইলমের সহজলভ্যতা, দা'ঈদের দাওয়াতের প্রসারতা, দ্বীনি বই পুস্তকের কালজয়ী সাফল্যসহ বহুমুখী কারণে এসময়ের দ্বীনদার নারীদের মাঝে পূর্ববর্তীদের তুলনায় দ্বীনের প্রতি অধিক মুহাব্বত লক্ষ্য করা যায়। তবুও পূর্বেকার নারীদের দ্বীনের কম বুঝ থাকা সত্ত্বেও স্বামীদের বহুবিবাহের ব্যাপারটাকে খুশি মনে তারা মেনে নিয়েছে কিন্তু বর্তমানের নারীরা তুলনামূলক দ্বীনের অধিক বুঝ সম্পন্ন হয়েও বিষয়টাকে মেনে নিতে পারছে না।

বিষয় হচ্ছে, আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বেও বহুবিবাহ ছিল মুসলিমদের জন্য আর বাকি আট-দশটা বিধানের মতোই সাধারণ একটি বিধান। কিন্তু কালের পরিক্রমায় পাশ্চাত্য সমাজ তাদের বিধি-বিধান ইসলামের বিধানের বিপরীতে পেশ করতে সক্ষম হয়েছে। আর আমরা সেসবই গোগ্রাসে গিলেছি, এখনও গিলছি। কয়েক দফা পাশ্চাত্যের ধবল ধোলাই খেয়ে আমাদের মগজ দফারফা হয়ে গিয়েছে। তাই আজকে আমাদের নিকট আল্লাহর প্রদত্ত বিধানের তুলনায় কাফির, মুশরিকদের বিধান অধিক পছন্দনীয় মনে হয়।

একাধিক বিয়ে খ্রিস্টানধর্মে নিষিদ্ধ একটি বিষয়।[১৪] এদিকে নারীবাদীদের গাত্রদাহের বিষয়ও বটে। তাই বিষময় পাশ্চাত্য সমাজ তাদের বহুবিবাহের রীতির প্রতি বিতৃষ্ণাকে আমাদের উপর চাপাতে চেয়েছে খুব সূক্ষ্মভাবে। এর পিছনে বড় আরেকটা কারণও রয়েছে। কারণটা হচ্ছে আল্লাহর রাসূল ﷺ—এর একাধিক বিবাহ। আমরা জানি, বিভিন্ন কারণে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আল্লাহ রাসূল ﷺ একাধিক বিবাহ করেছেন; যেটা কাফির, জিন্দিক ও মুরতাদদের কাছে ইসলামকে খাটো করার জন্য খুব লোভনীয় একটি টপিক। তারা চেয়েছিল এই বিষয়টি নিয়েই মুসলিমদের অন্তরে আঘাত করবে, মুসলিমদেরকে রাসূল ﷺ—এর একাধিক বিয়ে নিয়ে লজ্জিত করবে। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব হয়েছে যখন মুসলিমরা এই চর্চা থেকে বিমুখ হয়েছে। আজ আমরা নিজেরা এই বিধান থেকে বিমুখ ও এই বিধানটাকে আমরা নিজেরাই খাটো করে দেখতে শুরু করেছি। আমাদের ভাবা উচিত ছিল যে, যেই বিধানের চর্চা শ্রেষ্ঠ মানবের, সেই বিধানকে খাটো করে দেখাটা শরী'আতের নিক্তিতে কতটুকু সঠিক? যখন কাফির ও নাস্তিকগোষ্ঠী রাসূল ﷺ এর চরিত্রে আঘাত করে ও তাঁর বৈবাহিক জীবনের বিষয়টিকে বাজেভাবে ফুটিয়ে তুলে তখন মুসলিমরা লজ্জিত হয়। অথচ রাসূল ﷺ—এর সময়ের কাফিরেরা কত-শত ট্যাগ জুড়ে দিয়েছিল পবিত্র নামটির পরে কিন্তু তাদের কেউই কখনও নবীজি ﷺ—এর একাধিক বিয়ে নিয়ে তাঁর চরিত্রে আক্রমণ করেনি। কারণ সেই সমাজে সেটা স্বাভাবিক চর্চা ছিল। আমাদের মাঝে আজও যদি সেই চর্চা জীবিত থাকতো তাহলে তারা এই বিষয় নিয়ে কথা তুলে আমাদের আবেগকে আঘাত করতে পারত না এবং হুজুর ﷺ—এর শাহী নামের সাথে কলঙ্কময়ী কথা বলার স্পর্ধা দেখাতে পারত না। তারা যখন ইসলামের বহুবিবাহের বিধান নিয়ে সমালোচনা করে তখন তারা একটি বিষয়ের ওপর খুব ঘটা করে আলোকপাত করে থাকে যে, খোদ মুসলিম নারীরাই আল্লাহর বিধানের সমালোচনা করে এবং তারাই এই বিধান মানতে নারাজ,

[১৪] https://bit.ly/2ENgqdx

এমতাবস্থায় তাদের ছুড়ে দেওয়া সমালোচনার পাল্টা জবাব দেওয়ার মতো আসলেই কি আর কিছু থাকে?

১১. বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বহুবিবাহ

সমাজে বেহায়াপনা এখন তুঙ্গে। রাস্তাঘাটে বেপর্দা মেয়ে, ব্যাভিচারের সহজলভ্যতা, হারাম সম্পর্ক, পর্নোগ্রাফির সাইটগুলোতে অতি সহজ এক্সেস এমন আরও অনেক ফিতনা বর্তমানে উপস্থিত যেগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে ছিল না। এই অবস্থায় বর্তমানে পুরুষদের কতটা ঈমানী পরীক্ষা দিতে হয় তা অভাবনীয়।

আজ উম্মাহর নারীদের যে দায়িত্ব থাকার কথা ছিল, সেই দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নারীরা উল্টো নিজেদের আবেগকেই প্রাধান্য দিয়ে চলেছে। অথচ আবেগ চাইলেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বহুবিবাহ নিয়ে যেই জুজু সমাজে বিষফোঁড়া হয়ে আছে তা দূর করা প্রয়োজন। তাই আমাদেরকে বহুবিবাহের কিছু ইতিবাচক দিক জেনে রাখা আবশ্যক।

◆ এটা একটা মৃতপ্রায় বিধান, যা জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য বোনদের এ ব্যাপারে নিজেদের মনের সকল সংকীর্ণতা দূর করে ফেলা উচিত।

◆ আল্লাহ ﷻ–এর সন্তুষ্টির জন্য উম্মাহর খেদমতে নারীকে এই বিধান মেনে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। এমতাবস্থায় একাধিক স্ত্রী মানে অধিক সন্তান। আর অধিক সন্তান মানে উম্মাহর সংখ্যা বৃদ্ধি আর রাসূল ﷺ এর ঠোঁটে গর্বের হাসি। বহুবিবাহের অনেক সুবিধা রয়েছে, আর উম্মাহর জন্য দিন দিন এর প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

◆ দ্বীনদারেরা নিজেদের সন্তানদেরকে যেই শিক্ষা দেয় বেদ্বীনিরা সেই শিক্ষা দিতে পারে না। বর্তমানে দ্বীনের বুঝসম্পন্ন মানুষ সম্পূর্ণ জনসংখ্যা, এমনকি মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। এদিকে, বর্তমানে নারীদের মাঝে সন্তান-ধারণ ক্ষমতা পূর্ববর্তীদের তুলনায় অনেকটাই কমে এসেছে। এর পিছনেও রয়েছে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র। পুঁজিবাদী সমাজ অনেক কৌশল করে নারীদের সন্তান প্রসবের ক্ষমতাকে দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে একজন নারীর জন্য দু-তিনটি সন্তান প্রসব করাও কষ্টসাধ্য হয়ে দাড়িয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে বহুবিবাহ হতে পারে মোক্ষম হাতিয়ার। একাধিক স্ত্রী থেকে অধিক সন্তানগ্রহণের মাধ্যমে উম্মাহর মাঝে যোগ্য আলিম, দা'ঈ, মুজাহিদের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হবে। উম্মাহর এই ক্রান্তিকালে সংখ্যা গরিষ্ঠতা একটা বড় শক্তি।

◆ অনেক এতিম, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, শারীরিক ত্রুটিপূর্ণ, অধিক বয়স্ক মেয়েদের জন্য বিয়েটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বহুবিবাহ সমাধান হতে পারে।

◆ অনেক নারীর সন্তান হয় না। এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে সন্তান লাভ করা সম্ভব হয়।

◆ পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাও হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিন দিন এই অনুপাত বেড়েই চলছে। পুরুষদের মৃত্যুহার নারীদের তুলনায় অধিক অপরদিকে পুরুষদের জন্মহার নারীদের চেয়ে কম। আবার যেই হারে মুসলিম নিধন হচ্ছে, এতে পুরুষদের সংখ্যা কমতে থাকবে বলেই ধারণা করা যাচ্ছে। এখনই এমনটা অনেক মুসলিম অধ্যুষিত স্থানে দেখা যাচ্ছে যে, নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে পুরুষদের সংখ্যা স্বল্পতা।[১৫] এমতাবস্থায় বহুবিবাহের বিধান মেনে নিতে না পারলে উম্মাহর নারীদের অনেক বড় একটা অংশ অবিবাহিতই থেকে যাবে, সমাজের ভারসাম্য ব্যাহত হয়ে পড়বে এবং তা অসুস্থ একটি সমাজে পরিণত হবে।

◆ নারীদের হায়েয, গর্ভবতী অবস্থা, নিফাস ইত্যাদি কারণে পুরুষদের দৈহিক মিলন থেকে বিরত থাকতে হয়। যা অনেক পুরুষের জন্য কিছুটা কষ্টকর হতে পারে। অনেক নারীর সক্ষমতা কম থাকায় স্বামীর চাহিদা যথাযথভাবে পূর্ণ করতে তারা অক্ষম হয়। সেক্ষেত্রে স্বামীর অনেক সম্ভাবনা থাকে পাপে জড়িয়ে যাওয়ার। এই অবস্থায় বহুবিবাহ সমাধান।

এত সুন্দর একটা বিধান, যাতে রয়েছে একাধিক সমাধান। যদিও এর এরকম আরও বহু সুবিধা রয়েছে যা আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। আমাদের মন্দ ঈর্ষাকে যদি আমরা সাময়িক এই দুনিয়ার কয়েকদিনের জীবনে দমিয়ে রাখতে পারি, তাহলে সেটা উম্মাহর জন্য অসংখ্য ফায়দা বয়ে আনতে পারে আল্লাহর অনুমতিক্রমে।

উপরের বিষয়টি সকলকে বহুবিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়নি। বরং আল্লাহর বিধানের যুক্তিসমূহ উপস্থাপনপূর্বক এটা জানিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এই বিধান কতই না শাশ্বত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানই আমাদের জন্য সর্বাধিক উত্তম, সেটা আমরা বুঝতে পারি কিংবা না পারি, বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ ঠিকই বুঝে শুনে বিধানসমূহ আরোপ করেছেন। তাই নিজের মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ওপর ভরসা না করে আমাদের উচিত সেই মহান সত্তার উপর ভরসা রাখা, যার জ্ঞানের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

---

[১৫] https://www.middleeasteye.net/news/syrias-era-women-war-leaves-streets-empty-men



||১২তম দারস||

অর্ধেক দ্বীনঃ পরবর্তী

গুনাহের সাগরে ডুবে আছি আমরা সকলেই। ভয়ানক যত গুনাহ রয়েছে তার অধিকাংশই নারী-পুরুষজনিত এবং যৌন চাহিদা থেকেই সেসব গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই নিজেদের জৈবিক চাহিদা মেটাতে কেউ যাতে হারাম এবং ঘৃণিত কাজে লিপ্ত না হয়ে যায় তাই আল্লাহ ﷻ দিয়েছেন হালাল পন্থা—বিয়ে। বিয়ের বন্ধন বলে যদি কিছু না থাকতো তাহলে কিই বা এমন ক্ষতি হতো? বিয়ের বিধান না থাকলে দুনিয়াটাই জাহান্নামে পরিণত হতো। দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে বিপথগামী তথা পাশ্চাত্যের সভ্য নামধারী জাহেল মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপণ করলেই বোঝা যায় যে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কতটা নিচু চিন্তা তারা লালন করে। সেই সমাজ থেকে বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধন উঠে গেছে বললেই চলে। আর একারণেই তাদের মাঝে জন্ম নিয়েছে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য যৌনলিপ্সা। আমেরিকার মতো উন্নত (!) দেশে প্রতি ৭৩ সেকেন্ডে একজন নারী যৌন নিপীড়নের শিকার হয়।[১] প্রতি বছর ৪,৩৩,৬৪৮ জন নারী ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার হয় যার মাঝে প্রায় ১৫% নারী ১২-১৭ বছর বয়সী।[২] সেই দেশে ৩৫% যুগলের বিবাহবহির্ভূত সন্তান (অর্থাৎ যাকে বলা হয় জারজ সন্তান) রয়েছে। ১৯৬৮ সাল থেকে ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের মাঝে এই হার বেড়েছে দ্বিগুণ।[৩] ভাবুন, হয়তো আজ থেকে কিছু যুগ পর আমেরিকার প্রতিটি মানুষই হবে জারজ। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই বাস্তব। অথচ কত মানুষ আছে যারা নিজের ভিটেমাটি বেচে দিয়ে হলেও সেই নরকে গিয়ে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন দেখে। আমেরিকার নিউ জার্সি, ওহিও, রোহড আইল্যান্ড রাজ্যে অজাচার (incest) বৈধ। হয়তো ঘৃণ্য এই কাজটি পুরো দেশে ছড়িয়ে যাবে একদিন। এমনকি ইউরোপের ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল,

---

[১] https://www.rainn.org/statistics/victims-sexual-violence

[২] Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey, 2018 (2019). Note: RAINN applies a 5-year rolling average to adjust for changes in the year-to-year NCVS survey data

[৩] https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/11/6-demographic-trends-shaping-the-u-s- and-the-world-in-2019/

বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ দেশগুলোতে এই জঘন্যতম কাজটি সম্পূর্ণভাবে বৈধ।[8] এসব জরিপ চোখের সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা একটাই। আর তা হচ্ছে বিয়ের জরুরত বোঝা। বিয়ে আমাদের জীবনকে পবিত্র করে, সমাজকে কলুষিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখে। আর যেই সমাজে বিয়ে বলে কিছু নেই এবং যেই সমাজে বিয়ে কঠিন; সেই সমাজ দুনিয়ার বুকে ক্ষুদ্র জাহান্নামে পরিণত হবে এটা আমাদের সকলের জেনে রাখা জরুরি।

বিয়ে একজোড়া মানুষকে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে। কিন্তু বিবাহিত দম্পতির জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে আল্লাহপ্রদত্ত কিছু বেষ্টনী। সেসবও আমাদের জেনে রাখা দরকার। নাহলে হালাল সম্পর্কটাও বিষিয়ে উঠতে পারে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম করার কারণে।

১. বিয়ের শর্ত

বিয়ের রুকন মূলত তিনটি। সেগুলো হলো :

- শরঈ দৃষ্টিতে বিবাহের প্রতিবন্ধক নয় এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। যেমন: ঔরসগত কারণে অথবা দুগ্ধপানের কারণে বর ও কনে পরস্পর মাহরাম না হওয়া, বর কাফির কিন্তু কনে মুসলিম এরকম না হওয়া ইত্যাদি।

- ইজাব বা প্রস্তাবনা, যা মেয়ের অভিভাবক বা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে পেশকৃত প্রস্তাবনামূলক বাক্য। যেমন: বরকে লক্ষ করে বলা যেতে পারে—"আমি অমুককে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম" অথবা এ ধরনের অন্য কোনো কথা।

- কবুল বা গ্রহণ, এটি বর বা বরের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে সম্মতিসূচক বাক্য। যেমন: বর বলতে পারেন—"আমি গ্রহণ করলাম" অথবা এধরনের অন্য কোনো কথা।

আরও কিছু শর্ত

- ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া কিংবা নামোল্লেখ করে শনাক্ত করা অথবা গুণাবলি উল্লেখ অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে বর-কনে উভয়কে সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া;
- বর-কনে উভয়ে একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া;
- বিয়ের আকদ (চুক্তি) করানোর দায়িত্ব মেয়ের অভিভাবককে পালন করতে হবে;
- বিয়ের আকদের সময় সাক্ষী রাখতে হবে;

[8] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Legality_of_incest

- বিয়ের প্রচারণা সামাজিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে;
- অভিভাবককে কনের ধর্মের অনুসারী হওয়া;
- অভিভাবক আদীল বা ন্যায়বান হওয়া;
- বুদ্ধিমত্তার পরিপক্কতা থাকা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كانَ مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له

(কনের) ওয়ালী (অভিভাবক) ও দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্য ব্যতীত বিবাহ হয় না। এর বিপরীতে যেই বিবাহ হবে তা বাতিল। তবে যদি ওলীর সাথে (বিয়ের প্রস্তাব শরঈ ওজর ছাড়া নাকোচ করার কারণে) বাক-বিতণ্ডা হয় তাহলে এক্ষেত্রে তার ওয়ালী হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রধান।[৫]

২. ওয়ালীর শর্ত

❖ মুসলমান, বালেগ, বুদ্ধিমত্তাশীল ও বুঝমান হবে;

❖ স্বগোত্রীয় থেকে হতে হবে। যেমন: বাবা, দাদা, বড় ভাই, চাচা এভাবে স্বগোত্রীয় রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয়।

৩. সাক্ষীর শর্ত

❖ দুজন সাক্ষী থাকতে হবে;

❖ আকল বা বুদ্ধিসম্পন্ন, বালেগ, স্বাধীন, আদেল বা ন্যায়বান ও মুসলমান হওয়া।

সুতরাং পাগলের ও যিম্মির উপস্থিতি বা সাক্ষ্যে বিয়ে সংঘটিত হবেনা। তবে যিম্মি মহিলার বিবাহে যিম্মি পুরুষ সাক্ষ্য হতে পারবে। আবার কেউ কেউ এই শর্তও দিয়েছেন যে, সাক্ষ্যরা দৃষ্টিমাণ, শ্রবণশীল ও বিবাহের প্রস্তাবিত ও কবুলকৃত ভাষার বুঝমান হতে হবে। তবে কারো কারো মতে আবার ভাষা বোঝা বিবাহের সাক্ষ্যদের জন্যে শর্ত হিসেবে আরোপিত নয়।[৬]

---

[৫] সহীহ ইবনে হিব্বান- ২০৮৩, হাদীস- ৬/৬৯, (আওনুল মা'বুদের শরাহসহ) আবু দাউদ- ৪০৭৫, হাদীস-৯/২৮৭

[৬] আল মাবসূত্ব, সারাখসী- ৫/১১-১৪; উমদাতুল ক্বারী, আইনী- ২০/১২১; আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, যুহাইলী- ৪/২৯৩৪ ; রওদ্বাতুন মুসতাবীন- ১/৭৪৪ ; রওদ্বাতুত ত্বালেবীন, নববী- ৭/৪৩; কিফায়াতুল আখইয়ার ফী হাল্লি গায়াতিল ইখতেসার- ৩৫৬; আল জামে লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী- ৩/১৫৮; ফাতহুল বারী ৯/৯০; আওনুল মাবুদ- ৬/১০১; মাজমূউল ফাতাওয়া- ৩২/৫২; আল ইখতিয়ারাত, ইবনু তাইমিয়া- ৩৫০; আল মুগনী- ৯/৩৬২

৪. ইসলামে পাত্র-পাত্রী দেখার বিধান

বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্র ও পাত্রী একে অপরকে দেখা ৪ মাযহাব সহ অধিকাংশ আলিমদের মতে একটি মুস্তাহাব আমল।[৭] আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾

তোমরা বিবাহ করো সেই স্ত্রীলোক, যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে।[৮]

৫. পাত্রীকে যারা দেখতে পারবে

পাত্রীকে পাত্রের মা, বোন ও পরিবারের মহিলা শ্রেণির সবাই দেখতে পারবে কিন্তু পাত্র ছাড়া পাত্রের আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকে আর কোনো পুরুষই পাত্রীকে দেখতে পারবে না। যেমন: পাত্রের বাবা, চাচা, দাদা, ফুফা, খালু, মামা, ভাই, দুলাভাই, বন্ধু ইত্যাদি।

আজকের সমাজে এরূপটাও প্রচলিত রয়েছে যে পাত্রীকে পাত্রের বাবা, চাচা, মামা, ভাই, দুলাভাই সবাই মিলেই দেখে আসে। সেক্ষেত্রে চুল দেখতে চাওয়া হয়, হাত, পা, দাঁত দেখানো, হেঁটে দেখানো, বসে দেখানো, গান শোনানো, তিলাওয়াত শোনানো আরো অগণিত উপায়ে পরপুরুষদের সামনে পর্দার লঙ্ঘন হয়। এসব কৃষ্টি-কালচার থেকে মুসলিম নর-নারীদের বের হয়ে আসা উচিত।

৬. পাত্রীর কোন কোন অঙ্গ কতবার দেখা যাবে

পাত্রের জন্য পাত্রীকে দেখার ক্ষেত্রে কেবল পাত্রীর চেহারা, চোখ, হাতের কবজি অবধি ও পায়ের টাখনু পর্যন্ত দেখার সুযোগ রয়েছে এ ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ দেখা জায়েয নেই এমনকি মাথার চুলও দেখা জায়েয নেই। অবশ্য প্রয়োজন অনুযায়ী খুব ভালো করে দেখতে এবং বারবার তাকাতেও কোনো অসুবিধা নেই। এ ক্ষেত্রে উত্তম ও সহজ পন্থা হলো– পাত্রপক্ষের নির্ভরযোগ্য কোনো মহিলা পাত্রীর খুঁটিনাটি সবকিছু দেখে এসে পাত্রকে অবহিত করবে। এরপর বিবাহের ইচ্ছা হলে তখন পাত্র সরাসরি পাত্রীকে দেখবে। আরেকটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে যে, পাত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা যাবে না। পাত্র ও পাত্রী নির্জনে আলাদা স্থানে একত্রিত হয়ে কথা বলতে পারবে না, যা বলার মাহরামদের সামনেই বলবে।[৯]

---

[৭] শরহে মুসলিম নিন নাওয়াউই- ৯/৫৫২ হাদীস- ১৪২৪

[৮] সূরা নিসা- ৩

[৯] সুনানে আবু দাউদ- ২/৩১৫ হাদীস- ২০৮২; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২/৭২৮ হাদীস- ১৮৬৬; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক- ৬/১৬৩ হাদীস- ১০৩৩৫; হেদায়া- ৪/৪৪৩, রদ্দুর মুহতার- ১/৪০৭; ফাতাওয়া শামী- ৬/৩৭০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ৩/৩১; ফতহুল বারী- ৯/১৮২; নাইলুল আওত্বার- ৬/১১১; রওদুত্ব ত্বলেবীন- ৭/১৯

পাত্রী দেখা সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস

• হযরত আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا

একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ–কে জানালেন যে, তিনি জনৈক আনসারী মেয়েকে বিবাহ করতে চান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাস করলেন, "তুমি তাকে দেখেছো?" উত্তরে তিনি বললেন, "না, দেখিনি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যাও, দেখে এসো। কারণ, আনসারদের চোখে কিছু ত্রুটি (চক্ষু ক্ষুদ্রতা) আছে।" [১০]

• মুগীরা ইবনে শু'বা ﷺ বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। রাসূল ﷺ তখন আমাকে বললেন,

هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"তুমি কি তাকে দেখেছো?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, "তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা জন্মাবে।" [১১]

• নবী ﷺ বলেন,

إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তির অন্তরে কোনো নারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত ঢেলে দেন তখন উক্ত নারীকে দেখায় কোনো সমস্যা নেই। [১২]

• নবী ﷺ আরও বলেন,

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها الخطبة، وإن كانت لا تعلم

---

[১০] সহীহ মুসলিম- ২/১০৪ হাদীস- ১৪২৪

[১১] সুনানে তিরমিযী- ১০৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৮৬৫; মিরকাতুল মাফাতীহ- ৫/২০৫৩, হাদীস- ৩১০৭; সুনানুল কুবরা- ৭/১৩৫ থেকে ১৩৬, হাদীস- ১৩৪৮৮; সুনানুস সুগরা- ২৩৫৩; মুসনাদে আহমাদ- ৪/২৪৬; সুনানে দারেমী- ২/১৩৪; মুস্তাদরাকে হাকেম- ২/১৬৫

[১২] সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৮৬৪; মুসনাদে আহমাদ- ১৮০০৫; নাইলুল আওত্বার- ৬/১৩২, হাদীস- ২৬৪৪, হাদীসটির মান সহীহ।

তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের পর তাকে দেখলে কোনো গুনাহ হবে না, যদিও সে না জানে। [১৩]

উল্লিখিত হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বিয়ের প্রস্তাবদাতা যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রীকে দেখে, তাহলে গুনাহ হবে না। এতে এও প্রতীয়মান হলো যে, যারা বিয়ের উদ্যোগ না নিয়ে, এমনিই দেখবে তারা গুনাহগার হবে। অনুরূপ যারা বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং মহিলার রূপ-লাবণ্য দর্শনের স্বাদ উপভোগ করার উদ্দেশ্যে দেখে থাকে, তারাও পাপাচারীদের দলভুক্ত হবে।

পক্ষান্তরে এক নারীর সাথে বিবাহের কথাবার্তা পাকা করে বিবাহবন্ধনের সময় ধোঁকা দিয়ে অন্য নারীর সাথে বিয়ে দিলে সে বিবাহ শুদ্ধ নয়। এমন করলে সেই বিবাহের পর সকল মেলামেশা জিনা বলে গণ্য হবে।[১৪]

৭. বিয়েকে ঘিরে যত কুসংস্কার

মুসলিমদের জীবনে তিনটি ক্ষেত্রে দ্বীনের রীতি-রসমকে মোটামুটি প্রাধান্য দেওয়া হয়। সন্তান জন্ম নেওয়ার সময়, বিয়ে পড়ানোর সময় ও মৃত্যুর মুহূর্তে। যদিও এর সাথে মিশে আছে হাজারও কুসংস্কার। সন্তান জন্ম নিলে কানে আযান দিয়ে সুন্নাহটুকু পালন করা হয় ঠিকই কিন্তু এর আগে বা পরে রয়েছে কুসংস্কার ও কাফিরদের কৃষ্টি অনুসরণ করে বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজ যেমন: শাদ, বেবি শাওয়ার, মুখে ভাত (অন্নপ্রাশন), জন্মদিন, কপালে কালো টিপ, বাচ্চার বালিশের পাশে লোহা, ম্যাচ, রসুন রেখে দেওয়া ইত্যাদি। কারও মৃত্যুর ক্ষেত্রেও একইভাবে জানাযা, কাফন, দাফন সব ইসলামী রীতি মেনে সম্পন্ন করা হলেও একে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে আয়োজন করা হয় কুলখানী, চল্লিশার মতো অনুষ্ঠান।

বিয়ের ক্ষেত্রেও অভিন্ন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বিয়েকে সহজ করতে আদেশ দিয়েছেন। আর এটাও বলা হয়েছে যে, সেই বিয়েতেই অধিক বারাকাহ যেই বিয়েতে খরচ কম। আমাদের বর্তমান সমাজে দাম্পত্য কলহ অনেক বড় একটা ইস্যু। এর পিছনের কারণটা কী টের পাওয়া যায়? যেই বিয়েতে ৭০-৮০ হাজার টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা ছিলো না, সেখানে একটা বিয়ের পিছনে খরচ হয়ে যায় ১০-১২ লাখ। কি নেই সেই সব বিয়ের অনুষ্ঠানে! পাত্রী দেখতে যাওয়ার সময় হাজার হাজার টাকার ফলমূল আর মিষ্টি, পাত্রী পছন্দ হলে মোটা অংকের সালামী, এঙ্গেজমেন্টে স্বর্ণ-হীরা-প্লাটিনামের আংটি আদান-প্রদান, বিয়ের জন্য লাখের ওপর কেনাকাটা, সবার ম্যাচিং করে পাঞ্জাবী,

---

[১৩] মুসনাদে আহমাদ- ৫/৪২৪; নাইলুল আওত্বার- ৬/১৩২, হাদীস- ২৬৪৩; হাদীসটির মান সহীহ।

[১৪] হাশিয়াতু রওদ্বিল মুরবি- ৬/২৫৪

ম্যাচিং করে ল্যাহেঙ্গা, প্রি-ওয়েডিং ফটোশুটের নামে বিয়ের আগেই এক পরপুরুষের সাথে ঘেষে দাড়িয়ে আরেক পরপুরুষকে দিয়ে ছবি তোলানোর বেহায়াপনা, ব্রাইডাল শাওয়ার, মেহেন্দী পার্টি, গায়ে হলুদ, ব্যয়বহুল কনভেনশন হলে বিয়ের অনুষ্ঠানের নামে পাত্রী পক্ষের ওপর বিশাল এক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, ছোট করে বরপক্ষ থেকে একটা রিসিপশন (ওয়ালিমা), সবশেষে হানিমুন। আর অনুষ্ঠানগুলোতে গান বাজনা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মদ্যপানের মতো জঘন্য কাজ তো আছেই।

বিয়ে তো ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিন্তু উপরের যেই কার্যকলাপগুলো উল্লেখ করা হলো সেখানে ইসলামটা গেল কোথায়? কেবল কাজী সাহেবকে ডেকে এনে বিয়ে পড়ানো আর হাত তুলে একটা লম্বা মোনাজাত, এতটুকুই কি ইসলাম? দাম্পত্য জীবনে বারাকাহ তো এ কারণেই আসে না। যেই দম্পতির বিয়েতে আল্লাহ ﷻ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ—এর অবাধ্যতা করা হয় সেই স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্য হবে আর সেই স্বামী তার স্ত্রীর হক্কের বিষয়ে বেখবর হবে এটাই তো স্বাভাবিক।

জীবনের অনেক সুন্দর একটি ক্ষণ হচ্ছে বিয়ে। এই বিয়েকে কেন্দ্র করে আমরা যাতে জাহিলদের কার্যকলাপে জড়িয়ে না পড়ি সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি।

❖ মোহরানা কম নির্ধারণ

মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে আত্মীয় আর পাড়া-প্রতিবেশি কি বলবে সেই লোকলজ্জা থেকে পাত্রীপক্ষের অধিক মোহরানা নির্ধারণের একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা সমাজে প্রচলিত রয়েছে! অনেকের মাঝে আবার এ ধারণা রয়েছে যে, মোহরানা নির্ধারণ পর্যন্তই শেষ। পরিশোধ কেবল তখনই করতে হবে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। তাই অনেকে মোহরানা অধিক নির্ধারণ করে থাকে এই কারণে যাতে সেই পুরুষ তালাক দেওয়ার সাহসও না পায়। এতে মোহরানার অর্থ অধিক হওয়ায় তা কোনোকালেই আদায় হয়না, যদিও সেটা স্ত্রীর হক্ক। বিয়ের পর স্ত্রীর হাত-পা ধরে মাফ চেয়ে নেওয়া হয়। অপরদিকে যদি দম্পতিদের মাঝে কোনো কারণে মতের অমিলও হয়ে থাকে স্বামী চাইলেও মোহরানা পরিশোধের ভয়ে স্ত্রী থেকে আলাদা হতে পারে না। ফলে দম্পতির মাঝে তৈরি হয় মানসিক অশান্তি, এমনকি শারিরীক নির্যাতনও। তাই অসুস্থ মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসা উচিত। মোহরানা কম হোক তবুও অনাদায়ী না থাকুক।

❖ যৌতুক

একসময় যৌতুক প্রথা ছিল সামাজিক ব্যাধি যা হিন্দু সমাজ থেকে আমাদের মাঝে এসেছিল। তবে জনসচেতনতার কারণে এখন সরাসরি যৌতুক দাবি অনেকটাই কমেছে। কিন্তু বর্তমানে বরপক্ষ থেকে "আপনাদের যা খুশি তা দিয়েন" রকমের উক্তিও

আসলে যৌতুকেরই নামান্তর। যদিও গ্রাম-গঞ্জে এখনো সরাসরি যৌতুক দাবির প্রথাও কিছুটা বহাল রয়েছে। যৌতুক ইনিয়ে বিনিয়েই চাওয়া হোক আর সরাসরি দাবিই করা হোক, এসব বিষয়ে সকলকে শক্ত অবস্থানে থাকতে হবে।

◈ উপঢৌকন নিয়ে বাড়াবাড়ি

বরপক্ষ ও কনেপক্ষের মাঝে উপঢৌকন বিনিময়ের রীতি সমাজে প্রচলিত রয়েছে। উপঢৌকন একে অপরকে পাঠাতেই পারে তবে এ নিয়ে যখন বাড়াবাড়ি হয়ে যায় তখন হয় সমস্যার কারণ। অপর পক্ষ থেকে কি পাঠালো, কি পাঠালো না, সেগুলোর মান ভালো না মন্দ, পরিমাণে কম না বেশি এসব নিয়ে ঘরের নারীদের মহল থেকে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়ে পুরুষদের মহল পর্যন্ত ছড়ায়। এমনকি এসব ঠুনকো বিষয় নিয়ে বহুদিন অন্তরে একটা ক্ষোভও পুষে রাখা হয় যা পরবর্তীতে দাম্পত্য জীবনেও প্রভাব ফেলে।

◈ বিয়ের অনুষ্ঠান

ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী বিয়ের অনুষ্ঠান কেবল একটি আর সেটি হলো ওয়ালিমা, যা বরপক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়। অথচ আমাদের সমাজে মূল অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে কনেপক্ষের কাঁধে। সেখানে বরপক্ষ দলবেঁধে বেহায়ার মতো এসে খেয়ে যায়। এসব রীতি-রেওয়াজ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে কনের পরিবারের জন্য সহজ করেছে। কেননা একটা পরিবার তার সবচেয়ে বড় সম্পদ, কন্যাকেই পাত্রের হাতে তুলে দিচ্ছে যা নিশ্চয় কষ্টের। সেখানে তাদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ইসলাম কোনোমতেই সমর্থন করে না। তবে বোঝা না হয়ে গেলে কনেপক্ষ থেকে মেহমানদারী করানো যেতে পারে, সেটা ভিন্ন বিষয়।

◈ ওয়ালিমা

ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে যে বিষয়টি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় তা হচ্ছে খাবার। খাবারের স্বাদ কেমন হলো, আইটেম কয়টা পরিবেশন করা হলো, খাতিরদারিতে কী কী কমতি ছিল, পোলাওটা কেমন হলো, রোস্টটা কেমন হলো– এসব নিয়ে গীবত করেই অনেকদিন কাটিয়ে দেয় মেহমানেরা। এসবও বর্জনীয় এবং এমন নিচু মানসিকতার মানুষদেরকে এরকম অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া বর্জন করাই শ্রেয়। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, ওয়ালিমাতে কেবলমাত্র দ্বীনের বুঝসম্পন্ন মানুষদেরকে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে। যদি এমনটা করা হয় তাহলে আশা করা যায় এসব সমালোচনার শিকার হতে হবে না।

❖ পর্দা লঙ্ঘন ও শরী'আহ বহির্ভূত আচার বর্জন

পর্দার যাতে লঙ্ঘন না হয় তাই ওয়ালিমাতে নারী-পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া শরী'আহ বহির্ভূত যেসব কর্মকাণ্ড রয়েছে তা থেকে বিরত থাকা তো আবশ্যক। যেমন: নাচ-গান-বাজনা, বাজি ফোটানো, মদ্যপান বা মাদক সেবন ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া বরের জুতা লুকানো, গেট আটকে ধরে বা খাওয়ার পর বরের হাত ধুইয়ে দিয়ে টাকা দাবি করা ইত্যাদি রীতিও দোষণীয়। যদিও ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে এসব করার কোনো রাস্তা নেই যেহেতু এসব কর্মকাণ্ড সাধারণত হয়ে থাকে কনেপক্ষের তথাকথিত অনুষ্ঠানে কিন্তু ওয়ালিমার অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে বরপক্ষ থেকেই।

৮. নারীর ক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করার বিধান

ইসলামী শরী'আতে স্বামীর খেদমত করা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। তবে এরূপ করলে এটা অত্যন্ত ভালো ও প্রশংসিত কাজ বলে বিবেচিত হবে। এবং এটি ইহসান হিসেবে গণ্য হবে। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করার এ রীতি সাহাবায়ে কেরামদের জীবনেও দেখা যায়।

হজরত কাবশা বিনতে কা'ব বিন মালিক ﷺ ছিলেন হজরত আবু কাতাদা ﷺ-এর পুত্রবধূ। কাবশা ﷺ বর্ণনা করেন, একবার আবু কাতাদা ﷺ (কাবশা ﷺ-এর শ্বশুর) ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি ওযুর পানি খোঁজ করেন। তখন কাবশা ﷺ শ্বশুরকে নিজ হাতে পানি ঢেলে দেন....।[১৫]

জাবের ﷺ বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা মেয়েকে বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে, তাহলে তুমি তার সাথে খেলতে পারতে আর সে তোমার সাথে খেলাধুলা ও আমোদ- প্রমোদ করতে পারত।" জবাবে জাবের ﷺ বললেন- "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমার বাবা উহুদের যুদ্ধে নিহত (শহিদ) হয়েছেন, এবং ৯টি মেয়ে রেখে গিয়েছেন। আমি এটা অপছন্দ করি যে, তাদের মাঝে আমি এমন এক মেয়ে বিয়ে করে আনি যে তাদের মতোই (শিশুসুলভ হওয়ায়) অগোছালো হবে। বরং আমি চেয়েছিলাম তাদের কাছে আমার স্ত্রী (তাদের ভাবী) এমন হোক যে তাদের অগোছালো চুল আঁচড়ে দেবে এবং তাদের পরিচর্যা করবে।" এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- "আল্লাহ তোমার জন্য বরকতের ফায়সালা করুন।" কোনো বর্ণনায় আছে– 'উত্তম করেছ'।[১৬]

---

[১৫] আবু দাউদ, হাদীস- ৭৫

[১৬] সহীহ বুখারী- ১৯৯১, ৩৮৫৬; সহীহ মুসলিম- ৭১৫

ইমাম ইরাক্বী ﷺ এই হাদীসের আলোকে শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদের পরিচর্যা করার দলিল দিয়েছেন। ইমাম নববী ﷺ এবং ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী ﷺ-ও একই মত দিয়েছেন।

সুতরাং এই হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের খেদমত করতে পারবে এটি শরী'আতসম্মত। আর এই উদ্দেশ্যে পুরুষের বিয়ে করাতেও দোষ নেই যদিও স্ত্রীর ওপর এটি ওয়াজিব নয়।

ইমাম ইবনুল কইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ ﷺ বলেন, "আদরের কন্যা হজরত ফাতেমা ﷺ-কে স্বামীগৃহে পাঠানোর পর প্রিয় নবী ﷺ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এভাবে কাজ ভাগ করে দিয়েছিলেন যে, ঘরের ভেতরের কাজ স্ত্রী করবে আর বাইরের কাজ করবে স্বামী।"[১৭]

বোঝা যাচ্ছে, শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর বাসার অন্যান্যদের সেবাও স্ত্রীর একটি অতিরিক্ত কাজ। এটা তার দায়িত্ব নয়। কিন্তু বর্তমান সমাজ বিষয়টাকে কীভাবে দেখছে? মনে করা হয়, এটা তার অপরিহার্য দায়িত্ব বরং এটিই যেন তার প্রধান দায়িত্ব। এ সবই পরিমিতিবোধের চরম লঙ্ঘন। মা-বাবার সেবা করা সন্তানের একান্ত দায়িত্ব, পুত্রবধূর নয়। তবে পুত্রবধূ মানবিকতা ও সামাজিকতার খাতিরে অন্তত ইহসানস্বরূপ শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের অন্যান্যদের খেদমত করা উচিত। আর শ্বশুর-শাশুড়িসহ পরিবারের অন্যান্যদের খেয়াল রাখতে হবে যে, ঘরের বধূ বেতনভুক্ত চাকরানী কিংবা দাসী নয়, সে যা করছে তা তাদের প্রতি ইহসান করছে।[১৮]

অপরপক্ষে শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করা বউয়ের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এটা জানামাত্র কিছু বোন শ্বশুর-শাশুড়ির বিন্দুমাত্র সেবা বা আনুগত্য করতে চায় না। এরূপ চিন্তাধারা ইসলাম পরিপন্থি। যেখানে সাধারণ মানুষের প্রতি ইহসান করতে ইসলাম জোর তাগাদা দিয়েছে সেখানে স্বামীর পিতা-মাতা সেই ইহসানের আরও অধিক হক্বদার।

৯. প্রথম রাতে করণীয়

বিয়ের পর প্রথম রাতটি স্বামী-স্ত্রীর জন্য অনেক খাস। এই রাতটিই তাদের জীবনে অমলিন হয়ে থাকবে আজীবন। তাই এ রাতটি যাতে বিশেষ হয়ে থাকে সেই নিমিত্তে সেভাবেই রাতটিকে সাজানোর পরিকল্পনা তো থাকবেই, পাশাপাশি বাসর রাতকে ঘিরে যেসকল সুন্নাহ ও আদবসমূহ রয়েছে সেগুলোও পালন করা বাঞ্ছনীয়।

- একত্রিত হয়ে কুশলাদী বিনিময় করা এবং একদম চুপচাপ না থেকে একে অপরের সাথে মিষ্টিমিষ্টি কথা বলা উচিত। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায়

---

[১৭] যাদুল মা'আদ ৫/১৬৯

[১৮] আল বাহরুর রায়েক ৪/১৯৩; কিফায়াতুল মুফতি ৫/২৩০

করা যেতে পারে, এটি মুস্তাহাব। সেক্ষেত্রে সলাতের সময় স্ত্রী স্বামীর পিছনে দাঁড়াবে। সাহাবাদের থেকে এই আমলটির প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৯]

❖ এক পেয়ালা দুধ থেকে প্রথমে স্বামী চুমুক দিয়ে পান করা এবং পরবর্তীতে স্ত্রীও সেখান থেকেই পান করা একটি সুন্নাহ, যা রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত।[২০]

❖ স্বামীর জন্য একটি দু'আ রয়েছে যা সে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বা মাথার সামনের দিকের চুলের গোছায় হাত দিয়ে বলবে–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

স্ত্রীও এই দু'আটিই পড়বে এভাবে–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهُ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ

وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهُ عَلَيْهِ

হে আল্লাহ তার যত কল্যাণ রয়েছে এবং যত কল্যাণ তার স্বভাবে নিহিত রেখেছেন তা আমি আপনার কাছে চাই, এবং তার যত অকল্যাণ রয়েছে এবং যত অকল্যাণ তার স্বভাবে নিহিত রেখেছেন তা থেকে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।[২১]

❖ পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রথম রাতে স্ত্রীর সাথে কুশলাদী বিনিময় করেই কাটিয়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে নবদম্পতির মাঝে বোঝাপড়া ভালো হয়। তবে স্ত্রীর উচিত প্রস্তুত থাকা। যদি এমন হয় যে স্বামী তাকে সহবাসের জন্য ইঙ্গিত দেয় বা আহ্বান করে তাহলে এতে সাড়া দেওয়াই স্ত্রীর কর্তব্য। বারণ করা উচিত নয়, কেননা এতে স্বামীর মনে প্রথম দিনই মন্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

সহবাসের পূর্বে অবশ্যই সহবাসের দু'আটি পাঠ করতে হবে–

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে আপনি যে সন্তান দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন।[২২]

[১৯] মুসান্নাফ আবু শাইবাহ- ৩/৪০২, আত তাবরানী- ৯/২০৪, আব্দুর রাযযাক- ৬/১৯১ (সহীহ)

[২০] মুসনাদে আহমাদ

[২১] আবু দাউদ ২/২৪৮, নং ২১৬০, ইবনে মাজাহ ১/৬১৭, হাদীস- ১৯১৮

[২২] বুখারী- ৬/১৪১, হাদীস- ১৪১; মুসলিম- ২/১০২৮, হাদীস- ১৪৩

◈ বাকিরাহ বা কুমারী নারী হলে স্বামীর সাথে টানা ৭ দিন ৭ রাত কাটানো ও সাইয়্যেবা বা অকুমারী নারী হলে স্বামীর সাথে টানা ৩ দিন ৩ রাত কাটানোর বিষয়ে হাদীসে এসেছে।[২৩]

১০. প্রথম রাতে বধূর প্রস্তুতি

আল্লাহর ভয়ে নিজেকে সমস্ত গুনাহ থেকে গুটিয়ে রেখে একজন দ্বীনদার নারী পথ চেয়ে থাকে একজন দ্বীনদার জীবনসঙ্গীর। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তখন সে তার এই হাজারো জল্পনা-কল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে সচেষ্টা হয়। একটা সময় সেই শুভক্ষণের আবির্ভাব ঘটে তার জীবনে। নিজের সকল সৌন্দর্য পৃথিবীর তাবৎ পুরুষ থেকে গুটিয়ে রেখে নারী তার নিজের সমস্ত রূপ ফুটিয়ে তুলে শুধু একজন পুরুষের কাছেই। আর সেই পুরুষ হলো তার স্বামী। তার জীবনের নব্য দিনটি বিশেষ একটা দিন হয়ে থাকে তার কাছে। এই দিনটি নিয়ে একজন নারীর থাকে হাজারো কল্পনার বিলাস। তার কল্পনা জুড়ে থাকে নানান রোমান্টিক মুহূর্তের গল্পঝুড়ি। কিন্তু এই রোমান্টিক সব কল্পনার ভিড়ে হারিয়ে যায় সেই দিনের জন্য বাস্তব প্রস্তুতিগুলো। আর এই প্রস্তুতিহীনতা বিশেষত প্রভাব ফেলে পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন কুমারী নারীর যৌন জীবনে। তাই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভালোভাবে, খোলামেলা জেনে নেওয়া উচিত।

◈ পড়াশোনা

বিয়ের প্রথম রাত সম্পর্কে একজন নারীর যথেষ্ট ধারণা রাখা উচিত। বিষয়টা তাকে বুঝতে হবে যে, আজ নতুন এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সে। যা তার সম্পূর্ণ অজানা। কোনো অজানার সম্মুখীন অপ্রস্তুত অবস্থায় নেওয়াটা অনেক বড় এক বোকামি। তাই এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম যতদূর সম্ভব মাসআলাগত সকল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা উচিত। সেই সাথে যুগলবন্দি করতে হবে মেডিকেলজনিত বিষয়ও, যাতে প্রতীক্ষিত সেই দিনটি তার কাছে বৈদ্যুতিক ঝাটকা হয়ে না দাঁড়ায়।

◈ নতুন অভিজ্ঞতা

নারীকে বুঝতে হবে তার সাথে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে যার জন্য তাকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা মেডিকেল-বিষয়ক দারসে বিস্তারিত জানতে পারবো ইন শা আল্লাহ।

---

[২৩] মুসলিম- ৩৪৪৭, ৩৪৪৮

❖ ভালোবাসা আস্বাদন

কুমারী নারীর যোনিপথ খুব সংকীর্ণ হয়ে থাকে। এ অবস্থায় সহবাসের সময় তাকে অতি সামান্য কষ্ট সহ্য করে তার স্বামীকে গ্রহণ করতে হয়। তার স্বামীকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। প্রথম কিছু দিন সফল না হতে পারার কারণে যৌনমিলনের স্বাদও উপভোগ করা যায় না। বার বার ব্যর্থ হতে হতে একটা সময় সফল হওয়া যায়। এজন্য এই সময়টাতে তার স্বামীকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সবরের সাথে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আর এ কারণেই কুমারী নারীকে ৭ দিন-রাত সময় দেওয়ার বিষয়ে হাদীসে এসেছে। আর অকুমারীদের জন্য সতীচ্ছেদের বিষয় নেই বলে সেক্ষেত্রে ৩ দিন-রাত সময় দেওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে।[২৪] কুমারী নারীগণ এ সময়গুলোতে স্বামীর সাথে অন্যান্য যৌনদ্দীপনামূলক ভালোবাসা আদান-প্রদান করেও উপভোগ করতে পারে এবং একে অপরকে সহজ করে নিতে পারে। তবে এ বিষয়টা সবার ক্ষেত্রে নাও ঘটতে পারে, কারণ অনেক নারীর প্রথমদিনেই খুব সহজে সতীচ্ছেদ হয়ে যায়। এটা মূলত নারীর প্রস্তুতি ও মানসিক অবস্থার উপরই নির্ভর করে। তবে যাদের বেশি সময় লেগে যায় তাদেরও এখানে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। কেননা কুমারীত্ব শেষ হবার সাথে সাথেই সেই কষ্ট বা ব্যথা দূর হয়ে যায়। সে তখন তার স্বামীর ভালোবাসা পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করতে পারে।

❖ স্বামীকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া

একজন নারী তার নিজের শরীর সম্পর্কে নিজেই সবচেয়ে ভালো জানে। কীভাবে আগালে বিষয়টা সহজ হবে সেই দিক-নির্দেশনা তাই স্ত্রীর পক্ষ থেকেই কাম্য। এদিকে স্বামীও পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন হলে তার জন্য বিষয়গুলো বুঝে ওঠা কঠিন হতে পারে। তাই তাকে স্ত্রী নিজেই পুরো বিষয়টা খোলামেলাভাবে বলতে পারে এবং সবরের সাথে চেষ্টা করে যাওয়ার তাগাদা দিয়ে যেতে পারে। এমন মুহূর্তে বারবার ব্যর্থ হওয়ার দরুন স্বামী যাতে স্পৃহা না হারিয়ে ফেলে তাই তাকে অন্যপন্থায় যৌনসুখ দিয়ে তাকে উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে।

১১. আবেদনময়িতা

পুরুষেরা আবেদনময়ী নারীই অধিক পছন্দ করে। তারা এমন নারী পছন্দ করে যেই নারী লজ্জাশীল হবে, সেই সাথে স্বামীর প্রতি তার থাকবে ব্যাপক যৌনাকর্ষণ। স্বামীরা চায় স্ত্রীরা মাঝে মাঝে নিজ থেকেই সহবাসের আহ্বান করুক। কিন্তু আমাদের

[২৪] সহীহ মুসলিম- ৩৪৪৫

উপমহাদেশের নারীগণ লজ্জাশীলতার দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে যা নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়, কিন্তু অতি লজ্জার দরুন স্বামীকে সহবাসের প্রতি নিজ থেকে আহ্বান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমাদের জরিপে অংশগ্রহণকারী ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা স্ত্রীদের মাঝে দ্বীনদারিতার পাশাপাশি কোন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে চায়। তাদের কিছু মন্তব্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—

◆ ধার্মিক হওয়ার পাশাপাশি এ যুগের স্ত্রীদের শারীরিক সৌন্দর্য ও লাস্যময়ী হওয়ার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। নারীদেরকে শেখানো উচিত যে, কীভাবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে স্বামী পরকীয়া তো দূরের কথা, দ্বিতীয় বিয়ের কথাও ভুলে যাবে।

◆ স্ত্রী যদি আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকে, স্বামীর প্রতি যত্নশীল হয়, স্বামীর প্রতি অনুগত থাকে, বুদ্ধিমত্তার সাথে স্বামীকে ফিতনার পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে পারে— এজন্য যদি তাকে কিছুটা ত্যাগও স্বীকার করতে হয় তবুও। এ ছাড়াও সে যদি স্বামীর মনে এই ধারণা দিতে পারে যে, স্বামীকে সে সবসময় কাছে পেতে চায়, সবসময় তাকে খুশি দেখতে চায় তাহলে হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় স্বামীও স্ত্রীর দিকেই ঝুঁকে থাকবে এবং সবসময় চেষ্টা করবে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, স্ত্রীকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিতে। স্বামীও তাহলে চেষ্টা করবে নানামুখী ফিতনা থেকে বেঁচে থেকে স্ত্রীর মন রক্ষা করতে।

◆ প্রথমত, রোমান্টিকতা; দ্বিতীয়ত, স্বামীর কাজের যে ক্ষেত্র, সেখানে পাশে থেকে সাহায্য করা (যেমন স্বামী লেখক হলে, স্ত্রী যদি সেরকম লেখক নাও হয়ে থাকে অন্তত স্বামীর লেখা মূল্যায়ন করা, আনুষাঙ্গিক উপাদান জোগাড় করে দেওয়া ইত্যাদি)। তৃতীয়ত, স্ত্রীর এমন কোনো একটা ক্ষেত্র থাকা যাতে সেই বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকতে হয় (যেমন: বাহির থেকে এসে সাধারণ সমাদর স্ত্রীর থেকে পাওয়া, এই বিষয়ে স্ত্রীর প্রতি নির্ভরশীল থাকা যাতে স্ত্রী অনুপস্থিত থাকলে স্বামী তাকে ভালোভাবেই মিস করে)। চতুর্থত, দ্বীনের ব্যাপারে অন্তত এতটুকু জ্ঞান রাখা যা দিয়ে স্বামীকে সহায়তা বা সতর্ক করতে পারে। পঞ্চমত, শাশুড়ির সাথে ঝামেলা না করা এবং শাশুড়ির নামে স্বামীর কাছে কথায় কথায় বিচার না দিয়ে হিকমতের সাথে শাশুড়ির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা যাতে প্রয়োজনে স্বামীর সাথে ঝামেলা হলে শাশুড়ি দুইজনের প্রতি একই রকম ভালোবাসা থেকে বনিবনা করে দেয়। ষষ্ঠত, স্বামীর যদি কোনো বিশেষ দুর্বলতা বা স্পর্শকাতরতা থেকে থাকে তাহলে স্বামীর বোন বা মায়ের সাথে কথা বলে সেটা জানা এবং এই বিষয়ে সতর্ক থাকা; এবং সপ্তমত, কোনো কিছু নিয়ে খোঁটা অথবা বেশি খোঁচাখুঁচি করা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

◆ সহায়ক প্রকৃতির হওয়া, স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া, প্রেমময়ী হওয়া, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় স্বামীর জন্যেই সাজগোজ করা, নিজেকে গুছিয়ে রাখা, বিভিন্ন চাল খাটানো (অর্থাৎ, পুরুষকে দুর্বল করার জন্য নারীদের স্বভাবসুলভ কৌশলগুলো শুধু স্বামীর ওপরই প্রয়োগ করা।) স্বামীর কথাকে মূল্যায়ন করা। হারাম কাজে আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করানো যেভাবে করলে ভালো হবে, আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য না করা। ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি খাঁটিয়ে স্বামীকে তা থেকে অনাসক্ত রেখে নিজের দিকে বেশি আকৃষ্ট করা। নিজেকে স্বামীর কাছে সর্বদা গ্রহণীয় রাখতে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ সহজ না করলে কিছুই সম্ভব নয়। ঘরে স্বামীর সাথে অবস্থানের সময়ে সুগন্ধী ব্যাবহার করা যেতে পারে।

◆ ১. স্বামীকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। ২. পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে চলা এবং দ্বীনের কোন বিষয়ে ছাড় না দেওয়া। ৩. স্বামীর দুর্বল দিকগুলো জানা থাকলে ওইগুলো নিয়ে খোটা না দেওয়া এবং ওই দুর্বল দিকগুলোই কীভাবে সুন্দর করে পজিটিভলি তার কাছে রিপ্রেসেন্ট করা যায় তা ভাবা। ৪. স্বামীর মা-বাবাকে সম্মান করা এবং যতটুকু পারা যায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাদের খেদমত করা। এটা স্ত্রীর কর্তব্য না কিন্তু অনেক বড় একটা ইহসান এবং এর দ্বারা স্বামীর সন্তুষ্টির একটা ভালো অংশ অর্জন করা সম্ভব হয়। ৫. দুই জনের সম্পর্ককে প্রতিযোগিতার চোখে না দেখে সহযোগিতার চোখে দেখা। ৬. একমাত্র স্বামীর জন্যই সাজগোজ করা এবং অন্যদের স্বামীর গুনাবলি তাকে বলে না বেড়ানো।

◆ আমার ধারণা স্ত্রীকে আরও আকর্ষণীয় হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এর অর্থ, দ্বীনি পরিসীমা মেনে স্বামী যেভাবে চায় সেরকম সাজগোজ করা। পুরুষদের ক্ষেত্রে মেয়েদের রূপের ব্যাপারে পছন্দের অগ্রাধিকার থাকে। স্ত্রীর উচিত সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সেরকমভাবে সেঁজে থাকার চেষ্টা করা। ছেলেদের খাহিশাত প্রায়ই আসে, এবং হঠাৎ আসে। তাই স্ত্রীদের সবসময় কিছুটা প্রস্তুত থাকা উচিত। তা ছাড়া ছেলেরা এমন মেয়েদেরই বেশি পছন্দ করে যারা নম্রস্বরে কথা বলে, চেঁচামেচি কম করে এবং বিনয়ী হয়। উচ্চস্বরে কথা বলা ও ঝগড়াটে মেয়েদের ওপর দ্রুত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।

◆ আমার নিজের সমস্যা থেকে যা মনে হয়, তেমন কিছু না— স্ত্রী স্বামীর সাথে গল্প করবে, আড্ডা দেবে বেশি বেশি। দ্বীনি গল্প হবে, উম্মাহকে নিয়ে গল্প হবে। আর স্ত্রী বিশেষ সময়গুলোতে যদি সাড়া দেয় ঠিকমতো, যৌনমিলন আনন্দময় করতে সহয়তা করে, প্রতিদিন বা দিনে কয়েকবার চাইলেও যদি সাড়া দেয়, তাহলেই যথেষ্ট।

উপমহাদেশের নারীগণ লজ্জাশীলতার দিক থেকে অনেকটাই এগিয়ে যা নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয়, কিন্তু অতি লজ্জার দরুন স্বামীকে সহবাসের প্রতি নিজ থেকে আহ্বান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমাদের জরিপে অংশগ্রহণকারী ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা স্ত্রীদের মাঝে দ্বীনদারিতার পাশাপাশি কোন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে চায়। তাদের কিছু মন্তব্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—

◆ ধার্মিক হওয়ার পাশাপাশি এ যুগের স্ত্রীদের শারীরিক সৌন্দর্য ও লাস্যময়ী হওয়ার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। নারীদেরকে শেখানো উচিত যে, কীভাবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে স্বামী পরকীয়া তো দূরের কথা, দ্বিতীয় বিয়ের কথাও ভুলে যাবে।

◆ স্ত্রী যদি আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকে, স্বামীর প্রতি যত্নশীল হয়, স্বামীর প্রতি অনুগত থাকে, বুদ্ধিমত্তার সাথে স্বামীকে ফিতনার পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে পারে— এজন্য যদি তাকে কিছুটা ত্যাগও স্বীকার করতে হয় তবুও। এ ছাড়াও সে যদি স্বামীর মনে এই ধারণা দিতে পারে যে, স্বামীকে সে সবসময় কাছে পেতে চায়, সবসময় তাকে খুশি দেখতে চায় তাহলে হয়তো আল্লাহর ইচ্ছায় স্বামীও স্ত্রীর দিকেই ঝুঁকে থাকবে এবং সবসময় চেষ্টা করবে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে, স্ত্রীকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিতে। স্বামীও তাহলে চেষ্টা করবে নানামুখী ফিতনা থেকে বেঁচে থেকে স্ত্রীর মন রক্ষা করতে।

◆ প্রথমত, রোমান্টিকতা; দ্বিতীয়ত, স্বামীর কাজের যে ক্ষেত্র, সেখানে পাশে থেকে সাহায্য করা (যেমন স্বামী লেখক হলে, স্ত্রী যদি সেরকম লেখক নাও হয়ে থাকে অন্তত স্বামীর লেখা মূল্যায়ন করা, আনুষাঙ্গিক উপাদান জোগাড় করে দেওয়া ইত্যাদি)। তৃতীয়ত, স্ত্রীর এমন কোনো একটা ক্ষেত্র থাকা যাতে সেই বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকতে হয় (যেমন: বাহির থেকে এসে সাধারণ সমাদর স্ত্রীর থেকে পাওয়া, এই বিষয়ে স্ত্রীর প্রতি নির্ভরশীল থাকা যাতে স্ত্রী অনুপস্থিত থাকলে স্বামী তাকে ভালোভাবেই মিস করে)। চতুর্থত, দ্বীনের ব্যাপারে অন্তত এতটুকু জ্ঞান রাখা যা দিয়ে স্বামীকে সহায়তা বা সতর্ক করতে পারে। পঞ্চমত, শাশুড়ির সাথে ঝামেলা না করা এবং শাশুড়ির নামে স্বামীর কাছে কথায় কথায় বিচার না দিয়ে হিকমতের সাথে শাশুড়ির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা যাতে প্রয়োজনে স্বামীর সাথে ঝামেলা হলে শাশুড়ি দুইজনের প্রতি একই রকম ভালোবাসা থেকে বনিবনা করে দেয়। ষষ্ঠত, স্বামীর যদি কোনো বিশেষ দুর্বলতা বা স্পর্শকাতরতা থেকে থাকে তাহলে স্বামীর বোন বা মায়ের সাথে কথা বলে সেটা জানা এবং এই বিষয়ে সতর্ক থাকা; এবং সপ্তমত, কোনো কিছু নিয়ে খোঁটা অথবা বেশি খোঁচাখুঁচি করা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

◆ সহায়ক প্রকৃতির হওয়া, স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া, প্রেমময়ী হওয়া, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় স্বামীর জন্যেই সাজগোজ করা, নিজেকে গুছিয়ে রাখা, বিভিন্ন চাল খাটানো (অর্থাৎ, পুরুষকে দুর্বল করার জন্য নারীদের স্বভাবসুলভ কৌশলগুলো শুধু স্বামীর ওপরই প্রয়োগ করা।) স্বামীর কথাকে মূল্যায়ন করা। হারাম কাজে আল্লাহর ভয়ের কথা স্মরণ করানো যেভাবে করলে ভালো হবে, আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য না করা। ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি খাঁটিয়ে স্বামীকে তা থেকে অনাসক্ত রেখে নিজের দিকে বেশি আকৃষ্ট করা। নিজেকে স্বামীর কাছে সর্বদা গ্রহণীয় রাখতে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ সহজ না করলে কিছুই সম্ভব নয়। ঘরে স্বামীর সাথে অবস্থানের সময়ে সুগন্ধী ব্যাবহার করা যেতে পারে।

◆ ১. স্বামীকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। ২. পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে চলা এবং দ্বীনের কোন বিষয়ে ছাড় না দেওয়া। ৩. স্বামীর দুর্বল দিকগুলো জানা থাকলে ওইগুলো নিয়ে খোটা না দেওয়া এবং ওই দুর্বল দিকগুলোই কীভাবে সুন্দর করে পজিটিভলি তার কাছে রিপ্রেসেন্ট করা যায় তা ভাবা। ৪. স্বামীর মা-বাবাকে সম্মান করা এবং যতটুকু পারা যায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাদের খেদমত করা। এটা স্ত্রীর কর্তব্য না কিন্তু অনেক বড় একটা ইহসান এবং এর দ্বারা স্বামীর সন্তুষ্টির একটা ভালো অংশ অর্জন করা সম্ভব হয়। ৫. দুই জনের সম্পর্ককে প্রতিযোগিতার চোখে না দেখে সহযোগিতার চোখে দেখা। ৬. একমাত্র স্বামীর জন্যই সাজগোজ করা এবং অন্যদের স্বামীর গুনাবলি তাকে বলে না বেড়ানো।

◆ আমার ধারণা স্ত্রীকে আরও আকর্ষণীয় হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এর অর্থ, দ্বীনি পরিসীমা মেনে স্বামী যেভাবে চায় সেরকম সাজগোজ করা। পুরুষদের ক্ষেত্রে মেয়েদের রূপের ব্যাপারে পছন্দের অগ্রাধিকার থাকে। স্ত্রীর উচিত সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সেরকমভাবে সেঁজে থাকার চেষ্টা করা। ছেলেদের খাহিশাত প্রায়ই আসে, এবং হঠাৎ আসে। তাই স্ত্রীদের সবসময় কিছুটা প্রস্তুত থাকা উচিত। তা ছাড়া ছেলেরা এমন মেয়েদেরই বেশি পছন্দ করে যারা নম্রস্বরে কথা বলে, চেঁচামেচি কম করে এবং বিনয়ী হয়। উচ্চস্বরে কথা বলা ও ঝগড়াটে মেয়েদের ওপর দ্রুত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।

◆ আমার নিজের সমস্যা থেকে যা মনে হয়, তেমন কিছু না— স্ত্রী স্বামীর সাথে গল্প করবে, আড্ডা দেবে বেশি বেশি। দ্বীনি গল্প হবে, উম্মাহকে নিয়ে গল্প হবে। আর স্ত্রী বিশেষ সময়গুলোতে যদি সাড়া দেয় ঠিকমতো, যৌনমিলন আনন্দময় করতে সহয়তা করে, প্রতিদিন বা দিনে কয়েকবার চাইলেও যদি সাড়া দেয়, তাহলেই যথেষ্ট।

◆ স্বামীর জন্য সাজগোজ করা। আর স্বামীর প্রতি পাগলের মতো ভালোবাসা প্রকাশ করা। ভালোবাসা প্রকাশ করা—এইটা খুবই কার্যকরী যদি স্ত্রী অনেক বেশি সুন্দরী নাও হয়ে থাকে।

◆ সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই ইলমের গভীরতা প্রয়োজন। আর ধারাবাহিক প্রক্রিয়া ছাড়া ইলমের গভীরতায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। এর সাথে উভয় সঙ্গীর জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য থাকা জরুরি। যেমন : আল্লাহর শাসন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে কায়েম করা। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উভয়েরই যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও স্বচ্ছ কর্মপরিকল্পনা থাকা দরকার। মহৎ উদ্দেশ্য সামনে থাকলে সাংসারিক ছোটখাটো ঝামেলা তুচ্ছ মনে হবে।

◆ স্ত্রীর দরকার sexual fantasy, romanticism —এসব বিষয়গুলোকে বোঝা। স্বামীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা উচিত।

◆ স্বামী বাইরে থাকলে তার জন্য সবসময় খুব অপেক্ষা করে থাকা এবং সেটা স্বামীকে বুঝতে দেওয়া। স্বামীর পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া যদি না সেটা শরী'আতের পরিপন্থী হয়। স্বামীর জন্য মাঝে মাঝে সেঁজেগুজে থাকা।

◆ স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া, সৌন্দর্যের প্রকাশ করা, নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে তাকে উল্লাসিত রাখা, আবেদনময়ী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করা, কখনো বিরক্তি প্রকাশ না করা।

◆ খুব প্রেমী, সুন্দর কুরআনের তিলাওয়াত, কিছু অনন্য হালাল ঢং।

◆ ভালো ফিগার, যাতে অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে না হয়।

উপরের মন্তব্যগুলো থেকে কয়েকটা বিষয় ফুটে উঠছে— একজন নারীর কাছে সাজুগুজু, স্বামীর দৈহিক চাহিদার প্রতি খেয়াল, আবেদনময়িতা বা লাস্যময়িতা, দৈহিক সৌন্দর্য এসবই পুরুষদের মূল চাওয়া। দাম্পত্য জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে সবসময়ই এই বিষয়গুলো ধরে রাখা দরকার। দাম্পত্য জীবনের শুরুর দিকের সময়গুলো মোক্ষম সময়। এই সময়গুলোতে স্বামীর থেকে যদি উত্তম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় তাহলেই সফলতা।

প্রবাদে বলা হয়, First impression is the last impression. তাই দাম্পত্য জীবনের প্রথম মুহূর্তগুলোতে স্বামীকে অধিক সময় দেওয়া উচিত, নিজ থেকে স্বামীকে আহ্বান করা যেতে পারে, বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক ইঙ্গিত করা যেতে পারে, উদ্দীপনামূলক খেলা উপভোগ করা যায়। এসবের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনকে সবসময় চাঙ্গা রাখতে হবে। তা নাহলে খুব জলদিই স্বামী আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে তার স্ত্রীর প্রতি। তাই সুস্থ-

স্বাভাবিক ও ভালোবাসাময় দাম্পত্য জীবন বজায় রাখতে এই বিষয়ে সর্বদা প্রস্তুত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং আল্লাহর কাছে সবসময় বেশি বেশি দু'আ করা উচিত।

এর পাশাপাশি স্বামী যাতে স্ত্রীর প্রতি কখনই আকর্ষণ হারিয়ে না ফেলে তাই স্ত্রীর উচিত বেশ কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখা—

- স্বামীর জন্য সাজগোজের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা। নারীদের শরীরের সুগন্ধি পুরুষদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে।

- স্বামীর নাকে যাতে দুর্গন্ধ না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা, যেমন রান্নাঘরের মসলার অধিক ঝাজালো গন্ধ, হায়েয দুর্গন্ধ ইত্যাদি। হায়েযের পর উক্ত স্থানে সুগন্ধি ব্যবহারের বিষয়ে আমরা পূর্বেও জেনেছিলাম। এ ছাড়া স্বামীর সাথে অবস্থানকালে বায়ু নির্গমনের বিষয়েও সাবধান হওয়া উচিত।

- স্বামী দূর সফর থেকে ফিরে আসলে তার জন্য নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখা। এই অবস্থায় ক্ষুর ব্যবহার করে নিজেকে পরিষ্কারের বিষয়েও হাদীসে পাওয়া যায়। মূলত সফর থেকে ফিরে আসলে পুরুষেরা সহবাসের প্রতি উৎসুক থাকে। তাই স্বামীর জন্য সেরকম বিশেষ আয়োজন করা উচিত।

- স্বামীর হালাল যত চাহিদা রয়েছে সেগুলো নিজের কাছে অপছন্দনীয় হলেও স্বামীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে সেসব পালন করা।

- স্বামী যৌনক্রিয়ার সময় হারাম কোনো কাজ করতে চাইলে তাকে সহজভাবে বাধা দেওয়া। তাকে বোঝানো তবুও যদি সে না বুঝতে চায় সেক্ষেত্রে শক্ত অবস্থানে আসা। স্বামীর বাধ্যতা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে আল্লাহর অবাধ্য হয়।

১২. স্ত্রীর স্তন চোষা বা চুমু খাওয়া

স্বামী-স্ত্রী মিলনের পূর্বে একে অপরকে বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীকে উত্তেজিত করে সহবাস করা ফুক্বাহাগণ মুস্তাহাব বলেছেন। যেমন: চুমু খেয়ে, স্তন মর্দন কিংবা তাতে চুমু খেয়ে অথবা চোষণের মাধ্যমে উত্তেজিত করা ইত্যাদি। এতে ৪ মাযহাবের সকল ইমাম একমত।

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, স্ত্রীর স্তনে যদি দুগ্ধ থেকে থাকে তাহলে স্বামীকে সর্তকতার সাথে চোষণ করতে হবে, যেন দুগ্ধ মুখে চলে না যায়। নতুবা চোষণ থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, স্ত্রীর স্তনের দুগ্ধ পান করা একটি মারাত্মক গুনাহের কাজ। কিন্তু যদি অধিক উত্তেজনাবশত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কেউ স্ত্রীর দুধ পান

করেও ফেলে তবে স্ত্রী তার জন্যে হারাম হবে না, যেমনটা প্রচলিত রয়েছে। তবে এ কাজের জন্যে তাওবাহ করতে হবে।[২৫]

১৩. মিলনের সময় যোনিপথে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর বিধান

উলামায়ে কেরামদের একদল একে জায়েয বলেছেন এই শর্তে যে, যেন পায়ুপথে এমন করা না হয় এবং হায়েয ও নিফাসের সময়েও এমন করা যাবে না। তবে এটি মাকারিমে আখলাক পরিপন্থী একটি কাজ।[২৬]

১৪. যোনি বা লিঙ্গ মুখ দিয়ে স্পর্শ করার বিধান

এই কাজটিকে অধিকাংশ উলামাগণই মাকরূহ বলেছেন যদিও কতিপয় আলিম একে জায়েয বলে থাকেন। এ ছাড়াও এটি কুরআন সুন্নাহ কিংবা সাহাবি ও তাবেয়ীদের আসার (বর্ণনা) থেকে প্রমাণিত সুষ্ঠ যৌনাচার নয়। তবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে সহবাসের পূর্বে পরস্পরের গোপনাঙ্গে চুমু খাওয়া বা নেড়ে দেওয়াতে সমস্যা নেই বরং এতে সাওয়াব হবে বলে ইমাম আবু হানীফা ﵀ থেকে বর্ণিত। কিন্তু সহবাসের পর যদি নাপাকি লেগে থাকে তবে সে মুহূর্তে একে অপরের গোপনাঙ্গে চুমু খাওয়া জায়েয নেই। এর উপরেই হানাফী, হাম্বলী, শাফেয়ীদের একদল ও মালেকীদের একদল ফতোয়া দিয়েছেন।[২৭]

১৫. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের বিধান

মৌলিকভাবে এর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে—

◈স্থায়ী পদ্ধতি

যার দ্বারা নারী বা পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা চিরতরে হারিয়ে ফেলে। এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ অবৈধ। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী ﵀ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

وهو محرم بالاتفاق

স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। [২৮]

---

[২৫] সূরা বাক্বারাহ- ২২৩; ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া (পুরাতন নুসখা)- ১২/৩১০ ; ফতোয়ায়ে শামী- ১/৩১, ৪/৩৯৭; তাফসীরে মাযহারী- ১/৩৫৬; কেফায়াতুল মুফতী- ৫/১৬২; আযীযুল ফাতাওয়া- ৭৭০; ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া (নতুন নুসখা)- ৬/৩৪৬

[২৬] আল্লামা দিমইয়াত্বির হাশিয়াতু ইয়ানাতিত ত্বলিবীন- ৩/৩৮৮

[২৭] বাহরুর রায়েক- ৮/৩৫৪; মুহীতুল বুরহানী- ৮/১৩৪; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া- ৫/৩৭২; আহসানুল ফাতাওয়া- ৮/৪৫; নাজমুল ফাতাওয়া- ৩/৩৩৯; রদ্দুল মুহতার- ৬/৩৬৭; যাখীরাতুল ফাতাওয়া- ৭/৩২৯; আল ইনসাফ, মারদাউই- ৮/৩৩; মাওয়াহিবুল জালিল- ৩/৪০৬; মাওয়াহিবুল জালিল- ৩/৪০৬; আল খিরাশি আলা মুখতাসারিল খালিল- ৩/১৬০; ইআনাতুত ত্বালিবীন- ৩/৩৪০

[২৮] উমদাতুল ক্বারী- ২/৭২

◈ অস্থায়ী পদ্ধতি

যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর কেউই স্থায়ীভাবে প্রজনন ক্ষমতাহীন হয়ে যায় না। যেমন: আযল করা (সহবাসের চরম পুলকের মুহূর্তে স্ত্রীর যোনির বাহিরে বীর্যপাত ঘটানো), Condom, Jelly, Cream, Foam, Douche ইত্যাদি ব্যবহার করা, পিল (Pill) খাওয়া, জরায়ুর মুখ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া, ইঞ্জেকশন নেওয়া ইত্যাদি। অস্থায়ী পদ্ধতি কেবল নিম্মোক্ত ক্ষেত্রে বৈধ হবে–

◆ দুই বাচ্চার জন্মের মাঝে কিছু সময় বিরতি দেওয়া, যাতে প্রথম সন্তানের লালন-পালন, পরিচর্যা ঠিকমতো হয়;

◆ কোনো কারণে নারী সন্তান লালন-পালনের সামর্থ্য না হলে;

◆ নারী অসুস্থ ও দুর্বল হওয়ার কারণে গর্ভধারণ বিপজ্জনক হলে;

◆ গর্ভধারণের কারণে দুধ শুকানোর দরুন পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হলে এবং দুধের বিকল্প কোনো ব্যবস্থাও না থাকলে;

◆ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল হওয়ার কারণে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা থাকলে;

◆ মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তারের মতানুযায়ী বাচ্চা নিলে মায়ের জীবননাশের বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে;

◆ স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে নিজ বাসস্থান থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করলে;

◆ দারুল হারবে (যেখানে কাফিরদের সাথে ইসলামী সশস্ত্র জিহাদ ফরয হয়ে গেছে) বসবাসের কারণে নবাগত সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা হলে।

অথবা এধরনের অন্য কোনো শরী'আহ সিদ্ধ সমস্যা বা ওযরের কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয রয়েছে।

عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي ﷺ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا

হযরত জাবের ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে আযল (যা জন্মনিয়ন্ত্রণের পুরনো ও অস্থায়ী পদ্ধতি) করতাম। এবং তার কানে এই সংবাদ গেলেও তিনি আমাদের নিষেধ করেননি। [২৯]

কিন্তু কনডম (Condom) ব্যবহার করা, Jelly, Cream, Foam ইত্যাদির ব্যবহার (এগুলো শুক্রাণুকে নিষিক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে), ডাউচ (Douche) ব্যবহার করা

---

[২৯] সহীহ বুখারী- ২৫০; সহীহ মুসলিম- ১৬০

(অর্থাৎ পানির পিচকারী দিয়ে জরায়ু ধুয়ে ফেলা); জরায়ুর মুখ বন্ধ করে দেওয়া, পিল (Pill) খাওয়া, ইনজেকশন নেওয়া ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো বিনা ওযরে অবলম্বন করা মাকরুহ। কেননা এগুলোও আযলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে পিল এবং ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সেগুলো আলাদাভাবে মাকরুহে তানযীহী। পিল ও ইনজেকশন এক্ষেত্রে ব্যবহার শরী'আহর দৃষ্টিতে তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিকর। এ নিয়ে মেডিকেল বিষয়ক দারসে আলোচনা হবে, ইন শা আল্লাহ।

◈ গর্ভপাত ঘটানো (Abortion)

এটি জন্মনিয়ন্ত্রণের বহু পুরাতন একটি পদ্ধতি। জন্মনিয়ন্ত্রণের (Contraceptives) উপায়-উপাদানের অনেক উন্নতি সত্ত্বেও আজ অবধি দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এ পদ্ধতি চালু আছে। এ পদ্ধতিও নাজায়েয। তবে যদি মহিলা অত্যাধিক দুর্বল হয়, যার কারণে গর্ভধারণ তার জন্য আশঙ্কাজনক হয় এবং গর্ভধারণের মেয়াদ চার মাসের কম হয় তাহলে গর্ভপাত বৈধ হবে। মেয়াদ চার মাসের অধিক হলে কোনোভাবেই বৈধ হবে না। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন,

উম্মতে মুসলিমার সকল ফুক্বাহা এ ব্যাপারে একমত, (রূহ আসার পর) গর্ভপাত করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। কারণ এটা الوأد (সূক্ষ্মভাবে সমাধিত)– এর অন্তর্ভুক্ত।

এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾

যখন (কিয়ামতের দিন) জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে... [৩০]

১৬. যেসকল কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয নেই

নিম্নবর্ণিত কারণগুলো অস্থায়ীভাবেও জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ হওয়ার ওজর হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

◆ পুরুষ বা নারী নিজেদের দৈহিক সৌন্দর্য বা ফিগার ঠিক রাখার জন্য;

◆ কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ার ভয়ে। যাতে পরবর্তীতে এদের বিয়ে-শাদির ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়;

◆ গর্ভধারণ কষ্ট, প্রসব বেদনা, নিফাস, দুধ পান করানো এবং বাচ্চার সেবা-যত্ন ইত্যাদি কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য;

[৩০] তাকউইর ৮-৯; ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া- ৪/২১৭

◆ গর্ভধারণ থেকে শুরু করে বাচ্চা বড় হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এর সেবা-যত্নের পিছনে কল্পনাতীত শ্রম দেওয়ার কারণে সৃষ্ট সম্ভাব্য খিটখিটে মেজাজ থেকে বাঁচার জন্য;

◆ অধিক সন্তান নেওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করা;

◆ অধিক সন্তান জন্ম নিলে তাদের ভরণ-পোষণে আর্থিক অভাব অনটন, খাদ্য ও ভূমি-সম্পদ সংকট দেখা দেবে এই ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা।

উল্লিখিত কারণসমূহ সামনে রেখে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয এবং হারাম। বিশেষ করে শেষের কারণটি ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে প্রকাশ্য এবং সরাসরি সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এর ভয়াবহতা অনেক মারাত্মক।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমানে এই কারণটিকে সামনে রেখেই অধিকাংশ মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। অথচ আর্থিক দুর্বলতা ও সচ্ছলতা এবং রিযিকের ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ ﷻ কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾

আর পৃথিবীতে বিচরণকারী সকলের রিযিক বা জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন।[৩১]

﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم﴾

তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক দিই এবং তাদেরকেও।[৩২]

﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا﴾

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আমিই রিযিক দান করে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[৩৩]

---

[৩১] সূরা হুদ- ৬

[৩২] সূরা আন'আম- ১৫১

[৩৩] সূরা বনী ইসরাঈল- ৩১

উল্লিখিত আয়াতসমূহের দ্বারা যখন একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেকটি প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা আল্লাহ ﷻ নিজ দায়িত্বে নিয়ে রেখেছেন, তখন এই জীবিকার ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা আল্লাহকে অযোগ্য ঘোষণা করার শামিল এবং এই আয়াতসমূহ অস্বীকার করার নামান্তর। তাই এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানকে ভেবে-চিন্তে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, দুনিয়ার সামান্য ভোগবিলাস, কষ্ট বা লোকলজ্জার ভয়ে আমরা যেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ঈমান ও আখিরাতকে বরবাদ করে না দিই। আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে সহীহ সমঝ ও তাঁর দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন এবং দ্বীনের প্রত্যেকটি বিষয়কে সহজভাবে গ্রহণ করা ও মেনে চলার জন্য আমাদের অন্তরকে উন্মুক্ত করে দিন। আমীন।

❖ আলোচনার সারসংক্ষেপ

- স্থায়ীভাবে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করা নাজায়েয এবং হারাম। তবে যদি জরায়ুতে এমন কোনো রোগ হয়, যার থেকে জরায়ু কেটে ফেলা ছাড়া আরোগ্য লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে তা কেটে ফেলা জায়েয আছে;

- অস্থায়ী পদ্ধতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ মাকরূহ। তবে শরঈ ওজরবশত জায়েয;

- দরিদ্রতা ও লজ্জার ভয়ে অস্থায়ী বা সাময়িক জন্ম বিরতি মাকরূহে তাহরীমী এবং হারাম;

- জরায়ুতে বীর্য প্রবেশ করার পরে তাতে যদি প্রাণ সঞ্চার হয়ে থাকে তাহলে গর্ভপাত করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। তবে গর্ভে সন্তানের ছয় মাসের কম এবং চার মাসের বেশির সুরতে মায়ের জীবন নাশের আশঙ্কা থাকলে জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নয়। আর চার মাসের কমের সুরতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে বিনা ওজরে গর্ভপাত করা মাকরূহে তাহরীমী, আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পেলে মাকরূহে তানযীহী। অবশ্য শরঈ ওজরের কারণে হলে মাকরূহ হবে না।[৩৪]

---

[৩৪] বিস্তারিত দেখুন: সুনানে আবু দাউদ- ১/২৮০, ১/২৯৫; মুসলিম শরীফ- ১/৪৬৫; বুখারী শরীফ- ২/৫৮৯, পৃষ্ঠা- ৭৮৪; আল মিনহাজ শরহে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ- ১/৪৬৪ ; ফাতাওয়া শামী- ৯/৬২২, পৃষ্ঠা- ১০/২৬২; জাদীদ ফিকহী মাসায়েল- ১/১৯৭-২০৩; জাওয়াহিরুল ফিকহ- ৭/৭৭-১৫৬; ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা, পৃষ্ঠা- ২২৪ থেকে ২৪৪ (সা'দ প্রকাশনী); ফতোয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ, জাওয়াব নং- ৪৭৯৫১

১৭. ভ্রূণ নষ্ট করার বিষয়ে শরী'আহর বিধান

গর্ভে সন্তান চলে আসার পর অকারণে ভ্রূণ নষ্ট করা জায়েয নেই। তবে নিম্নোক্ত শরঈ ওজরগুলো পাওয়া গেলে গর্ভস্থ সন্তানের ৪ মাসের আগে এবরশন বা ভ্রূণ নষ্ট করা যাবে। আর সেগুলো হলো-

- মহিলা অসুস্থ ও দুর্বল হওয়ার কারণে গর্ভধারণ বিপজ্জনক হলে;
- গর্ভধারণের কারণে দুধ শুকানোর দরুন পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হলে এবং দুধের বিকল্প কোনো ব্যবস্থাও না থাকলে;
- স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল হওয়ার কারণে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা থাকলে;
- মুসলিম বিজ্ঞ ডাক্তারের মতানুযায়ী বাচ্চা নিলে মায়ের জীবননাশের বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে;
- দারুল হারবে (যেখানে কাফিরদের সাথে ইসলামী সশস্ত্র জিহাদ ফরয হয়ে গেছে) বসবাসের কারণে নবাগত সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা হলে;
- কোন কাফির জোরপূর্বক মুসলিম মেয়ের সাথে জিনা করেছে ফলে পেটে বাচ্চা চলে আসলে।

তবে যদি বাচ্চার শরীরে রুহ চলে আসে, তাহলে তা নষ্ট করা জায়েয হবে না। পেটের বাচ্চার শরীরে রূহ আসে চার মাস অর্থাৎ ১২০ দিন পর। ভ্রূণের বয়স ১২০ দিন পার হয়ে গেলে তা নষ্ট করা সর্বসম্মত মতানুসারে হারাম।

আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, মহা সত্যবাদী আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান নিজ নিজ মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। ওইভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। অতঃপর তা গোশতপিণ্ডে পরিণত হয়ে (আগের মতো চল্লিশ দিন) থাকে। অতঃপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। আর তাঁকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেওয়া হয়। তাঁকে 'আমল, রিযিক, আয়ু এবং সে কি পাপী হবে নাকি নেককার হবে তা লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়। অতঃপর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়।"[৩৫]

১৮. পায়ুপথে সঙ্গম করার বিধান

স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস মারাত্মক কবীরা গুনাহ। কেননা, এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল রয়েছে। এমনকি ইমাম ত্বহাবী ﵀ বলেন- "এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত

---

[৩৫] সহীহ বুখারী- ৩২০৮

হাদীসগুলো মুতাওয়াতির (অর্থাৎ বর্ণনা-পরম্পরার প্রতিটি স্তরেই রয়েছে বৃহৎ সংখ্যা)।"[৩৬]

ইমাম নববী ﷺ বলেন,

واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا، لأحاديث كثيرة مشهورة.

হায়েয কিংবা পবিত্র উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর পায়ুগমন নিষেধ হওয়া মর্মে বহু প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হওয়ায় সকল নির্ভরযোগ্য আলিমগণ এই পায়ুগমন হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে একমত।[৩৭]

ইমাম ইবনুল আরাবী ﷺ ইমাম ক্বাযী ইয়ায ﷺ থেকে বর্ণনা,

حرَّم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يُحرِّم الدبر لأجل النجاسة اللازمة

যেখানে আল্লাহ ﷻ অস্থায়ী নাপাকির কারণেই হায়েয অবস্থায় যোনিপথে গমন করা হারাম করেছেন সেখানে স্থায়ী নাপাকির কারণে পায়ুপথে গমন করা হারাম হওয়া অধিক অগ্রগণ্য।[৩৮]

স্ত্রীর পায়ুগমণ হারাম হওয়ার বিষয়ে ইমাম যাহাবী ﷺ আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাতে এই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

এবং এটি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় ১২ জনের অধিক সাহাবি থেকে পৃথকভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই সহীহ ও হাসান পর্যায়ের। যেমনটি ইমাম কুরতুবী ﷺ তার তাফসীরে বলেছেন।[৪০]

এ সংক্রান্ত কতিপয় সহীহ হাদীস—

- আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

[৩৬] শরহু মাআনিল আসার- ৩/৪৩

[৩৭] শরহে সহীহ মুসলিম- ৭/১০

[৩৮] আহকামুল কুরআন- ১/১৭৪; তাফসীরে কুরতুবী- ৩/৯৪

[৩৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা- ১৪/১২৮

[৪০] তাফসীরে কুরতুবী- ৩/৯৫

যে তার স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করে; সে যেন আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত দ্বীন হতে মুক্ত হয়ে গেল। [৪১]

◈ ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর পায়ুপথে যৌনমিলন করে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। [৪২]

◈ খুযাইমা ইবন সাবিত ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ

হে মানবমণ্ডলী, আল্লাহ ﷻ সত্য কথা (প্রকাশের) ব্যাপারে লজ্জা করেন না। তোমরা স্ত্রীলোকদের পায়ুপথে সঙ্গম করো না। [৪৩]

◈ আবু হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে নিতম্বে সহবাস করে সে লা'নতপ্রাপ্ত। [৪৪]

৪ মাযহাবসহ যাহেরী মাযহাবেও একে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দেহ থেকে সকল উপায়ে সুখ নেওয়ার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেতস্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবেই ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে গমণ কর। [৪৫]

---

[৪১] আবু দাউদ- ৩৯০৪

[৪২] সুনানে তিরমিযী- ১১৬৫

[৪৩] সুনানে নাসাঈ- ৮৯৩৩; সুনানে ইবনু মাজাহ- ১৯২৪; মুসনাদে আহমাদ- ২১৮৫৮; মুসনাদে শাফেয়ী- ৯০; মুসনাদে হুমাইদী- ৪৪০; আল মুনতাকা, ইবনু জারুদ- ৭২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৪২০০; মু'জামুল কাবীর- ৩৭১৬, হাদীসটি সহীহ

[৪৪] বুখারী- ৫৮৬৫; আবু দাউদ- ২১৬২; মুসনাদে আহমাদ- ২/৪৭৯

[৪৫] সূরা বাকারা- ২২৩

তবে যেসব উপায়ে সুখ নেওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল আছে, সেগুলো পরিহারযোগ্য। যেমন:

- মলদ্বারে সহবাস;
- ঋতুবতী অবস্থায় সহবাস;
- প্রসব পরবর্তী সময়ে নির্গত রক্তস্রাব অর্থাৎ নিফাসরত অবস্থায় সহবাস।

১৯. বিভিন্ন আসনে (Position) সহবাস করার বিষয়ে শরঈ দৃষ্টিকোণ

ইমাম মুজাহিদ ﷺ সহ মুফাসসিরগণ তাফসীরে বলেন,

قَابِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ

দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়, সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে (সঙ্গম করতে পারো, তবে তা হতে হবে) স্ত্রীর যোনিপথে।[৪৬]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,

إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

ইচ্ছে হলে উপুড় হয়ে, ইচ্ছা করলে উপুড় না করে (সহবাস করতে পারবে) তবে তা একই দ্বারে (যোনিপথে) হতে হবে।[৪৭]

হায়েয/নিফাস অবস্থা ব্যতীত ও পায়ুপথ ছাড়া সামনে কিংবা পিছন দিক থেকে যোনিপথে গমন করার বিধানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী, আহমাদ, ত্বহাবী ও ইবনু হিব্বান ﷺ উমার ﷺ—এর ঘটনা সংবলিত একটি হাদীস নিয়ে এসেছেন।[৪৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ ﷺ এই আয়াত তথা সূরা বাক্বারাহর দ্বারা যুক্তি সহকারে স্ত্রীর পায়ুপথ গমন হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কেননা আল্লাহ ﷻ নারীর যোনিপথকে শস্যক্ষেত্র বলেছেন, যা মূলত সন্তান জন্মের স্থান। সেক্ষেত্রে এ আয়াতে স্ত্রীর যোনিপথে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে (যেকোনো আসনে) গমন করার কথা বলেছেন।[৪৯]

---

[৪৬] তাফসীর তাবারী- ২/৩৮৭-৩৮৮ ; তাফসীরে ইবনু কাসীর- ২/৩০৫; দুররে মানছুর- ১/২৬৫; মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা- ৪/২৩২

[৪৭] সহীহ মুসলিম- ১৪৩৫

[৪৮] তিরমিযী- ৮/২৫৮ (তুহফাতুল আহওয়াযী সহ); মুসনাদে আহমাদ- ১/২৯৭; মুশকিলিল আসার- ৫৩৫৪; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৯/৬১৬, হাদীসটির মান সহীহ

[৪৯] যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খইরিল ইবাদ- ৪/২৪০

||১৩তম দারস||

মেডিকেল: যৌন মিলন

নারীদের জীবনের বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো যৌনমিলন। এ সম্পর্কে শরী'আহর দৃষ্টিভঙ্গি তো জানতে হবেই, এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলোও জেনে নেওয়া জরুরি।

১. সতীচ্ছেদ

কুমারী নারীদের ক্ষেত্রে বিয়ের পর সতীচ্ছেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সতীচ্ছেদ কী, কীভাবে সহজ হয় ইত্যাদি বিষয়গুলোর মেডিকেল দৃষ্টিভঙ্গিটাও আমাদের জেনে নিতে হবে।

সমাজে ধারণা রয়েছে যে, প্রথম যৌনমিলনে যোনিপথ থেকে রক্তপাত হওয়াকেই সতীচ্ছেদ বলে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। হাইমেন (Hymen) নামক একটি পর্দা যোনিপথ ঢেকে রাখে। এটিতে ছেদ হয়ে যাওয়াই হচ্ছে সতীচ্ছেদ। এর গঠন বিভিন্ন রকমের হতে পারে। অনেকের পাতলা হয়, অনেকের পুরু হয়, অনেকের এটি থাকে আবার অনেকের থাকে না।

এটা ভুল ধারণা যে, প্রথম যৌনমিলনে রক্ত বের হবেই। আর এটাও ভুল যে, রক্ত বের না হলে সেই নারী কুমারী নয়। যাদের হাইমেন অক্ষত থাকবে তাদের রক্তপাত হবে কিন্তু যাদের বিভিন্ন কারণে হাইমেন ছিঁড়ে যায় তাদের রক্তপাত হবে না। খেলাধুলা, নাচ, সাইকেল চালানো, হস্তমৈথুন, টেম্পন ব্যবহার এরকম আরো অনেক কারণে হাইমেন নামক পর্দাটি ছিঁড়ে যেতে পারে।

২. প্রথম যৌনমিলনে করণীয়

পুরুষেরা যৌনমিলনে এতো আগ্রহ কেন দেখায় অনেকেরই এমন একটা প্রশ্ন থাকে। পুরুষ ও নারীদের ফিতরাত ভিন্ন। তারা নারীদের প্রতি খুব সহজেই আকর্ষিত হবে এটাই স্বাভাবিক। দ্বীনদার পুরুষেরা তাদের চোখ সংযত রাখে, একজন অন্তর প্রশান্তকারীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। নারীদের চেয়ে পুরুষদের জন্য চরিত্র হেফাজত করে দ্বীনের উপর অটল থাকা অধিক কঠিন। পুরুষ এবং নারীদের ফ্যান্টাসিও ভিন্ন। সাধারণত দ্বীন মেনে চলা নারীরা বিয়ে করতে আগ্রহী হয় পর্দা করা বা নিজের দ্বীন পালনের সহজতার জন্য। অপরদিকে পুরুষেরা বিয়ে করে নিজের দৃষ্টি ও চরিত্র হেফাযতের জন্য। তাই একজন পুরুষ চাইবেই তার স্ত্রী প্রেমময়ী হোক। এজন্য মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। যেহেতু সেই পুরুষ এতোদিন নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করে এসেছে তাই প্রথম রাতে স্বামী মিলনের জন্য অধিক আগ্রহ দেখাতেই পারে। এমতাবস্থায় প্রথম রাতে যৌনসঙ্গমকে নেতিবাচক ভাবে নিলে এতে পরবর্তীতে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে, যৌনতা সম্পর্কে মন্দ ধারণা অন্তরে জন্ম নিতে পারে। এ ছাড়া এভাবে জায়েয ব্যাপারে কুধারণা রাখা অনুচিত যদিও পুরুষদেরকে প্রথম রাতেই যৌনসঙ্গম করার বিষয়ে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে স্বামী আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার মাধ্যম ও জান্নাতে যাওয়ার সোপান। প্রথমবার যৌনমিলনের ক্ষেত্রে একজন কুমারী নারীর সর্বাধিক ঝামেলায় পড়তে হয় সতীচ্ছেদের ভয় নিয়ে। ব্যাপারটাকে সহজ করা যেতে পারে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে–

- নারী ও পুরুষে যৌন চাহিদা এক নয় বরং পুরুষদের চাহিদা কিছুটা বেশি। তাই স্ত্রীর উচিত স্বামীকে সুকুন দেওয়া ও তার প্রতি সহযোগী মনোভাব রাখা। প্রাথমিক সময়গুলোতে যৌনমিলনের মুহূর্তে স্ত্রীর উচিত নিজেকে মেলে ধরে স্বামীর শান্তির কারণ হওয়া। মানসিক প্রস্তুতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। একে অপরের জন্য প্রেমময়ী হলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। হাদীসে বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে প্রেমময়ী ও অধিক সন্তানের জন্মদাত্রী নারীদেরকে নির্বাচন করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- দাম্পত্য জীবনের প্রথম সময়গুলো নি'আমাত। তাই সময়টাকে উপভোগ্য করে তোলা উচিত। মন্দ ধারণা ও অতিরিক্ত ইতস্ততবোধ বিষয়টা বিরক্তিকর করে তোলে। অতএব ভয় বা যৌনমিলনকালে ব্যথা লাগবে সেই কথা আগে-ভাগেই না ভেবে স্বামীর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিলেই সব সহজ হয়ে যাবে। প্রথম মিলনে সামান্য রক্তপাত হতে পারে, এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার এতে ভয়ের কিছু নেই।

◆ কুমারী নারীর যোনিপথ কিছুটা সংকীর্ণ হয় ফলে প্রথম প্রথম হালকা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ব্যাপারটা যাতে সহজেই সম্পন্ন হয়ে যায় তাই লুব্রিকেন্ট হিসেবে স্বাস্থ্যসম্মত পিচ্ছিল পদার্থ ব্যবহার করতে হবে। যেমন: ভেষজ তেল, পেট্রোলিয়াম জেলী বা ভ্যাজাইনাল লুব্রিকেন্ট ইত্যাদি।

৩. মিলনের ক্ষেত্রে নাজায়েয বিষয়সমূহ

আমাদের জীবনযাত্রাকে উন্নত করতে আমরা ইসলামের বিধি নিষেধগুলো মেনে চলব। আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সেই সাথে আমাদের দৈহিক ও মানসিক বিফলের অবসান ঘটাতে প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যৌনমিলনের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। আর সেসব মন্দ বিষয়াদির ক্ষেত্রে মারাত্মক কুপ্রাভাব লক্ষ্য করা যায়।

◆ *পায়ুপথে সংগম*

এর অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে, এর মাধ্যমে যৌনবাহিত রোগ ছড়ায়। যোনিপথে যেমন প্রাকৃতিকভাবে পিচ্ছিল পদার্থ উৎপন্ন হয় পায়ুপথের তেমনটা হয় না। এ ছাড়া পায়ুপথের চামড়ার আস্তরণটি যোনিপথের চেয়েও পাতলা। ফলে পায়ুপথে মিলনের সময় ত্বক ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু মলদ্বার দিয়েই শরীরের বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে আসে তাই খুব সহজেই সেসব ক্ষতস্থানে ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ব্যাপক। আবার এই একই কারণে যৌনবাহিত রোগ ক্ল্যামিডিয়া, গনোরিয়া, হেপাটাইটিস, এইচআইভি, হার্পস ইত্যাদির মতো জঘন্য রোগগুলো হতে পারে। এই রোগগুলোর অধিকাংশরই কোনো চিকিৎসা নেই।

◆ *ওরাল সেক্স*

অনেক আলিমের মতে এটা মাকরুহ। এর মাধ্যমে যৌনবাহিত রোগ ছড়াতে পারে তাই এটাকে অনুৎসাহিত করা হয়। এইডস, গনোরিয়া, হার্পস ইত্যাদি এসটিডির পাশাপাশি ওরাল সেক্সের মাধ্যমে গলায় ক্যান্সার হওয়ারও ঝুঁকি রয়েছে, এমনটিই জানিয়েছে আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইট এর চিফ মেডিকেল অফিসার ওটিস ব্রাওলে।[১]

◆ *হায়েয অবস্থায় যৌনমিলন*

হায়েযের সময়টা নারীদের জন্য কষ্টদায়ক। পুরুষদের উচিত স্ত্রীর হায়েযের সময়ে সবর করা। এই সময়টাতে নারীদের মেজাজ খিটখিটে থাকে তাই স্বাভাবিক কথাতেও

[১] https://www.webmd.com/sex-relationships/features/4-things-you-didnt-know-about-oral-sex#1

রেগে যেতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে হায়েযের সময় যৌনমিলন তার দৈহিক কিংবা মানসিক কোনো অবস্থার জন্যই উত্তম নয়। এদিকে হায়েযের মাধ্যমে নারীদের শরীর থেকে অশুচি রক্ত বের হয়ে আসে। আর সেই রক্তের মাধ্যমে যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণও ঘটতে পারে।

৪. যৌনমিলনের উপকারিতা

- হরমোনাল সেক্রুয়েশনের কারণে মানসিক ক্লান্তি দূর হয়, রক্ত চলাচল ভালো থাকে, হৃৎপিণ্ড ভালো থাকে।
- খিটখিটে মেজাজ কমে; শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক চাপ, হতাশা এবং উদ্বেগ দূর হয়।
- ক্যালরি বার্ন করে ওজন কমাতেও সাহায্য করে।
- নিম্ন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
- হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে।
- নিজের প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা বাড়ে।
- নিয়মিত সহবাসের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বীর্যপাতের সময়কাল বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।
- তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণ ব্যথা উপশম হয়।
- ভাল ঘুম হয়।
- স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, ফলে সাংসারিক জীবনে সুখ আসে।

৫. বেশ কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

জীবনের প্রথম হায়েয হওয়ার পর থেকেই একজন নারী মা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও দশের কোটায় থাকতেই নারীরা মা হয়েছে, সেই সাথে তারা অনেক সন্তানের অধিকারীও হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্যের রীতি অনুসরণ করতে গিয়ে নারীরা কম বয়সে সন্তান নেওয়ার কথা ভাবতে সামান্য ইতস্ততবোধ করে। তাই নিজের ক্যারিয়ার বিল্ডাপ করতে করতে ত্রিশের চৌকাঠে পা রেখে শেষে সন্তান গ্রহণের ফিকির করে। অনেক নারী বিয়ের জন্য পাত্রই খুঁজতে শুরু করে ত্রিশের পর। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের একটি স্বর্ণমুহূর্ত রয়েছে। সেই মুহূর্তটা অতিবাহিত হয়ে গেলে মাঝে মাঝেই সম্মুখীন হতে হয় ব্যর্থতার। একজন নারীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মা হওয়ার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, অপরপক্ষে গর্ভপাতের আশঙ্কা বাড়তে থাকে। ৩০+ বছর বয়সী নারীদের গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা প্রায় ২০% বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া অপরিপক্ক সন্তান জন্ম নেওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই ঝুঁকিমুক্ত থেকে যত জলদি সম্ভব সন্তান গ্রহণের পরিকল্পনা রাখা উচিত। পূর্বের আলোচনায় আমরা বেশ কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির শরঈ বিধান সম্পর্কে জেনেছি। তন্মধ্যে কিছু পদ্ধতি জায়েয, কিছু পদ্ধতি নাজায়েয। নাজায়েয পদ্ধতিগুলো পরিত্যাজ্য হওয়ার অন্যতম বিশেষ একটি কারণ এই যে, সেসব পদ্ধতি স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি (Contraceptive Pill) এর প্রচলন বর্তমান সময়ে ব্যাপক। কিন্তু এর বেশ কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। এই ওষুধগুলোতে এমন কিছু হরমনজনিত উপাদান রয়েছে, যেমন: এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন; যা শরীরের কার্যক্ষমতা পরিবর্তন করে গর্ভধারণ থেকে বিরত রাখে। মূলত ডিম্বাশয় ও জরায়ুকে এসব ওষুধ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এসব ওষুধ ডিম্বাণু নিঃসরণকে বাধাপ্রাপ্ত করে সেই সাথে সারভিক্স-এর মাংসপেশিকে মোটা করে তোলে যাতে শুক্রাণু জরায়ুতে প্রবেশ করে কোনো ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ নিয়মকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে অস্বাভাবিক করে তোলা হচ্ছে যা নিসঃন্দেহে অনুচিত।

বর্তমান বিশ্বে আরও একটি জনপ্রিয় জন্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি হচ্ছে আই.ইউ.ডি (IUD- Intrauterine Device)। এই প্রক্রিয়ায় জরায়ুতে ইংরেজি অক্ষর T আকৃতির একটি যন্ত্র প্রবেশ করানো হয়। এই পদ্ধতিতে ৩-১০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এরকম আরও বেশ কিছু জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো সত্যিকার অর্থেই বর্জনীয়। এসব পদ্ধতির বেশ কিছু সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো—

- অনিয়মিত মাসিক;
- মাসিকের সময় তুলনামূলক অধিক রক্তপ্রবাহ এবং মাসিকের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি;
- বমি বমি ভাব হওয়া, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরানো এবং স্তন প্রদাহ;
- হঠাৎ মেজাজ পরিবর্তন;
- IUD পদ্ধতি অবলম্বনে মাত্রাতিরিক্ত ব্রন হওয়ার আশঙ্কা থাকে;
- IUD পদ্ধতি অবলম্বনে তলপেট ও কোমড়ে ব্যথা হয়ে থাকে।

ইমপ্ল্যান্টেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো :

- কার্ডিওভাস্কুলার ঝুঁকি বাড়ায়। ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে।
- পেটে মেদ জমতে পারে।

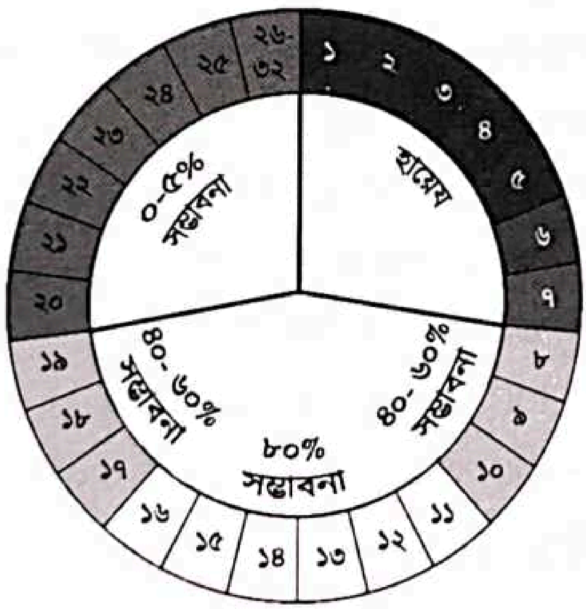
◆ হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে মাসিক চক্র পরিবর্তন হয়ে অনিয়মিত মাসিক ও খুব বেশি রক্তপাত হতে পারে।

◆ ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় (যেহেতু এইসব হরমোন বারবার exposure হয়)।

◆ মাইগ্রেন তথা প্রচুর মাথাব্যথার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৬. জন্মনিয়ন্ত্রণের কিছু স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি

জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ও স্বাস্থ্যকর একটি পদ্ধতি হচ্ছে কনডম ব্যবহার। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, তবে যাদের লেটেক্স এলার্জি রয়েছে তাদের জন্য এটা চুলকানি বা জ্বলনের কারণ হতে পারে। এ ছাড়াও coitus interruptus বা আযল করাও একটি কার্যকরী উপায়। যৌনমিলন শেষে যোনির বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলা হয়। একে উইথ ড্র মেথডও বলা হয়। এর বৈধতা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যা আমরা পূর্বেও জেনেছি। কিন্তু এই পদ্ধতিতে উত্তেজনাবশত সঠিক সময়ে যোনির বাইরে বীর্যপাত করা বহু পুরুষের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে আরও একটি পদ্ধতি হতে পারে ক্যালেন্ডার পদ্ধতি (Calender Method)। তবে এটি কিছুটা জটিল। এই পদ্ধতিতে স্ত্রীর মাসিক চক্রের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। এই পদ্ধতি ১০০% কার্যকরী এমনটা বলা সম্ভব না। বিশেষ করে যাদের অনিয়মিত মাসিক তাদের জন্য এই পদ্ধতি অকার্যকর হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। যাদের মাসিক চক্র নিয়মিত হয় (২৮±২ পরপর) তাদের ক্ষেত্রে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের ৩ দিন গর্ভধারণের সম্ভাবনা ৪০-৬০%, এরপরের ৬ দিন গর্ভধারণের সম্ভাবনা ৮০% এবং এর পরের ৩ দিন গর্ভধারণের সম্ভাবনা আবার ৪০-৬০% এ ফিরে আসে। এরপর থেকে মাসিক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ৭-১৩ দিন যোনিপথের ভেতরে বীর্যপাত করলেও গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকে ৫% এরও কম। গর্ভধারণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ উভয় ক্ষেত্রেই মাসিক চক্রের এই হিসাব জেনে রাখা জরুরি।



৭. ভ্রূণহত্যা

অনিচ্ছাসত্ত্বে গর্ভে সন্তান এসে পড়লেও এ থেকে রেহাই (!) পাওয়ার পদ্ধতি রয়েছে যাকে বলা হয় Abortion। সোজা কথায় গর্ভের অপরিপক্ব কিংবা পরিপক্ব সন্তানকে

নিজ সম্মতিক্রমে হত্যা করাকেই অ্যাবরশন বলা হয়। অবশ্য অনেক সময় প্রয়োজনের খাতিরে বাধ্য হয়ে অ্যাবরশন করাতে হয় বিভিন্ন জটিলতার কারণে, সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যখন কেবল অনিচ্ছা, রিযিক নিয়ে ভয়ের মতো ঠুনকো কারণে ভ্রূণহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। এ ছাড়া গর্ভধারণের সময়কালের ওপর নির্ভর করে এর ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

গর্ভধারণের পর তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে গর্ভপাত ঘটানো কিছুটা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। অধিকাংশ সময় ভেতর থেকে 'কিউরেট' করে ভ্রূণ বের করে আনতে হয়। 'কিউরেটেজ' (curettage) মানে হলো নারিকেলের মতো করে কোরানো। কত মানুষের সন্তান হয় না, আর কিছু মানুষকে আল্লাহ সন্তান দান করেন আর তারা নারিকেলের মতো করে কুরিয়ে সন্তান ফেলে দেয়। অনেক সময় বাচ্চা বেশি বড় হয়ে গেলে বিভিন্ন অঙ্গ কেটে কেটে ভেতর থেকে নিয়ে আসতে হয়। খুলিতে ছিদ্র করে মস্তিষ্ক তরল করে গলিয়ে ফেলা হয়, বাকি হাত-পা আলাদা টুকরো করে বের করে আনতে হয়। এই বীভৎস দৃশ্য কোনো মা-বাবা কীভাবে সহ্য করতে পারে! অথচ এ রকম হাজার হাজার ভ্রূণহত্যা হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ভ্রূণহত্যার অগণিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও শারীরিক কুপ্রভাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

◆ জ্বর, ডাইরিয়া;

◆ ইনফেকশন;

◆ ৩ সপ্তাহেরও অধিক সময় ধরে, অধিক পরিমাণে রক্তপাত;

◆ ঠোঁট বা চেহারা ফুলে যাওয়া;

◆ পেট, পিঠ, কোমরব্যথা;

◆ বমি বমি ভাব, ক্লান্তি;

◆ জরায়ু, মূত্রাশয়, অন্ত্রে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিসাধন;

◆ অসম্পূর্ণ অ্যাবরশন যা সার্জারি পর্যন্ত গড়াতে পারে;

◆ পরবর্তী সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা;

◆ পরিপাকতন্ত্রে অস্বস্তি;

◆ অপটু হাতে ডি. এন্ড সি. (ভ্রূণ অপসারণ) এর সময় কিউরেট করতে গিয়ে জরায়ু ফুটো হয়ে যাওয়ার নজির রয়েছে। সে ক্ষেত্রে পেট কেটে অর্থাৎ, অ্যাবডমিনাল অপারেশন করে জরায়ু সারাতে হয়;

◆ ডি. এন্ড সি. এর সময় ও এর পূর্বে কিছু ওষুধ দেয়া হয় যা পরবর্তীকালে সমস্যার কারণ হতে পারে;

◆ অনেক সময় ভ্রূণের কিছু অংশ ভেতরে থেকে যায়, যার কারণে ইনফেকশন হতে পারে। এ থেকে মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে যা পুরো শরীরে ছড়িয়ে যায়। এ কারণে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, এমনকি রোগী মারাও যায় অনেক সময়।



||১৪তম দারস||

বিচ্ছেদ

১. সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধ হয় এবং যুগলের মাঝে দাম্পত্য জীবনের শুরু হয়। দায়িত্ব, সম্মান, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালোবাসা ও অধিকারসহ সংশ্লিষ্ট সবকিছুর সমন্বয় করে নারী-পুরুষ একই ছাদের নিচে দিনাতিপাত করে। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যজ্ঞান দাম্পত্য সম্পর্কে স্বর্গীয় সুখ এনে দেয়।

ইসলামে যদিও বিবাহ বন্ধন আজীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করারও সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে ইসলাম কখনোই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে উৎসাহিত করে না। বরং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মিল-মহব্বত সৃষ্টি করা ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য নানা পন্থা ও উপায় বলে দিয়েছে। কারণ, বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার ফলে শুধু যে স্বামী-স্ত্রীই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনটি নয়, বরং তাদের সঙ্গে দুটি পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় সন্তানের জীবনও ধ্বংসের পথে চলে যায়। তাই অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে একে অপরকে বোঝানো ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ইসলামে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَٱلَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾

আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং মৃদু প্রহার করো। যদি এতে তারা বাধ্যগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য আর অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না।[১]

---

[১] সূরা নিসা- ৩৪

আয়াতটিতে স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখা দিলে তিনটি কাজ করতে বলা হয়েছে। প্রথমে সুন্দরভাবে উপদেশ দেবে। তাতে কাজ না হলে স্ত্রীর সাথে শয্যা ত্যাগ করবে। তাতেও কাজ না হলে হালকা প্রহার করবে।

এতেও যদি সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ সবকিছু অবহিত। [২]

অর্থাৎ উভয় পক্ষের পরিবার থেকে বিচক্ষণ ও সহানুভূশীল কয়েকজন লোক সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা স্বামী-স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করবে ও তাদের সংশোধনের চেষ্টা করবে। তবুও ইসলাম একদম অপারগ অবস্থায় তালাকের অনুমতি দিয়েছে, যেন ঝগড়া-বিবাদের তিক্ততায় নারী-পুরুষের জীবন দুর্বিষহ না হয়ে যায়। কিন্তু তালাককে নিরুৎসাহিত করে হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবীজি ﷺ বলেছেন,

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

আল্লাহ ﷻ যা কিছু হালাল করেছেন সেসবের মাঝে তাঁর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ হলো তালাক। [৩]

কেননা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্কচ্ছেদ ও তালাকের কারণে শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে থাকে। হাদীস থেকেও আমরা এটি জানতে পারি যে, ইবলীসের কাছে তার সেই অনুসারী সবচেয়ে নিকটবর্তী ও পছন্দনীয়, যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।[৪]

২. তালাক

তালাকের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, **কোনো বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেওয়া।**[৫]

শরী'আতের পরিভাষায় সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত অস্পষ্ট কোনো শব্দ বা বাক্য মুখে উচ্চারণ করে কিংবা লিখিতভাবে বৈবাহিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বা সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার নাম হচ্ছে তালাক। উল্লেখ্য যে, তালাক দেওয়ার অধিকার কেবল

[২] সূরা নিসা- ৩৫

[৩] সুনানে আবু দাউদ- ২১৭৪, ২১৭৮; মুস্তাদরাকে হাকেম- ২/৫৫৮, হাদীস- ২৮৪৮

[৪] সহীহ মুসলিম- ২৮১৩

[৫] আস সিহাহ- ৪/১৫১৮; আল মিসবাহুল মুনীর- ২/৫৭৩; লিসানুল আরাব- ১০/২২৫; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ১/৯৬

স্বামীরই রয়েছে; তবে স্বামী কাউকে তালাকের দায়িত্ব ন্যস্ত করলে তা-ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যেমন :

- **তালাকুল ওয়াকালা**- প্রতিনিধির মাধ্যমে তালাক দেওয়া।
- **তালাকুত তাফউইয** - স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষ থেকে যেকোনো মুহূর্তে শর্তসাপেক্ষে কিংবা বিনা শর্তে তালাক নেওয়ার অধিকার অর্পণ করা। আবার কখনো কখনো বিশেষ অবস্থায়, প্রয়োজনে ও কারণে তার অনুমতি ব্যতীতই শরঈ কাযী (বিচারক) বিবাহ বিচ্ছেদ করাতে পারে।[৬]

তালাকের শব্দগুলো ২ ভাগে বিভক্ত :

(১) صريح বা তালাকের সুস্পষ্ট শব্দ।

(২) كناية বা তালাক দেওয়া ও হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট শব্দসমূহ।

তালাক দেওয়া বা হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট শব্দ ও বাক্যসমূহ :

'তুমি তালাক' বা 'আমি তোমায় তালাক দিয়ে দিলাম', 'আমার ওপর তুমি হারাম', 'যা তোকে ছেড়ে দিলাম', 'আমার জন্য ওয়াজিব হলো তোমায় তালাক দেওয়া' ইত্যাদি বলার দ্বারা তালাকে বায়িন হয়ে যাবে। 'তোমার শরীর/দেহ/তোমার রূহ/তোমার চেহারা/তোমার লজ্জাস্থান তালাক বা আমার ওপর হারাম', কেউ ১/২/৩ আঙুল উঠিয়ে বলল, 'তুমি এভাবে তালাক'; তাতেও তালাক পতিত হবে। তবে সে ক্ষেত্রে ১ আঙুল ওঠানোর দ্বারা এক তালাক, ২ আঙুল ওঠানোর দ্বারা দুই তালাক এবং ৩ আঙুল ওঠানোর দ্বারা তিন তালাকই পতিত হবে।[৭] অনুরূপভাবে 'যাও তোমাকে রাখব না', 'তালাক, তালাক, তালাক', 'বায়িন তালাক' বা 'তিন তালাক'; এমন শব্দগুলো বলার দ্বারা তিন তালাকে বায়িন হয়ে যাবে।

তালাক দেওয়া বা হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট শব্দ ও বাক্যসমূহ :

যদি কেউ রাগের মাথায় অথবা তালাকের আলোচনা চলাকালীন নিচের শব্দগুলো উল্লেখ করে এবং স্ত্রীকে তালাকের নিয়তে এসব উচ্চারণ করে থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন :

---

[৬] বাদায়েউস সানায়ে- ৪/৩৩২; রদ্দুল মুহতার- ৪/৪২৪; আল খিরাশী আলা মুখতাসারি খলীল- ৩/১১; আল কাফী- ২/৫৭১; আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়া- ২৯/৫; মুগনীল মুহতায- ৩/২৭৯; কাশশাফুল ক্বিনা- ৫/২৩২; আল মুগনী- ৭/৩৬৩

[৭] সহীহ বুখারী- ১৯০৮, ৫৩০২; সহীহ মুসলিম- ১০৮০, ১০৮৬; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৮০-১৮১; বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৭১-২৮১; আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়া- ৫/৩১১; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৪৪৭; ফাতোয়াযে তাতারখানিয়া- ৪/৪৬৩, নং- ৬৬৭৮; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫৩০

- যা, আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যা।
- আজ থেকে আমার বাড়ি খালি করে দিবি।
- যা, তুই এখান থেকে চলে যা।
- আজ থেকে তুই আমার থেকে পর্দা করবি।
- যা, আজ থেকে তুই একা আর আমিও একা। আজ থেকে তুই আজাদ/মুক্ত।
- আজ থেকে তোর দায়িত্ব তোর, আমারটা আমার। আজ থেকে আমার সমস্ত দায়িত্ব থেকে তোকে মুক্ত করে দিলাম।
- যা, আজ থেকে তুই তোর তালাকের মাসিক (ঋতুস্রাব) গনা শুরু কর।
- যা, আজ থেকে বাপের বাড়ি থাকবি।
- যা, অন্য কোনো স্বামী দেখ; ইত্যাদি।

এর মধ্যে এমন কিছু শব্দ আছে যার দ্বারা এক তালাকে রজঈ হয়, আবার কখনো বায়িন তালাকও হয়। এসব ক্ষেত্রে এমন কোনো শব্দ মুখে চলে এলে এর সঠিক মাসআলা বিজ্ঞ মুফতী অথবা স্থানীয় দারুল ইফতা থেকে জেনে নিতে হবে।[৮]

৩. তালাকের অবস্থা ও পন্থা

তালাকের কয়েকটি প্রেক্ষাপট ও অবস্থা রয়েছে। তদানুসারে কখনো কখনো তালাক দেওয়া জুলুম, কখনো মুস্তাহাব, কখনো-বা ওয়াজিব।

✧ তালাকে জুলুম

যখন স্ত্রী কোনো অন্যায় না করবে বরং সে সতীসাধ্বী থাকবে এবং স্বামীর অনুগত হয়ে চলবে, এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জুলুম ও অন্যায় হবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তোমরা তাদের ওপর কোনো অন্যায় রাস্তা অবলম্বন কোরো না।[৯]

✧ মুস্তাহাব তালাক

স্ত্রী যদি ফরয নামায আদায় না করে অথবা দ্বীনের যেকোনো ফরয বিধান আমলে না নেয় ও তাতে অভ্যস্ত না হয়; তাহলে তাকে তালাক দেওয়া মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে স্ত্রী

---

[৮] বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৮১, ২৯৭; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৮৫; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫৩২

[৯] সূরা নিসা- ৩৪

যদি স্বামীর জন্য যেকোনো বিষয়ে প্রতিনিয়ত কষ্ট প্রদানের কারণ হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও এই বিধান।[১০]

✧ ওয়াজিব তালাক

স্বামী যখন স্ত্রীর হক পূরণ করার ক্ষেত্রে অপারগ ও অক্ষম হয় তখন স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ওয়াজিব।[১১]

তালাকের তিনটি সুরত ও পন্থা রয়েছে :

১. আহসান তথা সর্বোত্তম পন্থা : স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হলে তার ওই পবিত্রতার সময়ের মধ্যে কোনোপ্রকার সহবাস ব্যতীতই এক তালাক প্রদান করা। এরপর থেকে পরবর্তী তিন হায়েয (ঋতুস্রাব) তথা স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং এর মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না। এই ধরনের তালাকের হুকুম হলো, ইদ্দত ও সময় শেষ হলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং নতুন বিবাহ ছাড়া তারা দুজনে আর একসাথে হতে পারবে না।

২. হাসান তথা উত্তম পন্থা : স্ত্রীকে তার তিন পবিত্রতার পিরিয়ডে (মাসে) কোনো সহবাস ছাড়াই এক এক করে পর্যায়ক্রমে মোট তিনটি তালাক দেওয়া। তৃতীয় তালাকের পর পবিত্রতা শেষ হলে সম্পূর্ণ তালাক হয়ে যাবে এবং অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে হয়ে পুনরায় বিচ্ছেদ না ঘটলে তারা দুজনে আর একত্রিত হতে পারবে না (এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসবে)।

৩. বিদআত ও হারাম তালাক : একসাথে একই মাসে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা এক মজলিসেই এক বাক্যে দুই কিংবা তিন তালাক প্রদান করা, স্ত্রীর হায়েয ও ঋতুস্রাবের সময় তাকে তালাক প্রদান করা; এসব পন্থায় ও অবস্থায় তালাক দেওয়ার কারণে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। সেই সাথে এতে তালাকও পতিত হয়ে যাবে। আর একসাথে তিন তালাক দেয়ার কারণে তার দ্বারা তালাকে মুগাল্লাযা হয়ে যায় বিধায় হিলা/হিল্লা ছাড়া ওই স্ত্রী তার জন্য হারাম। ইদ্দতকালীন স্বামী চাইলেও স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।[১২]

---

[১০] ফতোয়ায়ে শামী- ৪/৪১৬

[১১] ফতোয়ায়ে শামী- ৪/৪১৭

[১২] সূরা তালাক- ১; সহীহ বুখারী- ৫২৫১; সহীহ মুসলিম- ১৪৭১; মুসান্নাফে ইবনে আব্দির রাযযাক- ১০৯৬৯; সুনানুল কুবরা, বাইহাকী- ১৪৯৫৫; সুনানে দারে কুতনী- ৩৯২১-৩৯২৪; আল ইখতিয়ার লি তা'লিলিল মুখতার- ৩/১৭০-১৭১; মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃষ্ঠা- ২৯২; নাইলুল আওত্বার, শাওকানী- ৩/২৬৩-২৬৯

৪. তালাকের প্রকারভেদ

তালাকের চারটি প্রকারভেদ রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. তালাকে রজঈ : 'রজঈ' (رجعي) এর শাব্দিক অর্থ হলো : ফিরিয়ে নেওয়া, প্রত্যাবর্তন করা। কিছু কিছু সময় তালাকের শব্দ বলার পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। যে তালাকের পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায়, তাকে তালাকে রজঈ বলে। অর্থাৎ, যে তালাক প্রদান করলে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার থেকে যায় এবং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনরায় নিজের বন্ধনে ফিরিয়ে আনতে পারে। সে ক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীর সাথে ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় নিরিবিলি অবস্থান করা কিংবা নিরিবিলি অবস্থানের দিকে আকর্ষণকারী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া অথবা যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা বা চুমু দেয়া কিংবা 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম' বলার মাধ্যমেও রজা'য়াত বা ফিরিয়ে আনা সাব্যস্ত হয়। এতে স্ত্রী সম্মত থাকুক কিংবা না থাকুক।[১৩]

উল্লেখ্য যে, 'স্বারীহ' বা সুস্পষ্ট তালাক (তালাক শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে) এভাবে বলা যে, "তুমি তালাক" কিংবা "আমি তোমাকে তালাক দিলাম।" এসকল শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তালাকে রজঈ পতিত হয়।

২. তালাকে বায়িন : এমন তালাক যা প্রদান করলে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার থাকে না, বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে (হিলা ব্যতীত) নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, তালাকের সাথে যদি কোনোপ্রকার অতিরিক্ততা বা কঠোরতার গুণ যুক্ত করা হয়, তাহলে তালাকে বায়িন হয়। যেমন : কেউ বলল, 'তোমার প্রতি তালাকে বায়িন' কিংবা 'তোমাকে অকাট্য তালাক'। তবে তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই পতিত হবে। অন্যথায় এক তালাকে বায়িন হবে। তালাকে বায়িন পতিত হলে পুনরায় মোহর ধার্য করে বিবাহ সম্পাদন না করলে ইদ্দত শেষে উক্ত স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।[১৪]

৩. তালাকে মুগাল্লাযা : এমন তালাক যার কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ওই স্ত্রী অপর কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে, অতঃপর ওই স্বামী তার সাথে নিরিবিলি অবস্থান করার পর বা সহবাস করার পর তালাক দিলে অথবা স্বামী মৃত্যুবরণ করলে পুনরায় উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর সাথে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

---

[১৩] সূরা বাকারা- ২২৮, ২৩১; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/২০৩

[১৪] ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ৩/৩১৫; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৩৭৫, ১/৪৭২; বাহরুর রায়েক- ৩/৩০; রদ্দুল মুহতার- ২/৩৫৫; নাহরুল ফায়েক- ২/৩৫৫

৪. তালাকে তাফউইয/তাফবীয : التفويض এর শাব্দিক অর্থ হলো- অর্পণ করা, সমর্পণ করা, দায়িত্ব প্রদান করা ইত্যাদি। আর তালাকে তাফউইযের অর্থ হলো, স্বামী কর্তৃক তালাকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পণ করা।

✧ খুলা তালাক :

'খুলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অপসারণ করা বা সরিয়ে দেওয়া।

পারিভাষিক অর্থে, স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো কিছুর বিনিময়ে বা শর্তে অথবা বিনা শর্তে ও বিনিময় ব্যতীত স্ত্রীর নিকট বিবাহ-বিচ্ছেদের দায়িত্ব অর্পণ করার নাম হচ্ছে খুলা।

উল্লেখ্য যে, যদি স্ত্রীর সীমালঙ্ঘন বা অন্যায়ের কারণে (খুলা) তালাক দিতে হয়, সে ক্ষেত্রে স্বামী তার থেকে তালাকের বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে। উভয়ের সম্মতিক্রমে যে পরিমাণ বিনিময়ের ওপর একমত হবে, তা-ই নেওয়া বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রেও বিনিময়টি বিয়েতে ধার্যকৃত মহরের বেশি না হওয়া উত্তম।[১৫]

সাবিত ইবনু কায়সের স্ত্রী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, চরিত্রগত বা দ্বীনি বিষয়ে সাবিত ইবনু কায়সের ওপর আমি দোষারোপ করছি না। তবে আমি ইসলামের ভেতরে থেকে কুফরী করা অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল পছন্দ করছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যা। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাবিত ইবনু কায়সকে) বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ করো এবং তোমার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দাও।[১৬]

তবে বিশেষ কোনো শরঈ কারণ ছাড়াই স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর খুলা তালাক চাওয়া উচিত নয়। হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলেন,

اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

খোলা তালাক দাবিকারিণী নারীরা মুনাফিক।[১৭]

---

[১৫] বাদায়েউস সানায়ে- ৪/৩৭২; ফাতহুল ক্বাদীর- ৩/২০৩; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৫১৫; আলবাহরুর রায়েক -৪/৮৩; আহকামুল কুরআন- ২/৮৯; রদ্দুল মুহতার- ৩/৪৪৫; আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু- ৯/৩৩৮; আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়া- ২৯/৬; দুররুল মুখতার- ২/৮৬০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ২/৭২; মিনাহুল জালীল- ২/১৮২; মুগনীল মুহতায- ২/২৬২; হাশিয়াতুত দাসুক্বী- ২/৩৪৭

[১৬] সহীহ বুখারী- ৫২৭৩

[১৭] সুনানে তিরমিযী- ১১৮৬; এ হাদীসটিকে উল্লেখিত সনদসূত্রে ইমাম তিরমিযী গরীব বলেছেন। এর সনদ খুব একটা মজবুত নয়। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে আরও বর্ণিত আছে, "যেসকল নারী স্বামীর নিকট হতে কোনো বিবেচনাযোগ্য কারণ ছাড়াই খোলা তালাক গ্রহণ করে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"

৫. ইদ্দত

ইদ্দত মানে গণনা। অর্থাৎ, তালাকের নির্ধারিত দিন গণনা করা। স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে বা তার স্বামীর মৃত্যু হলে নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য উক্ত নারীকে এক বাড়িতে অবস্থান করতে হয়, এ সময়ে সে অন্যত্র যেতে পারে না এবং অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারে না; এমনকি বিবাহের প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারে না। একেই 'ইদ্দত' বলে। আর ইদ্দত পালনকারী নারীকে বলা হয় 'মু'তাদ্দাহ'। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় (১/৫৫২) বর্ণিত রয়েছে,

هِيَ انْتِظَارُ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ حَقِيقَةً أَوْ شُبْهَةَ الْمُتَأَكِّدِ بِالدُّخُولِ أَوْ الْمَوْتِ كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْبُرْجُنْدِيِّ. رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا جَائِزًا فَطَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ كَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

ইদ্দত হলো, স্বাভাবিক বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বা খালওয়াতে সহীহার (তথা স্বামী-স্ত্রী সহবাসের নিকটবর্তী আচরণ বা নির্জনে বসবাসের) পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলা কর্তৃক শরী'আত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করা (অন্য কোথাও বিয়ে না বসা)। স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো ইদ্দতের সময় তিনি অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এই কারণে যে, স্বামী যদি ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে পুনরায় নিজের কাছে রাখার বা ফিরিয়ে আনার ইচ্ছাপোষণ করে, তাহলে সে রাখতে ও ফিরিয়ে আনতে পারবে। তবে ইদ্দতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে এই অধিকারটি বিলুপ্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, এই বিষয়টি শুধু এক তালাক ও দুই তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিন তালাক দিয়ে ফেললে এই অধিকার আর থাকে না। এ ছাড়া, ফক্বিহদের মতে রাজঈ ও বায়িন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পালন করা অবস্থায় স্বামীর পক্ষ থেকে ভরণপোষণ ও খোরপোশ পাবে। এর বিপরীতে সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসাঈ ও মুসনাদে আহমাদে ফাতিমা বিনতে কায়স ﵂ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় অধিকাংশ সাহাবী (তাদের মাঝে অন্যতম হচ্ছেন উমার, ইবনে মাসউদ, যাইদ ইবনে সাবেত, আয়েশা ﵂) তাবেঈ ও ফক্বিহগণ তা গ্রহণ করেননি। বরং উক্ত হাদীসের বিপরীতে তারা ভিন্ন হাদীস ও সূরা তালাকের প্রথম আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। তবে যে মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে বিধায় ইদ্দত পালন করছে এমন ইদ্দত অবস্থায় মহিলার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর পরিবারের জন্য জরুরি নয়।[১৮]

[১৮] সহীহ মুসলিম- ১৪৮০; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/২৬০; ফাতহুল ক্বাদীর- ৩/৩৩৯; হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন- ৩/৬৪০; মিরকাতুল মাফাতীহ- ৬/৪৪৭-৪৪৯; শারহুস সগীর- ১/৫২২; হাশিয়াতুদ দাসূকী- ২/৫১৫; তুহফাতুল মুহতাজ- ৮/২৫৯-২৬০; নিহায়াতুল মুহতাজ- ৭/১৫২-১৫৪; আল ইনসাফ (আল মুকনি ও শারহুল কবীরসহ)- ২৪/৩১২-৩১২

আবু ইসহাক ﵀ বলেন,

كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ. فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)

আমি আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদের সঙ্গে সেখানকার বড় মসজিদে বসা ছিলাম। শা'বীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ফাতিমাহ বিনতু কায়স হতে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোশের সিদ্ধান্ত দেননি। তখন আসওয়াদ তার হাতে এক মুঠো কংকর নিয়ে শা'বীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। এরপর বললেন, সর্বনাশ! তুমি এমন ধরনের হাদীস বর্ণনা করছ? (অথচ) উমার ﵁ বলেছেন, আমরা আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত এমন একজন মহিলার উক্তির কারণে ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা জানি না, সে স্মরণ রাখতে পেরেছে নাকি অথবা ভুলে গিয়েছে যে তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোশ রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন, "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিও না এবং তারাও যেন ঘর থেকে বের না হয়। তবে তারা স্পষ্ট কোনো অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা।"[১৯]

হাদীসে উল্লেখিত পূর্ণ আয়াতটি হলো :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾

হে নবী (বলো), তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের তালাক দাও এবং ইদ্দত হিসাব করে রাখবে, তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোনো স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর জুলুম করে। তুমি জানো না, হয়তো সেটার পর আল্লাহ (ফিরে আসার) কোনো সমাধান দেখিয়ে দেবেন।[২০]

---

[১৯] সহীহ মুসলিম- ১৪৮০

[২০] সূরা তালাক- ১

আয়াতটিতে ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কী রকম ব্যবহার করতে হবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আদেশ করা হয়েছে যে, স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে যাতে বহিষ্কার করা না হয়। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তবে মহিলা কোনো ফাহেশা ও অশ্লীল (যিনা ও ব্যভিচারের) কাজে লিপ্ত হয়ে বের হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

৬. ইদ্দতের সময়কাল

✧ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ঋতুস্রাব (মাসিক) থেকে পবিত্র হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা হলে তার জন্য ইদ্দতের সময়কাল হলো, সে যে পবিত্রতায় আছে তা থেকে পূর্ণ তিন মাসিক (ঋতুস্রাব) শেষ হওয়া পর্যন্ত। অতএব তার তিন ঋতু শেষ হলে সে যথেচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এই ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্যত্র বিবাহ করা হারাম। কুরআনে এসেছে,

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ নিজেরা তিন কুরু (অর্থাৎ তিন মাসিক ও ঋতুস্রাব) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২১]

✧ নাবালেগা অথবা কোনো অসুস্থতার কারণে ঋতুস্রাব হয় না, এমন নারী তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত হলো তিন মাস। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।

✧ স্ত্রীর বয়স যদি এত বেশি হয় যে তার মাসিক (ঋতুস্রাব) বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাহলে তারও ইদ্দত তিন মাস। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।

✧ স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় আর এমতাবস্থায় যদি সে তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহলে তার ইদ্দত হলো গর্ভের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত।[২২]

উল্লেখ্য যে, গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামীর জন্য অপরিহার্য হলো, বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহন করা যাতে বাচ্চার কোনো ক্ষতি না হয়। আর বাচ্চা প্রসব করার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় এবং তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আর স্বামীর ওপর থাকে না বিধায় ওই বাচ্চাকে দুধ পান করানো স্ত্রীর জন্য আবশ্যক নয়। অতএব সেই পুরুষ তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে দুধ পান করাতে বললে সেই দুধ পান করানোর পূর্ণ সময়ের ভরণ-পোষণ ও তার থাকা-খাওয়া সহ সকল ব্যবস্থা উক্ত পুরুষের করে দিতে হবে।[২৩]

---

[২১] সূরা বাক্বারাহ- ২২৮

[২২] সূরা তালাক- ৪

[২৩] সূরা তালাক- ৬

✧ স্বামী যদি তার স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে তার ইদ্দত হলো ৪ মাস ১০ দিন। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।[২৪]

✧ কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অর্থাৎ বহুদিন হলো স্বামীর কোনো খোঁজখবর নেই, বেঁচে আছে না মারা গিয়েছে তাও জানা যায় না; এমন নারী তার স্বামীর জন্য ৪ বছর অপেক্ষা করবে, এর মধ্যে যদি স্বামী মারা গেছে এমন কোনো সংবাদ না পাওয়া যায় তাহলে ৪ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর চাইলে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর স্ত্রী কত দিন অপেক্ষা করবে এই ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ﷺ-এর মতে ৯০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২৫] তবে এই মাসআলায় হানাফী মাযহাবের উলামায়ে মুতাআখখিরীন ইমাম মালেক ﷺ-এর মাযহাবের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর সংবাদটি মুসলিম কাযীর নিকট গিয়ে স্ত্রী পেশ করবে। এবং তার সাধ্যানুযায়ী নিখোঁজ স্বামীকে তালাশ করার পর যদি খোঁজ না পায়, তাহলে কাযী স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেবে। যদি এর মধ্যে ফিরে এসে যায়, তাহলে ভালো। আর যদি ফিরে না আসে, তাহলে কাযী তার স্বামীর মৃত্যুর হুকুম দেবে।

কেননা, উমার ফারুক ﷺ বলেন, নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২৬] এছাড়া উসমান, আলী ﷺ এবং অনেক তাবেয়ী থেকেও অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে।[২৭] অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত পালন করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে।

স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করার পর যদি হঠাৎ প্রথম স্বামী ফিরে আসে, তাহলে উক্ত নারীর জন্য দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থাকা জায়েয হবে না। কেননা প্রথম স্বামী ফিরে আসার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হবার কারণে ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত পালন করার পর উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর স্ত্রী হবে।[২৮]

৭. মু'তাদ্দাহ নারীর করণীয় ও বর্জনীয়

স্বামীর মৃত্যু, তিন তালাক বা তালাকে বায়েন এবং তালাকে রজঈর ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা অবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়াবলি লক্ষণীয় :

---

[২৪] সূরা বাকারা- ২৩৪

[২৫] আল লুবাব ফি শারহিল কিতাব

[২৬] বাইহাক্বী, হাদীস- ১৫৩৪৫; আল মুহাল্লা- ৯/৩১৬

[২৭] মুহাল্লা- ৯/৩২৪

[২৮] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস- ১২৩২৫; বাইহাক্বী, হাদীস- ১৫৩৪৭, ১৫৩৪৮; আহসানুল ফতোয়া- ৫/৪৬৭; ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া- ১৬/৩৪২; রাদ্দুল মুহতার- ৪/২৯৫-৯৬; হীলাতুন নাজিযাহ, আশরাফ আলী থানবী; শারহুল মিনহাজ আলা মুখতাসারিল খালিল- ২/৩৭৫; শারহুস সাগীর- ২ /৬৯৪; হাশিয়ায়ে দাসূকী- ২/৪৭৯; মানারুস সাবীল- ২/৮৮

আয়াতটিতে ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কী রকম ব্যবহার করতে হবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আদেশ করা হয়েছে যে, স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে যাতে বহিষ্কার করা না হয়। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তবে মহিলা কোনো ফাহেশা ও অশ্লীল (যিনা ও ব্যভিচারের) কাজে লিপ্ত হয়ে বের হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

৬. ইদ্দতের সময়কাল

✧ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ঋতুস্রাব (মাসিক) থেকে পবিত্র হওয়ার পর তালাকপ্রাপ্তা হলে তার জন্য ইদ্দতের সময়কাল হলো, সে যে পবিত্রতায় আছে তা থেকে পূর্ণ তিন মাসিক (ঋতুস্রাব) শেষ হওয়া পর্যন্ত। অতএব তার তিন ঋতু শেষ হলে সে যথেচ্ছা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এই ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্যত্র বিবাহ করা হারাম। কুরআনে এসেছে,

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ নিজেরা তিন কুরু (অর্থাৎ তিন মাসিক ও ঋতুস্রাব) পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২১]

✧ নাবালেগা অথবা কোনো অসুস্থতার কারণে ঋতুস্রাব হয় না, এমন নারী তালাকপ্রাপ্তা হলে তার ইদ্দত হলো তিন মাস। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।

✧ স্ত্রীর বয়স যদি এত বেশি হয় যে তার মাসিক (ঋতুস্রাব) বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাহলে তারও ইদ্দত তিন মাস। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।

✧ স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় আর এমতাবস্থায় যদি সে তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহলে তার ইদ্দত হলো গর্ভের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত।[২২]

উল্লেখ্য যে, গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্বামীর জন্য অপরিহার্য হলো, বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহন করা যাতে বাচ্চার কোনো ক্ষতি না হয়। আর বাচ্চা প্রসব করার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় এবং তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আর স্বামীর ওপর থাকে না বিধায় ওই বাচ্চাকে দুধ পান করানো স্ত্রীর জন্য আবশ্যক নয়। অতএব সেই পুরুষ তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে দুধ পান করাতে বললে সেই দুধ পান করানোর পূর্ণ সময়ের ভরণ-পোষণ ও তার থাকা-খাওয়া সহ সকল ব্যবস্থা উক্ত পুরুষের করে দিতে হবে।[২৩]

---

[২১] সূরা বাক্বারাহ- ২২৮

[২২] সূরা তালাক- ৪

[২৩] সূরা তালাক- ৬

✧ স্বামী যদি তার স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে তার ইদ্দত হলো ৪ মাস ১০ দিন। এ সময়ের মধ্যে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে না।[২৪]

✧ কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অর্থাৎ বহুদিন হলো স্বামীর কোনো খোঁজখবর নেই, বেঁচে আছে না মারা গিয়েছে তাও জানা যায় না; এমন নারী তার স্বামীর জন্য ৪ বছর অপেক্ষা করবে, এর মধ্যে যদি স্বামী মারা গেছে এমন কোনো সংবাদ না পাওয়া যায় তাহলে ৪ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর চাইলে সে অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর স্ত্রী কত দিন অপেক্ষা করবে এই ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ﷺ-এর মতে ৯০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২৫] তবে এই মাসআলায় হানাফী মাযহাবের উলামায়ে মুতাআখখিরীন ইমাম মালেক ﷺ-এর মাযহাবের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পর সংবাদটি মুসলিম কাযীর নিকট গিয়ে স্ত্রী পেশ করবে। এবং তার সাধ্যানুযায়ী নিখোঁজ স্বামীকে তালাশ করার পর যদি খোঁজ না পায়, তাহলে কাযী স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেবে। যদি এর মধ্যে ফিরে এসে যায়, তাহলে ভালো। আর যদি ফিরে না আসে, তাহলে কাযী তার স্বামীর মৃত্যুর হুকুম দেবে।

কেননা, উমার ফারুক ﷺ বলেন, নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[২৬] এছাড়া উসমান, আলী ﷺ এবং অনেক তাবেয়ী থেকেও অনুরূপ ফতওয়া রয়েছে।[২৭] অতঃপর স্ত্রী ইদ্দত পালন করে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে।

স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করার পর যদি হঠাৎ প্রথম স্বামী ফিরে আসে, তাহলে উক্ত নারীর জন্য দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থাকা জায়েয হবে না। কেননা প্রথম স্বামী ফিরে আসার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হবার কারণে ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত পালন করার পর উক্ত মহিলা প্রথম স্বামীর স্ত্রী হবে।[২৮]

৭. মু'তাদ্দাহ নারীর করণীয় ও বর্জনীয়

স্বামীর মৃত্যু, তিন তালাক বা তালাকে বায়েন এবং তালাকে রজঈর ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা অবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয়াবলি লক্ষণীয় :

---

[২৪] সূরা বাকারা- ২৩৪

[২৫] আল লুবাব ফি শারহিল কিতাব

[২৬] বাইহাক্বী, হাদীস- ১৫৩৪৫; আল মুহাল্লা- ৯/৩১৬

[২৭] মুহাল্লা- ৯/৩২৪

[২৮] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস- ১২৩২৫; বাইহাক্বী, হাদীস- ১৫৩৪৭, ১৫৩৪৮; আহসানুল ফতোয়া- ৫/৪৬৭; ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া- ১৬/৩৪২; রাদ্দুল মুহতার- ৪/২৯৫-৯৬; হীলাতুন নাজিযাহ, আশরাফ আলী থানবী; শারহুল মিনহাজ আলা মুখতাসারিল খালিল- ২/৩৭৫; শারহুস সাগীর- ২ /৬৯৪; হাশিয়ায়ে দাসূকী- ২/৪৭৯; মানারুস সাবীল- ২/৮৮

◆ ইদ্দত পালনকারী নারী সকল প্রকার সৌন্দর্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে।

◆ আতর, পারফিউম তথা সুগন্ধি জাতীয় কোনো কিছু ব্যবহার করবে না। তবে তেল, সাবান, রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহারে অসুবিধা নেই; যদিও তাতে সুগন্ধি থাকে। কারণ, এগুলো মূলত সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

◆ সুরমা, কাজল ইত্যাদি ব্যবহার না করা।

◆ মেহেদী, খেজাব বা আলাদা রং ব্যবহার করা যাবে না।

◆ সৌন্দর্য বর্ধনকারী পোশাক পরিধান করবে না।

◆ কোনো ধরনের অলংকার যেমন : দুল, চুড়ি, নাকফুল, আংটি, নূপুর ইত্যাদি ব্যবহার না করা।

◆ নারী যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে তাহলে উপর্যুক্ত নিষেধাজ্ঞাসমূহ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

◆ রজঈ, বায়েন ও তিন তালাক প্রাপ্তা নারী এ অবস্থায় দিন ও রাতে কোথাও বের হতে পারবে না। তবে যার স্বামী মারা গিয়েছে সে দিনে ও রাতের প্রাথমিক কিছু অংশে ভরণপোষণের তাগিদে বের হতে পারবে।[২৯]

৮. বিধবা নারীর ইদ্দতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কিছু বিষয়

বিধবার ইদ্দতের সময় কী কী বিষয়ের ওপর শরী'আতের দিকনির্দেশনা রয়েছে তা নিয়ে বহু ভুল বোঝাবুঝি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সমাজে এসব মনগড়া নিষেধাজ্ঞাকে শরী'আহর বিধানের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এমনই কিছু বিধান জেনে নেয়া যাক যেগুলো সমাজে অবহেলিত-

◆ বিধবা তার স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো, নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখা।[৩০]

স্বাধীন নারীর স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দত হচ্ছে ৪ মাস ১০ দিন। এ ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যু চাঁদের প্রথম তারিখে হলে সেদিন থেকে চাঁদের মাসের হিসেবে (মাস ৩০ দিনে হোক কিংবা ২৯ দিনে) চার মাস দশ দিন ধরা হবে।

---

[২৯] সূরা বাকারা- ২৩৪-২৩৫; বাদায়েউস সানায়ে- ৪/৫২৩ থেকে ৫২৬; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৫৫৮ থেকে ৫৫৯; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/২৪১ থেকে ২৪৫; আদ দুররুল মুখতার- ১০/৩৬১ থেকে ৩৬৮; হিদায়া-২/৪২৩, ৩/৪২৭

[৩০] সূরা বাকারা- ২৩৪

পক্ষান্তরে যদি মৃত্যু মাসের মাঝখানে হয়, সে ক্ষেত্রে সেই নারী প্রথম মাসের বাকি দিনগুলো ইদ্দত পালন করবে এবং চন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী আরও তিন মাস (দিনের সংখ্যা ৩০ হোক কিংবা কম হোক) দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। আর প্রথম মাসের যে দিনগুলো ছুটে গেছে সে দিনগুলো হিসাব করার দুটো পদ্ধতি রয়েছে—

- ওই মাসকে হিসাবে ৩০ দিন ধরা, বাস্তবিকপক্ষে মাস ৩০ দিনবিশিষ্ট হোক কিংবা ২৯ দিনবিশিষ্ট। সুতরাং বিধবা নারী যদি ২০ দিন ইদ্দত পালন করে থাকে, তাহলে পঞ্চম মাসে তিনি বাকি দশ দিন পূর্ণ করবে।
- প্রথম মাসের যে কয়দিন ছুটে গেছে পঞ্চম মাসে কেবল সে কয়দিন পূর্ণ করবে; সেই মাস ৩০ দিনবিশিষ্ট হোক কিংবা ২৯ দিনবিশিষ্ট।[৩১]

◆ বিধবা নারী স্বামীর মৃত্যুর শোক পালনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের বাড়িতে থাকবে। এমনকি এ সময় যদি সে তার পিতার বাড়িতে অবস্থান করে আর স্বামীর মৃত্যুর খবর পায় তাহলে নিজ বাড়িতে ফিরে আসবে। তবে একান্ত প্রয়োজনে (যেমন : বিপদের আশঙ্কা, প্রয়োজনবশত বাড়ি পরিবর্তন, চিকিৎসা বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা ইত্যাদি জরুরি কাজে) অন্যত্র যেতে পারবে। এছাড়া গরিব হলে এবং বাইরে গিয়ে কাজকর্ম ব্যতীত খাওয়া-পরার ব্যবস্থা না থাকলে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু রাতের বেলায় তাকে বাড়িতেই থাকতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন হলে দিনে ও রাতের প্রাথমিক অংশে বাইরে যেতে পারবে। বাড়িতে নিজেদের একাধিক ঘর বা একাধিক কামরা থাকলে যেকোনো ঘর বা কামরায় থাকতে পারবে। নির্দিষ্ট একটি স্থানেই আবদ্ধ থাকা জরুরি নয়। বাড়ির বারান্দা বা উঠানেও বের হতে পারবে।[৩২]

◆ স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেতে দেরি হলে সংবাদ পাওয়ার পূর্বে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে সেটাও ইদ্দতের ভেতর অতিবাহিত হয়েছে বলে ধরা হবে; আর ইদ্দতের পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সংবাদ পেলে আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না। তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে বলেই ধরা হবে।

◆ ইদ্দতের সময় তার সাধারণ পোশাক পরা এবং সাজসজ্জা এড়ানো উচিত। সে মেকাপ-গহনা, আড়ম্বর, জাঁকজমকপূর্ণ ও জৌলুসপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সে অপরিচ্ছন্ন থাকবে। স্বামী মারা যাওয়ার আগে স্বাভাবিকভাবে

[৩১] হাশিয়ায়ে ইবনু আবেদীন- ১০/২৮; দারুস সাকাফাহ, আল মুগনী- ৮/৮৫; গুরারুল আযকার ফী শারহি দুরারিল বিহার, পৃষ্ঠা- ২২৩; ফাতহুল ক্বাদীর- ৪/১৪১; বাহরুর রায়েক- ৪/১৪৩; কাশ্‌শাফুল ক্বিনা- ৫/৪১৮; আল মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ২৯/৩১৫; আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ- ২/১৫৪

[৩২] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৫৫৯; বাহরুর রায়েক- ৪/২৫৮; আল ইনায়াহ শারহুল হিদায়া- ২/৬০০; আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়া- ৫/৫৮৩

যে পোশাক পরিধান করত তা-ই পরিধান করবে। তবে শুধু সাদা বা শুধু কালো পোশাক পরিধান করতে হবে এমন ধারণা সঠিক নয়।

◆ ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় সুস্পষ্ট শব্দে ও বাক্যে বিয়ের প্রস্তাব প্রদান বা সরাসরি বিয়ে থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে স্বামী মারা গিয়েছে এমন নারীর ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় বিবাহের প্রস্তাবনার ইঙ্গিতমূলক কাজ ও বাক্য ব্যবহার করা যাবে। যেমন : তাকে হাদিয়া পাঠানো, তার কাছে কোনো মাধ্যমে নিজের গুণ ও বৈশিষ্ট্য এভাবে ব্যক্ত করা যাতে বোঝা যায় যে, সেই নারী বিয়ে করতে ইচ্ছুক।

সকল আলেমের ইজমা মতে, তালাকে রজঈ প্রাপ্তা মু'তাদ্দাহ নারীর ক্ষেত্রে কোনো পুরুষকে ওপরে উল্লেখিত অনুরূপ বাক্য বলে বা কাজ করে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া জায়েয নেই। এমনকি হানাফী মাযহাবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ক্ষেত্রেও একই মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি কেবল ওই মু'তাদ্দাহ নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যার স্বামী মারা গিয়েছে।

◆ স্ত্রী ব্যতীত এ সকল বিধান মৃতের অন্য কোনো নিকটাত্মীয়ের জন্য প্রযোজ্য নয়।[৩৩]

আবু সালামার মেয়ে যয়নব বলেন, শাম থেকে আবু সুফিয়ান ﷺ-এর মৃত্যু-সংবাদ আসার পর তৃতীয় দিন (তাঁর মেয়ে উম্মুল মুমিনীন) উম্মে হাবিবা ﷺ কিছু হলুদ বা জাফরান (অন্য বর্ণনায় সুগন্ধি) আনতে বললেন। অতঃপর তা আনা হলে তিনি তা তার চেহারার দুপাশে, দুগালে এবং দুবাহুতে মাখলেন। অতঃপর বলেন, এটা করার আমার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু আমি এজন্যই এমনটি করলাম কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا
تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

যে নারী আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, তার জন্য স্বামী ছাড়া কারও মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়। আর স্বামীর মৃত্যুতে সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।[৩৪]

৯. যে নারীর ইদ্দত নেই

ছোট বা বড় সকল স্ত্রীর ওপরই তালাকের পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব, তবে চার শ্রেণির নারী ব্যতীত-

[৩৩] তাবঈনুল হাকায়েক, যাইলাঈ- ৩/৩৫; আল বিনায়া, আইনী- ৫/৬২২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনু রুশদ- ৩/১৪২; আয যাখীরাহ, করাফী- ৪/২৬০; রওযাতুত ত্বলেবীন, নববী- ৮/৪০৮; হাশিয়ায়ে কলইউবী ওয়া উমাইরাহ- ৪/৫৪; শারহ মুনতাহাল ইরাদাত, বুহুতী- ৩/২০৩; মাতালিবু উলিন নুহা, রহিবানী- ৫/৫৭৯

[৩৪] সহীহ বুখারী- ১২৮১, ১২৮২, ৫৩৩৪, ৫৩৩৪; সহীহ মুসলিম- ১৪৮৬, ১৪৮৭

(১) সহবাস বা খালওয়াতের (তথা স্বামী-স্ত্রী নির্জনে বসবাস করার) পূর্বে তালাক দিলে;

(২) এমন হারবিয়্যাহ নারী যে দারুল ইসলামে নিরাপত্তা নিয়ে এসেছে এবং তার স্বামীকে দারুল হারবে রেখে এসেছে। দারুল ইসলামে এসে যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে তার জন্য ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়।

(৩) দুই বোনকে এক মজলিসে বিয়ে করার পর উভয়ের মধ্যে বিয়ে ভেঙে ফেললে।

(৪) চারের অধিক বিয়ে করার পর পঞ্চমজনের বিয়ে ভেঙে দিলে।[৩৫]

৮. ইসলামে হিলা/হিল্লার হুকুম

হিলা (حيلة) আরবী একটি শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ হলো- কৌশল অবলম্বন করা, কোনো উপায় গ্রহণ করা, জটিল কোনো স্থানে ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করা।

পরিভাষায় হিলা বলা হয়, যখন শরী'আতের কোনো বিষয়ে মানবজীবনে জটিলতা দেখা দেয় তখন শরী'আতসম্মত এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা, যার দ্বারা শরী'আতের বিধান ঠিক থাকার সাথে সাথে মানুষ ওই জটিলতা থেকে বের হয়ে আসতে পারে। আরবী ভাষায় একে 'হিলা' বা 'হিল্লা' বলে।

তালাকের ক্ষেত্রে হিলা/হিল্লা বলা হয়, যখন কোনো স্বামী ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় অথবা রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, অতঃপর পরবর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় সে তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিজ অধীনে রাখতে চায়, অথচ ইসলামী আইনের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে না বিধায় তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার নিকট ফিরিয়ে নেওয়ার যে উপায় রয়েছে, তাকে হিলা/হিল্লা বলা হয়। স্বামী স্ত্রীকে পূর্ণ তালাকের পর কেবল তখনই ফিরিয়ে নিতে পারবে যখন নিম্নের পাঁচটি কাজ সম্পাদিত হবে :

(১) তিন মাস ইদ্দত অতিবাহিত করতে হবে;

(২) অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহ হতে হবে;

(৩) দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু নামেমাত্র বিবাহ হলে চলবে না; বরং তার সাথে যথারীতি সংসার ও সহবাস করতে হবে;

(৪) দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক প্রদান করবে এবং এ তালাকের জন্য পুনরায় তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে;

(৫) পুনরায় প্রথম স্বামীর সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

---

[৩৫] সূরা আহযাব- ৪৯; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৫৫২; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/২৩৭; আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবাআ- ৪/১০০

এমনটি হলে তা শরী'আত সমর্থন করে। যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

যদি সে (প্রথম স্বামী) তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য এ স্ত্রী আর জায়েয নয় যতক্ষণ না সে নারী অন্য কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ করে (এরপর বিচ্ছেদ হয়)। [৩৬]

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শরী'আতের এই বিধানে অনেকেই ফাঁকফোকর খোঁজে। দেখা যায়, তিন তালাকের পরই স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নানাভাবে হিলা নামের বাহানার আশ্রয় নেওয়া শুরু করে। সেটা যেমন অশালীন, তেমনি শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ ও লা'নতযোগ্য কাজ।

হিলা বলতে মানুষের মাঝে একটা কুসংস্কার রয়েছে। আর তা হলো, হিলা/হিল্লা বলা হয় কোনো পুরুষ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে এ শর্তে চুক্তি করা যে, বিয়ের পর সহবাস শেষে সেই নারীকে তালাক দিয়ে দেবে যাতে সে পূর্বের স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায় এবং সে তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। আবার কখনো কখনো কোনো পাগলের সাথেও বিয়ে করিয়ে বিনা সহবাসে তালাক দেওয়ার জন্যেও বাধ্য করা হয়ে থাকে। এ বিবাহ বাতিল ও অশুদ্ধ। এভাবে নারী তিন তালাক প্রদানকারী স্বামীর জন্য হালাল হয় না। বরং এমন গর্হিত কাজ করার কারণে হিলার সাথে যুক্ত সকলের ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ

(হিলা-বাহানার মাধ্যমে অন্যজনের জন্য স্ত্রী) হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহকারী, যার জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যে হালাল হচ্ছে প্রত্যেকের ওপরই আল্লাহর লা'নত [৩৭]

৮. তালাক বিষয়ক বিশটি মাসায়িল

মাসআলা-১

যদি খুলা তালাকে তিন তালাকের কথা উল্লেখ না থাকে, তাহলে খুলা তালাকের মাধ্যমে এক তালাকে বায়িন হবে। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ খুলাকে (স্বাভাবিক অবস্থায়) এক তালাকে বাইন সাব্যস্ত করেছেন।[৩৮]

আর এ অবস্থায় যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে চায়, তাহলে নতুন করে বিয়ে করে নিতে হবে। নতুন মোহর ধার্য করে, দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ের

[৩৬] সূরা বাক্বারাহ- ২৩০

[৩৭] সুনানে আবু দাউদ- ২০৭৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ১৭৩৬৪

[৩৮] সুনানে দারা কুতনী- ৪০২৫; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা- ১৮৪৪৮; সুনানুল কুবরা, বাইহাক্বী- ১৪৮৬৫

প্রস্তাব ও কবুল করার মাধ্যমে নতুন করে বিয়ে করে নিলে তারা আবার একসাথে থাকতে পারবে।[৩৯]

মাসআলা-২

তালাকের শর্তসমূহ হচ্ছে,

(১) স্বামী কেবল নিজ স্ত্রীকেই তালাক দিতে পারবে। সুতরাং অন্যের স্ত্রীকে তালাক দিলে কিংবা বিয়ে হওয়ার পূর্বেই কোনো নারীকে অথবা হবু স্ত্রীকে তালাক দিলে তা তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে না;

(২) বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে। সুতরাং কোনো শিশু ও কিশোরের তালাক গ্রহণযোগ্য হবে না;

(৩) জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে;

(৪) অস্পষ্ট ও ইশার-ইঙ্গিতমূলক তালাকের ক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং নিয়ত থাকতে হবে;

(৫) জাগ্রত থাকা, অর্থাৎ গভীর নিদ্রায় ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় মুখে তালাক উচ্চারণ করলে তা পতিত হবে না। [৪০]

মাসআলা-৩

তালাকের শব্দ স্পষ্টও হতে পারে আবার অস্পষ্টও হতে পারে, যেকোনো শব্দেও হতে পারে, আবার উরুফে (সামাজে) প্রচলিত কথার মাধ্যমেও হতে পারে, ইচ্ছায়ও হতে পারে আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও হতে পারে (অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতমূলক শব্দে তালাকের নিয়ত না থাকলে তালাক পতিত হবে না)। এমনকি হাসি-ঠাট্টার ছলে বা রাগের মাথায় তালাক দিলেও তালাক পতিত হয়ে যায়।[৪১]

মাসআলা-৪

অধিকাংশ হানাফী উলামায়ে কেরামদের নিকট স্বেচ্ছায় মদ ও নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত ও মাতাল অবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হবে। এর সমর্থনে চার মাযহাবের ইমাম ও

---

[৩৯] ফতোয়ায়ে কাযীখান- ১/৪৭২; ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ৩/৩৮০; বজলুল মাযহুদ- ৩/২৮৮; আওযাজুল মাসালিক- ১০/১০৯

[৪০] মুসনাদে আহমাদ- ৬/১০০-১০১, ২৭৬; মুসতাদরাকে হাকেম- ২/৫৯, ১৯৮; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- ৪/২৪; হাশিয়ায়ে ইবতে আবিদীন- ৩/২৩০, ২৩৫, ২৪৩; বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৬৭, ৩৩৩; মুগনীল মুহতায- ৩/২৭৯; আস-শরহুল কাবীর- ২/৩৬৫; আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়া- ২৯/১৪-২০

[৪১] সুনানে আবী দাউদ- ১১৯১, ২১৯৪; সুনানুত তিরমিযী- ১১৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২০৩৯; নসবুর রয়াহ, যাঈলায়ী- ৩/২৯২; মুসান্নাফে আব্দুর রযযাক ৬/৪০৯, হাদীস- ১১৪১৫; আদ দিরায়াহ ফী তাখরিজিল হিদায়াহ- ২/৬৯; ফাতহুল বারী- ৯/৩৯৩; হাশিয়া ইবনে আবিদীন- ৩/২৪৭; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ২/১৭৪-১৭৫; আল মুগনী- ৭/৩১৮-৩২৯; মুগনীল মুহতায- ৩/২৮০; হাশিয়াতুত দাসুকী- ২/৩৭৮-৩৮০

ফক্বিহদের থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়। এ ছাড়াও অনেক সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এমন বর্ণনা রয়েছে।

তবে উসমান ﷺ, হানাফী মাযহাবের ইমাম কারাখী ﷺ, ইমাম ত্বহাবী ﷺ এবং কিছুসংখ্যক শাফেঈ ফক্বিহদের মতে, ইমাম আহমাদের একটি মতানুসারে এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ﷺ সহ কতিপয় ফক্বিহদের নিকট এ অবস্থায় তালাক দিলে তা পতিত হবে না। অনুরূপভাবে বাক্‌শক্তিহীন কোনো মূক ও বোবা ব্যক্তি ইশারায় তালাক দিলেও তা পতিত হবে।[৪২]

মাসআলা-৫

মেসেজ বা কোনো কিছুতে লিখে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। [৪৩]

মাসআলা-৬

কেউ বলল, তুমি তালাক **ইন শা আল্লাহ**। এতে তালাক পতিত হবে না।[৪৪] কারণ আল্লাহ ﷻ কখনোই চান না যে কোনো দম্পতির মাঝে তালাক হয়ে যাক।

মাসআলা-৭

সুস্পষ্ট তালাক পতিত হওয়ার জন্য স্বামীর নিয়তের প্রয়োজন নেই। নিয়ত থাকা বা না থাকা; যে কোনো অবস্থায় 'তালাক' শব্দ বলে ফেললে বা লিখে দিলেই তালাক হয়ে যায়। এমনকি নিজস্ব ভাষায় তালাকের সমার্থক বা প্রচলিত শব্দ বলে ফেললেও তালাক পতিত হবে।[৪৫] রাগের মাথায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়। অবশ্য কারও যদি প্রচণ্ড রাগের ফলে বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম হয় আর এ অবস্থায় সে কী বলেছে তার কিছুই মনে না থাকে অর্থাৎ তার আকল, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক একদমই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে বদ্ধ পাগলের মতো হয়ে যায় (তবে এমনটি বিরল ঘটনা), তাহলে ওই অবস্থার তালাক কার্যকর হবে না।[৪৬]

---

[৪২] আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৭৪-১৭৫; বাদায়েউস সানায়ে- ৪/২৬৭; মুখতাসারুত ত্বহাবী, পৃষ্ঠা- ১৯১, ২৮০; আল হিদায়া- ২/৫৩৬; আল মাবসূত্ব- ৬/১৭৬; শারহু ফাতহিল ক্বাদীর- ৩/৪৮৯; আল বিনায়া- ৫, ২৭, ২৮; মুদাওয়ানাতুল কুবিরা- ৬/২৪; আল মুনতাক্বা, বাজী- ৪/১২৬; শারহুস সগীর (হাশিয়াতুস সাউই সহ)- ৩/৩৪৯; কিতাবুল উম্ম, শাফেঈ- ৫, ২৫৩, ২৭৬; রওযাতুত ত্বলেবীন- ৮/২৩; মুখতাসারুল মুযানী, পৃষ্ঠা- ১৯৪, ২০২; আল হাউই আল কাবীর- ১৩/১০৩, ১০৫; আল ওয়াসিত্ব ফিল মাযহাব- ৫/৩৯০; আল মুগনী- ৮/২৫৫; আল ইনসাফ- ৮/৪৩৪; ই'লামুল মুয়াক্কিঈন- ৪/৩৯

[৪৩] হিদায়া- ২/৩৯৯-৪০০; রদ্দুল মুহতার- ৩/২৪৬; ফতোয়ায়ে দারুল উলূম যাকারিয়া- ৪/৫৬

[৪৪] হিদায়া- ২/৩৮৯; তানভীরুল আবসার, তুমুরতাশী- ৩/৩৬৬; ইমদাদুল আহকাম- ২/৪১৬; ফতোয়ায়ে মাহমূদিয়া- ১৩/১১৩; ফতোয়ায়ে দারুল উলূম যাকারিয়া- ৪/৫৭

[৪৫] আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৭৬; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৪৪৭; ফাতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ৪/৪৬৩, নং-৬৬৭৮; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫৩০

[৪৬] রদ্দুল মুহতার- ৩/২৪৪

মাসআলা-৮

হায়েয অবস্থায় এক তালাক বা তালাকে রাজঈ দিলে তা প্রত্যাহার করে পবিত্র অবস্থায় আবার তালাক দেওয়া উচিত। কেননা, হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয নেই; তবে তা পতিত হয়ে যাবে।[৪৭]

মাসআলা-৯

হাস্যরস বা ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দিলেও তা পতিত হয়। অনেকের ধারণা- এটি তো দুষ্টুমিমাত্র, এতে কি আর তালাক হবে? অথচ এতেও তালাক হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

তিনটি বিষয় ঠাট্টার ছলে করলেও পতিত হয়ে যায়। বিবাহ, তালাক ও 'তালাকে রজঈ' ফেরত নেওয়া। [৪৮]

মাসআলা-১০

কেউ আগে এক তালাক বলেছে এখন অবশিষ্ট আরও দুইটি তালাকের নিয়ত করে বলল, তোমাকে 'দুই তালাক'; তাহলে আগের এক তালাক ও বর্তমানের দুই তালাক মিলে তিন তালাকই পতিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে ব্যক্তির নিয়ত পাক্কা থাকে যে, 'দুই তালাক' বলে দুইটি তালাক নয় বরং 'দ্বিতীয় তালাক' উদ্দেশ্য নিয়েছে, তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী দ্বিতীয় তালাকই গণ্য হবে।[৪৯]

মাসআলা-১১

স্বামী যদি স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'যা চলে যা/বের হয়ে যা' অথবা এমন অস্পষ্ট ও ইঙ্গিতমূলক শব্দ প্রয়োগ করে, সে ক্ষেত্রে স্বামী এই বাক্যে তালাকের নিয়ত না করলে তালাক হবে না; আর যদি তালাকের নিয়ত করে এ বাক্যসমূহ উচ্চারণ করে, তাহলে এতে এক তালাক পতিত হয়ে যাবে।[৫০]

---

[৪৭] সহীহ বুখারী- ৫২৫১, সহীহ মুসলিম- ১৪৭১, আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৭৩; রদ্দুল মুহতার- ৩/২৩২ থেকে ২৩৪

[৪৮] সুনানে আবু দাউদ- ২১৯৪; সুনানে তিরমিযী- ১১৮৪; সুনানে ইবনে মাজাহ- ২০৩৯; রদ্দুল মুহতার- ৪/৪৩২

[৪৯] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ- ৯/৫৪৪, হাদীস- ১৮২০১; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫২১; ফতোয়ায়ে কাযীখান ১/৪০৪; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৩৯০

[৫০] বাদায়েউস সানায়ে- ৩/১১১; রদ্দুল মুহতার- ৪/৫২৯-৫৩৮, ৫৫১; বাহরুর রায়েক- ৩/৫২৬; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/৪৪২; ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া- ১/৪৬৮; ফাতাওয়া কাসিমিয়া- ১৭/৭০৮

মাসআলা-১২

কেউ তার স্ত্রীকে বলল, 'তুই বায়িন তালাক', 'তোকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তালাকটি দিলাম', 'তোকে সবচেয়ে বড় তালাক দিলাম', 'তোকে শয়তানের তালাক দিলাম', 'তোকে বিদআত তালাক দিলাম', 'তোকে বড় পাহাড় সমতুল্য তালাক দিলাম', 'তোকে কঠিন তালাক দিলাম' ইত্যাদি—এতে করে স্বাভাবিক অবস্থায় এক তালাকে বায়িন হয়ে যাবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়তে এ কথাগুলো বলে, তাহলে তিন তালাকই পতিত হবে।[৫১]

মাসআলা-১৩

তালাককে শর্তযুক্ত করার পর তা থেকে রুজু করা (ফিরে আসা) যায় না। যেমন : তুমি যদি তোমার বাবার বাড়িতে ভবিষ্যতে যাও, তাহলে তুমি তিন তালাক! এ ক্ষেত্রে বাঁচার উপায় হলো, উক্ত স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দেবে। তালাকপ্রাপ্তা হবার পর তিন হায়েয পরিমাণ ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে তাকে আবার নতুন মোহর ধার্য করে, দুইজন সাক্ষীর সামনে পুনরায় বিয়ে করে নেবে। এরপর বাবার বাড়িতে গেলেও আর কোনো তালাক পতিত হবে না। তবে স্বামী পরবর্তী সময়ের জন্য আর দুই তালাকের অধিকারী থাকবে।[৫২]

মাসআলা-১৪

একসাথে একই মজলিসে তিন তালাক দেওয়া যদিও গুনাহের কাজ, তবে কোনো পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এমন করে ফেললে তিন তালাকই পতিত হবে। এরপর শরী'আতসম্মত হিলা ব্যতীত পূর্বের স্বামীর নিকট ফেরত যাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে ৪ মাযহাবের সকল ইমাম ও সাহাবায়ে কেরামদের ইজমা রয়েছে। যদি এর বিপরীত কতিপয় আলেমদের বিচ্ছিন্ন মত পাওয়া যায়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।[৫৩]

ইবনে তাইমিয়া ﷺ (যিনি এক তালাক হওয়ার প্রবক্তা) বলেন, একসাথে তিন তালাক দিলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে এবং তিন তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালেক, ইমাম

---

[৫১] ফাতহুল ক্বাদীর- ৮/১১৮; তানভীরুল আবসার পৃ. ১২৩; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার- ৩/১৮২

[৫২] তাবঈনুল হাকায়েক- ৩/১১৮; রদ্দুল মুহতার- ৪/৬০৯; মাজমাউল আনহুর- ২/৬২

[৫৩] সূরা বাক্বারাহ- ২২৯; ফাতহুল বারী- ৯/৫৮১, হাদীস- ৫২৬১, ১৩/২৬৬; উমদাতুল কারী- ২০/২৪, হাদীস- ৪৬২৫; সহীহ মুসলিম- ১৪৭২; শারহু মুখতাসারিত ত্বহাবী, জাসসাস- ৫/৬১; আল মাবসূত্ব, সারাখসী- ৬/৭৩; কানযুদ দাকায়েক, নাসাফী, পৃষ্ঠা- ২৭৫; আল বিনায়াহ- ৫/৩৫৪; তাকমিলায়ে ফাতহিল মুলহিম- ১/১১২ থেকে ১১৪; ই'লাউস সুনান- ৭/৭০৬ থেকে ৭১২; আহসানুল ফাতাওয়ার- ৫/ ২২৫ থেকে ৩৭২; মাওয়াহিবুল জালীল- ৫/৩৩৫; আত তাজু ওয়াল ইকলীল, মাউওয়াক- ৪/৫৮; আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদীনাহ, ইবনু আব্দিল বার- ২/১০৪৬; হাশিয়াতুদ দাসূকী- ২/৩৬৪; রওযাতুত ত্বলেবীন- ৮/৭৯; শারহু মিনতাহাল ইরাদাত- ৩/৯৯; মাত্বালিবু উলিন নুহা- ৫/৩৭১; আল মুগনী- ৭/৪৩০; কাশশাফুল ক্বিনা- ৫/২৪০

আবু হানীফা ও ইমাম আহমাদের শেষ উক্তি এবং অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত।[৫৪]

মাসআলা-১৫

আমাদের সমাজে দুইটি গর্হিত কাজ প্রায়ই করতে দেখা যায়।

(১) কোনো তালাক ও খুলা ছাড়াই আরেকজনের শরী'আতসম্মত বৈধ স্ত্রীকে বিয়ে করা।

(২) তালাকপ্রাপ্তা কিংবা বিধবাকে ইদ্দত চলাকালীন অবস্থায় বিয়ে করা।

এই দুইটি গুনাহের কাজ আর এতে বিয়েও শুদ্ধ হয় না।[৫৫]

মাসআলা-১৬

কোনো ব্যক্তি যদি ভুলে, অনিচ্ছায় বা তালাকের মূল অর্থ না বুঝেই ইচ্ছাকৃতভাবে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় অথবা অনিচ্ছায় নিজ স্ত্রীকে সুস্পষ্ট শব্দে তালাক দেয়, তাতেও তালাক হয়ে যাবে।[৫৬]

মাসআলা-১৭

অনেকে মনে করে শুধু 'তালাক' বললে তালাক হয় না, বরং তালাকের সঙ্গে 'বায়িন' শব্দও যোগ করা আবশ্যক। এটি ভুল ধারণা। শুধু তালাক শব্দ দ্বারাই তালাক হয়ে যায়। 'বায়িন' শব্দ যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। উপরন্তু এ শব্দের সংযোজনও নাজায়েজ। তবে কেউ যদি এক তালাক বায়িন বা দুই তালাক বায়িন দিয়ে দেয়, তাহলে সে মৌখিকভাবে রুজু করার (আবার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার) পথ বন্ধ করে দিলো। এ ক্ষেত্রে শুধু একটি পথই খোলা থাকে। তা হলো নতুনভাবে শরী'আতসম্মত পন্থায় বিবাহ দোহরানো (অর্থাৎ বিবাহ নবায়ন করা)। অথচ শুধু তালাক বললে এক তালাক বা দুই তালাক পর্যন্ত মৌখিক রুজুর (ফিরিয়ে আনার) পথ খোলা থাকে।

মাসআলা-১৮

অনেকের ধারণা, স্বামী তালাকের সময় কোনো সাক্ষী না রাখলে তালাক পতিত হয় না। এটাও মনগড়া মাসআলা। সাক্ষীর প্রয়োজন হয় বিবাহের সময়। তালাকের জন্য কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

---

[৫৪] ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ- ১৭/৮

[৫৫] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ- ১/২৮০; বাদায়েউস সানায়ে- ২/৫৪৭; বাহরুর রায়েক- ৩/১০৮; রদ্দুল মুহতার- ৪/২৭৪, ৫/১৯৭; ফতোয়ায়ে কাযীখান- ১/৩৭৬; খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ২/১১৮

[৫৬] রদ্দুল মুহতার- ৩/২৪১ ও ২৪২

মাসআলা-১৯

অনেকের ধারণা, তালাকের শব্দ স্ত্রীর শুনতে হবে নচেৎ তালাক হবে না। এজন্য অনেকে বলে থাকে যে, 'স্বামী যখন তালাকের শব্দ উচ্চারণ করছিল তখন আমি কানে আঙুল দিয়ে রেখেছিলাম।' অথচ তালাকের শব্দ স্ত্রী না শুনলেও তালাক পতিত হবে। তাই কানে আঙুল দিয়ে লাভ নেই।

মাসআলা-২০

অনেকের ধারণা, তালাকনামায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্বাক্ষর করা ছাড়া তালাক হয় না। অথচ ইসলামের বিধান হলো, যেহেতু তালাক বিবাহের মতো দ্বিপক্ষীয় কাজ নয়, বরং তালাক এক পক্ষ থেকেই পতিত হয়ে যায় আর তালাকের অধিকারী হচ্ছে পুরুষ, তাই তালাকনামায় স্বামী স্বাক্ষর করলেই তালাক হয়ে যায়; স্ত্রীর স্বাক্ষর জরুরি নয়।



||১৫তম দারস||

নারীর সাজ

নারী জীবনের একটি অনস্বীকার্য অংশ হচ্ছে সৌন্দর্য। আল্লাহ ﷻ নারীদেরকে সুন্দর, কোমল ও মায়াবিনী করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এই রূপকে তাই নারীগণ নিয়ামত হিসেবেই নেন এবং নিজেকে আরও সুন্দর করে সাঁজিয়ে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রয়োজন শরী'আতের পাওবন্দী। নারীদের মহলে সাজগোজ অনুমোদিত এবং স্বামীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে সাজগোজের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কিন্তু এর নিষিদ্ধ দিকগুলোও আমাদের জেনে রাখা উচিত। নতুবা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান লঙ্ঘন হয়ে যেতে পারে নিজের অজান্তেই।

১. লিপিস্টিক ব্যবহারের বিধান

লিপিস্টিকে যদি হারাম বা নাজায়েয কোনো উপাদান ও পদার্থের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে নারীদের জন্য ঠোঁটে লিপিস্টিক ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।

উল্লেখ্য যে, কিছু লিপিস্টিক ওয়াটারপ্রুফ হওয়ায় ঠোঁটে একপ্রকার প্রলেপ বা আবরণ পড়ে। ফলে তা ওযু ও গোসলের সময় ওই অংশে পানি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। তাই এরূপ লিপিস্টিক না মুছে ওযু ও ফরয গোসল করলে তা আদায় হবে না। তবে যেসকল হালাল উপাদানে তৈরিকৃত লিপিস্টিক ওয়াটারপ্রুফ/পানি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না তাতে ওযু ও গোসল সিদ্ধ হবে।[১]

---

[১] রদ্দুল মুহতার- ১/২৮৮ থেকে ২৮৯; আল মুদাওয়ানাহ- ১/১২৪; হাওয়াশী তুহফাতুল মিনহাজ- ১/১৮৭; কাশশাফুল ক্বিনা- ১/৯৯; ফতোয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ (অনলাইন)- ৫৭৫৫০; কিতাবুল ফাতাওয়া, খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী- ৬/৫৮ ও ৫৯; ফতোয়ায়ে বিননূরটাউন (অনলাইন)- ১৪৪০০৪২০১১৬১

২. লিপিস্টিক তৈরিতে এনিমেল ফ্যাট/পশুর চর্বি বা এ্যালকোহল ব্যবহৃত হলে তার বিধান

❖ লিপস্টিক তৈরিতে যদি হালাল পশুর চর্বি ব্যবহৃত হয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু এতে হারাম পশুর চর্বি ব্যবহৃত হলে এবং সেই উপাদানের অস্তিত্ব লিপিস্টিকে বিদ্যমান থাকলে উক্ত লিপিস্টিক ব্যবহার করা জায়েয নেই।

তবে যদি বিভিন্ন হালাল-হারাম উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিশোধনের মাধ্যমে উক্ত বস্তুর মৌলিকত্ব নিঃশেষ করে দেওয়া হয় বা পরিবর্তন করা হয় তাহলে সেটিকে আর হারাম বলা যাবে না এবং তা ব্যবহারও করা যাবে। যেমন : মদকে যখন লবন বা অন্য কিছু দ্বারা সির্কা বানিয়ে ফেলা হয়, তখন সেটি **নিকট হালাল** হয়ে যায়। উক্ত বিধান অন্যান্য প্রসাধনীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৪ মাযহাবের সকল ফক্বীহ এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, ইস্তেহালার[২] মাধ্যমে হারাম ও নাপাক পদার্থও হালালে পরিণত হয়।[৩]

হজরত আবুদ দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত,

ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ

মাছ ও সূর্যের তাপ মদকে হালাল করে দেয়। [৪]

অর্থাৎ মদের মাঝে মাছ দিয়ে তা রৌদ্রে রেখে দিলে তাতে আর মদের মৌলিকত্ব বাকি থাকে না, তখন সেটি সির্কা হয়ে যায়। তাই এটি খাওয়া হালাল।

আবুদ দারদাসহ সাহাবীদের একটি জামা'আত এভাবে সির্কা বানাতেন। আর এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী ﷺ সুবিস্তর আলোচনা করেছেন।[৫]

---

[২] ফিক্বহী পরিভাষায়- যে প্রক্রিয়ায় বা বিক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো হারাম কিংবা নাপাক পদার্থের নিজস্ব গুণাগুণ ও মৌলিকত্বকে নিঃশেষ বা পরিবর্তন করে দেওয়া হয় তাকে ইস্তেহালা বলে। (আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, যুহাইলী ১/২৫০; আল মাওসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ ৩/২১৩)

[৩] আল মাবসূত্ব- ২৪/২২; ফাতহুল ক্বাদীর- ১/২০০; আল ইনায়াহ, বাবারতী- ১০/১০৬; তাবঈনুল হাক্বায়েক্ব, যাঈলাঈ- ৬/৪৮,২২০; ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া- ৫/৪১০; মাজমাউল আনহুর- ৪/২৫১; ফাতোয়ায়ে মাহমূদিয়া-২৭/২১৮; বুহুসুন ফী ক্বযায়া ফিক্বহিয়্যাহ মু'আসারাহ- ৩৪১; আশ শারহুল কাবীর (মা'আ হাশিয়াতুদ দাসূক্বী), দারদীর- ১/৫২; শরহু মুখতাসারিল খলীল, খিরাশী- ১/৮৮; আয যাখীরাহ, ক্বরাফী- ৪/১১৮ ও ১৮৮; আত তাজ ওয়াল ইকলীল, মুওয়াক্ব- ১/৯৭ আল মাজমূ, নববী- ২/৫৭৮; মুগনীল মুহতাজ,শারবীনী- ১/৮১; নিহায়াতুল মুহতাজ লির রামালি- ৮/১২; আল ইনসাফ, মারদাউই- ১/২৩০,৩১৮; আল মুগনী- ৯/১৭৩; মাওসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যাহ- ১০/২৭৮

[৪] সহীহ বুখারী-২/৯৬

[৫] ফাতহুল বারী- ৯/৬১৭-৬১৮

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ

জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, "উত্তম সির্কা সেটি, যেটি মদ থেকে প্রস্তুত করা হয়।"[৬]

◈ লিপিস্টিকে ব্যবহৃত এলকোহল যদি খেজুর ও আঙুর ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু দ্বারা তৈরিকৃত হয়ে থাকে তাহলে তা ব্যবহারে সমস্যা নেই। কেননা যে সমস্ত এলকোহল খেজুর বা আঙুর দ্বারা প্রস্তুত করা হয়নি, সে সমস্ত বস্তু নেশা আসার আগ পর্যন্ত ব্যবহার জায়েয। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ ﷺ-এর মত।[৭]

৩. চোখে কাজল, আইলাইনার, মাশকারা কিংবা সুরমা প্রয়োগের বিধান

নারীদের জন্য চোখে কাজল, আইলাইনার, মাশকারা কিংবা সুরমা প্রয়োগ করা জায়েয। অনেকে চোখে সুরমা দেওয়া মুস্তাহাব ও সুন্নাহ বলেছেন।

এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, যদি কোনো আইলাইনার, কাজল ও মাশকারা ওযু-গোসল করার সময় পানি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় তাহলে সেসব মুছে নিয়ে তারপর ওযু-গোসল করতে হবে।[৮]

ইমাম মুনজিরি ﷺ তাঁর 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব' কিতাবে পুরুষ ও নারীর চোখে সুরমা দেওয়া মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে আলাদা অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। চোখে সুরমা দেওয়াকে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ চেহারার সৌন্দর্যবর্ধক বলে অভিহিত করেছেন। এর পাশাপাশি চোখের জন্যও বেশ উপকারী বলে উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে ঘুমানোর পূর্বে। তাই বাজারে যেসব কাজল ও আইলাইনার পাওয়া যায় তা ব্যবহার না করে নারীরা সুরমা ব্যবহার করতে পারে।

তবে সর্বক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, চোখে সুরমা, কাজল বা আইলাইনার দেওয়ার পর গাইরে মাহরামদের সামনে যাতে তা প্রদর্শিত না হয়ে যায়।[৯]

৬] মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাকী- ১১৭২৩, এই বর্ণনাটি মুগীরাহ ইবনু যিয়াদ একক সূত্রে বর্ণনা করেন এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে অত শক্তিশালী নন।- নসবুর রয়াহ (বুগইয়াতুল আলমাঈর হাশিয়া ও শাইখ আওয়ামার তাহকীক সহ)- ৪/৩১১

৭] ফাতহুল ক্বদীর- ৮/১৬০; ফাতওয়ায়ে আলমগীরী- ৫/৪১২; আল বাহরুর রায়েক- ৮/২১৭ ও ২১৮; ফাতওয়ায়ে মাহমূদিয়া- ২৭/২১৯; তানভীরুল আবসার মা'আত দুররিল মুখতার- ২/২৫৯; ফতোয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ (অনলাইন)- ৪৯৭৩৯; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম- ১/৩৪৮, ৩/৩৩৭; ফিকহুল বুয়ূ- ১/২৯৮

৮] সহীহ মুসলিম- ১২১৮; তাবঈনুল হাকায়েক (হাশিয়ায়ে শিলবী সহ)- ১/৩৩১; ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনুল হুমাম- ২/৩৪৭; মাওয়াহিবুল জালীল, হাত্ত্বাব- ৪/২৩০; শরহু মুখতাসারিল খলীল, খিরাশী- ৪/১৪৮; মুগনীল মুহতাজ, শুরবীনি- ৩/৪০০; আল গরারুল বাহিয়্যাহ, যাকারিয়া আনসারী- ৪/৩৪৯; আল মাজমূ- ১/৩৩৪; আল মুগনী- ১/১০৬; শরহুল মুনতাহাল ইরাদাত, বুহুতী- ২/১১৪

৯] তাফসীরে ইবনু কাসীর- ৩/২৭৪ সূরা নুর- ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা; আদ্বওয়াউল বায়ান- ৬/২০০

কেননা আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾

স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশযোগ্য তা ব্যতীত নারীদের যেন (গাইরে মাহরামদের সামনে) কোনো সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয়ে যায়। [১০]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে ইমাম ত্বাবারানী ﷺ-সহ বহু মুফাসসির তাদের তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের সৌন্দর্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে,

هي الكحل والخاتم

কুহল (তথা সুরমা, আইলাইনার ও কাজল) এবং হাতের আংটি।

৪. সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে মেয়েদের মেকাপ ও প্রসাধনী ব্যবহারের বিধান

ইসলাম সাজসজ্জা ও পরিপাটিভাবে চলাফেরার ব্যাপারে সর্বদাই উৎসাহ দিয়ে থাকে। তবে অবশ্যই তা শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে নারীদের বিভিন্ন হালাল কসমেটিকস, প্রসাধনী, ক্রিম, স্নো, পাউডার, মেকাপ ইত্যাদি ব্যবহার করা দোষণীয় নয়। এর মাধ্যমে যদি চেহারা দাগমুক্ত হয় অথবা চেহারায় পরিবর্তন আসে তাতেও কোনোসমস্যা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সেসব বস্তুতে কোনো নাপাক উপাদান মিশ্রিত থাকতে পারবে না।[১১]

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

বলুন কে হারাম করেছে আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে? আপনি বলুন, এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য যারা বুঝে। [১২]

---

[১০] সূরা নূর- ৩১

[১১] আউনুল মাবুদ- ৫/২৭৬

[১২] সূরা আ'রাফ- ৩২

সাহাবীয়াতগণও আপন স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাজসজ্জা করতেন।

وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ ببُدنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوجد فاطمةَ رضي اللهُ عنها ممَّن حَلَّ، ولَبِسَت ثيابًا صَبيغًا

বিদায়ী হজ্জে আলী ﷺ ইয়ামান থেকে নবীজি ﷺ-এর কুরবানীর পশু মক্কায় নিয়ে আসেন, সে সময় তিনি দেখলেন ফাতিমা ﷺ ইহরাম খুলে হালাল হয়ে গিয়েছেন এবং তিনি (সাজসজ্জা করে) রঙিন কাপড় পরিধান করেছেন এবং চেহারায় সুরমা লাগিয়েছেন। [১৩]

এরূপ সাজগোজের ক্ষেত্রেও শর্ত হচ্ছে নারীরা গাইরে মাহরামদের সামনে তা প্রকাশ করবে না। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. চুলে খিজাব বা হেয়ার কালার ব্যবহারের বিধান

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নারীরা কালো খিজাব ব্যতীত অন্যান্য রঙের খিজাব দিয়ে চুল রাঙাতে পারে। এক্ষেত্রে ফাসিক ও কাফির নারীদের অনুকরণ করে চুল রাঙানো যাবে না। কারণ ফাসিক ও কাফিরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ জায়েয নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি যাদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৪]

৬. নারীদের ক্ষেত্রে চুল কাটার বিধান

নারীদের চুলের ক্ষেত্রে শারী'আতের মৌলিক নীতিমালা হলো:

- নারীরা চুল লম্বা রাখবে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন ﷺ চুল লম্বা রাখতেন।
- এ পরিমাণ খাটো করবে না যে, পুরুষের চুলের মতো হয়ে যায়। হাদীসে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।
- চুল কাটার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে এই যে, রাস্তায় বের হলে মানুষেরা; বিশেষত পুরুষেরা দেখে তাকে সুন্দর বলবে, তার দিক থেকে নজরই ফিরাতে পারবে না ইত্যাদি; তাহলে তার জন্য চুল কাটা হারাম।
- চুল কাটার ক্ষেত্রে বিজাতীয়দের অনুকরণ করবে না। কারণ হাদীসে বিজাতীয়দের অনুকরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

---

[১৩] সহীহ মুসলিম- ১২১৮; কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসিস সহীহাইন, ইবনুল জাওযী- ৩/৬৪

[১৪] সুনানে আবু দাউদ- ৪০৩৩; মুসনাদুল বাজ্জার- ২৯৬৬; মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক- ২০৯০৮৬

অতএব যে নারীর চুল এত লম্বা যে, কিছু অংশ কাটলে পুরুষের চুলের সাথে সাদৃশ্য হবে না তার জন্য ওই পরিমাণ কাটা জায়েয হবে। পক্ষান্তরে যার চুল তত লম্বা নয়; বরং অল্প কাটলেই কাঁধ সমান হয়ে যাবে এবং পুরুষের বাবরী চুলের মতো দেখা যাবে তার জন্য অল্প করেও কাটার অনুমতি নেই। তবে জটিল অসুস্থতার কারণে, চিকিৎসার প্রয়োজনে অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে চুল ছোট করা, এমনকি জরুরতবশত কামানোরও অনুমতি রয়েছে।

চুল বেশি বড় হলে, যেমন : কোমর সমান চুল থাকলে চার আঙুলের বেশি পিঠের মাঝামাঝি করে কাটা জায়েয। তবে সর্বাবস্থায় ফ্যাশনের অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে নারীরা তাদের চুল খাটো করতে পারবে। এজন্য সময়েরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আর কেউ নাজায়েয পরিমাণ কেটে ফেললে বা বিজাতীয় অনুকরণে চুল কেটে ফেললে তাওবা করতে হবে।[১৫]

৭. নারীদের চুল বিক্রির বিধান

অনেকেই দেখা যায় ফেরীওয়ালাদের নিকট চুল বিক্রি করে থাকে। আবার পার্লার-সেলুনে কেটে ফেলা চুলও বিক্রি হয় বলে শোনা যায়। এভাবে চুল বিক্রি জায়েয নেই, হোক তা নারীর চুল কিংবা অন্য কোনো মানুষের। এই ব্যাপারে সকল মাযহাবের সকল ফুক্বাহা একমত।[১৬]

“মানুষের চুল বিক্রি করা কিংবা ব্যবহার করা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফুক্বাহাগণ একমত। কেননা মানুষ সম্মানিত প্রাণী... সুতরাং মানুষের কোনো অঙ্গকে অসম্মান করা কিছুতেই জায়েয হবে না।”[১৭] তাই তা থেকে নিজেকে পরহেজ করা উচিত। আল্লাহ ﷻ মানব জাতিকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে যেমন আল্লাহ ﷻ সম্মানিত করেছেন তেমনিভাবে মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি চুল, নখ ইত্যাদিও সম্মানিত।

---

[১৫] সহীহ বুখারী- ৩৪৫৬, ৭০৭৯; জামে তিরমিযী- ১/১০৩, হাদীস- ৩০১৩; সুনান আবি দাউদ- ৪০৩১; সহীহ মুসলিম- ১/১৪৮; তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম- ১/৪৭২; আল মুফাসসাল ফী আহকামিল মারআতি ওয়াল বায়তিল মুসলিম- ৩/৪০০; খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ৪/৩৭৭; আদ্দুররুল মুখতার- ৬/৪০৭ থেকে ৪১৬; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ্দুর- ৪/২০৩; আল মাজমূ লিন নববী- ৪/৪৬৯; আল ফাতাওয়াল মারআহ, শায়খ বিন বায, পৃষ্ঠা- ১৬৫

[১৬] সহীহ বুখারী- ৫৯৩১; মুসলিম- ২১২২; রদ্দুল মুহতার- ৫/৫৮; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া- ৩/১১৫; মাজমাউল আনহুর- ৩/৮৫; ফাতাওয়া আল হিদায়া- ৩/৫৫

[১৭] আল মাওসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ ২৬/১০২

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি। তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। [১৮]

❖ হানাফী মত

ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রচিত গ্রন্থে বলেন—

ولا يجوز بيع شعر الانسان

মানুষের চুল বিক্রি করা জায়েয নেই। [১৯]

জামেউস সগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাফেউল কাবীরে এর ব্যাখ্যা এসেছে,

ولا يجوز بيع شعر الإنسان إلخ لأن الإنسان مكرم فلا يجوز أن يكون منه شئ مبتذل

মানুষের চুল বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা, মানুষ হলো সম্মানিত। সুতরাং মানুষের কোনো অঙ্গকে অসম্মানিত করা কিছুতেই জায়েয হবে না। [২০]

কানযুদ দাক্কায়েকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাবঈনুল হাকায়েকে আছে, মানুষের চুল বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা, মানুষ হলো সম্মানিত। সুতরাং মানুষের কোনো অঙ্গকে অসম্মানিত করা কিছুতেই জায়েয হবে না।[২১]

❖ শাফে'য়ী মত

ইমাম নববী ﷺ বলেন,

ما لا يجوز بيعه متصلاً لا يجوز بيعه منفصلاً، كشعر الآدمي،

---

[১৮] সুরা বনী-ইসরাঈল- ৭০

[১৯] জামেউস সগীর মায়া নাফেউল কাবীর- ১/৩২৮

[২০] নাফেউল কবীর শরহে জামেয়িস সগীর- ১/৩২৮

[২১] তাবঈনুল হাকায়েক- ১০/৪৬৩, শরহে বেকায়া- ৪/১২৩, ফতহুল কাদীর শহরে হেদায়া- ১৫/৭; বাহরুর রায়েক- ৬/৮; ফাতাওয়াতুল হিন্দীয়্যাহ- ৩/১১৪

যা সংযুক্ত থাকা অবস্থায় বিক্রি করা নাজায়েয, তা পৃথক হওয়ার পর বিক্রিও নাজায়েয। যেমন: মানুষের চুল তার অন্যতম।[২২]

◈ মালেকী মত

ইমাম ইবনু আব্দিল বার আল মালেকী ﷺ এবং আল্লামা আ'দাউই আল মালেকী ﷺ তার 'হাশিয়া আলা শারহি মুখতাসারি খলিল লিল খিরাশি'—তে লিখেন,

سئل مالك عن بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس. فكرهه،

ইমাম মালিককে মানুষের মাথামুণ্ডনের পর উচ্ছিষ্ট চুল বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি এটিকে নাজায়েয আখ্যায়িত করলেন।[২৩]

◈ হাম্বলী মত

আল্লামা বুহুতী ﷺ বলেন,

ولا يجوز استعمال شعر الآدمي، مع الحكم بطهارته لحرمته، أي احترامه

মানুষের পবিত্রতা, মর্যাদার কারণে তাদের চুল ব্যবহার করা জায়েয নেই।[২৪]

৮. ভ্রু প্লাক, শরীরে নকশা আঁকা ও দাঁতের মাঝে ফাঁকা সৃষ্টি করা

স্বামী চাইলেও ভ্রু প্লাক করা জায়েয নেই। কেননা এর দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা হয়, যার অনুমতি ইসলামে নেই। একইভাবে মুখে বা হাতে সুঁই ফুটিয়ে নকশা আঁকা বা ট্যাটু করা বৈধ নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, "আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক ওই নারীদের ওপর, যারা দেহে উল্কি উৎকীর্ণ করে ও যারা করায়, যারা ভ্রু চেঁছে সরু (প্লাক) করে, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির মানসে দাঁতের মধ্যে ফাঁকা সৃষ্টি করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।"[২৫]

তবে পুরুষের দাড়ি-গোঁফের মতো নারীর গালে বা ঠোঁটের ওপর-নিচে পশম থাকলে তা তুলতে দোষ নেই এবং নারীদের জন্য চেহারার অতিরিক্ত পশম তুলে ফেলা জায়েয। কোনো কোনো ইমামদের মতে এটি মুস্তাহাব।[২৬]

---

[২২] আল-মাজমূ'- ৯/২৫৪

[২৩] আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদীনাতিল মালেকী, পৃষ্ঠা- ২২৮

[২৪] কাশশাফুল ক্বিনা- ১/৭০

[২৫] সহীহ বুখারি- ৪৮৮৬, ৫৯৪৩, ৫৫৯৯; সহীহ মুসলিম- ২১২৫ মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস- ১৪৬৭

[২৬] আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল্ল- ৭/১৩৫; আলমাজমু- ১/৩৪৯

উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কৃত্রিমভাবে দাঁতের মধ্যে ফাঁকা তৈরি করা জায়েয নেই। তবে কোনো দাঁত অস্বাভাবিক বাঁকা বা অতিরিক্ত থাকলে তা সোজা করা অথবা উপড়ে ফেলা বৈধ।[২৭]

৯. নখ বড় রাখার বিধান

আজকাল অনেক নারীকেই দেখা যায় নখ বড় রাখতে। অথচ হাত-পায়ের নখ বড় রাখা বিজাতীয়দের স্বভাব এবং একটি ঘৃণিত কাজ। অনেক সময় নখের ভেতর ময়লা জমে খাবারের সাথে পেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

প্রতি সপ্তাহে হাত-পায়ের নখ কাটা সুন্নাহ। অন্তত দুই সপ্তাহে একবার কাটলেও চলবে। তবে ৪০ দিনের বেশি না কাটা অবস্থায় অতিবাহিত হলে গুনাহ হবে।[২৮]

১০. নেইলপলিশ পরিধানের বিধান

নেইলপলিশ যদি পবিত্র বস্তু দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয। তবে নেইলপলিশ যেহেতু পানি প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, তাই তা নখে থাকা অবস্থায় ওযু ও ফরয গোসল সম্পন্ন হবে না। নখ থেকে তা তুলে তারপর ওযু ও ফরয গোসল করতে হবে। বারবার ওযুর সুবিধার্থে নেইলপলিশ ব্যবহার না করাই অধিক নিরাপদ।[২৯] তবে নারীরা তাদের হায়েযের সময় এটি পরিধান করতে পারে যেহেতু সে সময়ে ওযুর তেমন প্রয়োজন হয় না।

১১. নারীদের জন্য অলংকার পরিধানের বিধান

নারীরা কাঁচ, সোনা, রুপা, পিতল, তামাসহ সব রকমের ধাতুর অলংকার পরিধান করতে পারবে। নারীদের জন্য কান ও নাক ফোঁড়ানো এবং তাতে অলংকার পরিধানেও ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নেই।[৩০]

তবে নুপুর বা পায়েলের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, নারীগণ সেসকল নুপুরই কেবল পরিধান করতে পারবে যেই নুপুরে ঝুনঝুন শব্দ হয় না। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾

---

[২৭] সহীহ মুসলিম বি শরহীন নাবাবি- ১৪/১০৭

[২৮] সহীহ মুসলিম- ২৫৮

[২৯] ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া- ১/৪ ; আপকে মাসায়েল- ৭/১৩৭; হাশিয়াতুত ত্বহত্বী আলা মারাকিল ফালাহ- ১/৯৮

[৩০] আপকে মাসায়েল আওর উনকা হাল্ল- ৭/১৩৮; আল মাজমু', নববী- ৪/৪৪৪; আসনাল মাত্বা-লিব- ১/৩৭৯; আল ফাতাওয়া আল ফিকহিয়্যাহ আল কুবরা- ১/২৬১

তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।[৩১]

এই আয়াতটিতে মূলত নূপুরের ব্যাপারেই আলোচনা হয়েছে যেমনটি বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ আছে। সুতরাং এতে বোঝা যাচ্ছে পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য না হলে মেয়েদের 'যীনাত' তথা সাজসজ্জা হিসেবে নারীরা তা পরিধান করতে পারবে।

১২. কৃত্রিম চুল বা পরচুলা, কৃত্রিম পলক, কৃত্রিম নখ এবং রঙিন আইলেন্স ব্যবহারের বিধান

মানুষের বা শুকরের চুল অথবা লোম থেকে তৈরি চুল ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। এ ছাড়া শরী'আতে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতকৃত পরচুলা ব্যবহারেরও বৈধতা নেই, এমনকি স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যেও তা পরিধান জায়েয নয়। একে সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহারকারী ও প্রস্তুতকারীকে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র যবানে লা'নত দিয়েছেন।

কৃত্রিম পলক যা চোখের পাতায় লাগানোর জন্যে ব্যবহৃত হয় তার বিধানও পরচুলার বিধানের মতো। কেননা তা পরচুলার সাদৃশ্য বহন করে।

তবে যদি গাইরে মাহরামকে দেখানো, ফ্যাশন বা কাউকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার না করা হয় বরং স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বা স্বামীর সামনে যীনাত বৃদ্ধির জন্যে সেই কৃত্রিম পলক ব্যবহার করা হয়, তাতে শরঈ কোনো সমস্যা নেই। তবে এক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, সেটি মানুষ কিংবা শুকরের চুল বা লোম ব্যতীত অন্য কোনো পশু-পাখির লোম অথবা আর্টিফিশিয়াল তথা কৃত্রিম উপায়ে তৈরিকৃত পলক হতে হবে। তবে কতিপয় চিকিৎসক চোখে কৃত্রিম পলক পরিধানকে চোখের জন্যে ক্ষতিকর বলে থাকেন, তাই এসব প্রসাধনী ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

অনুরূপ বিধান কৃত্রিম নখের ও আইলেন্সের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ, গাইরে মাহরামকে আকর্ষণ কিংবা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়ে যদি স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য তা পরিধান করা হয় এবং সেটি যদি মানুষ বা শুকরের অঙ্গের কোনো অংশ হতে তৈরিকৃত না হয়ে থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, উল্লিখিত মাসআলার ক্ষেত্রে ওযু ও ফরয গোসল করার সময় এসব খুলে ফেলতে হবে, যাতে করে ওযু ও ফরয গোসলের অঙ্গসমূহে বিনা বাধায় পরিপূর্ণভাবে পানি প্রবেশ করতে পারে।

---

[৩১] সূরা নুর- ৩১

উল্লেখ্য যে, ওযুর ক্ষেত্রে চোখের মধ্যখানে পানি পৌঁছানো জরুরি নয় তাই ওযুর সময় আইলেন্স খোলাও জরুরি নয়, বিশেষ করে তাদের জন্য যারা চোখের সমস্যার কারণে লেজার সার্জারির মাধ্যমে আইলেন্স স্থাপন করে থাকে।[৩২]

১৩. কপালে টিপ পরিধানের বিধান

টিপ পরিধান মূলত হিন্দুয়ানী প্রথা। হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস মোতাবেক স্বামীর মঙ্গল ও সংসারের সুখ স্থায়ী রাখার জন্য (লাল) টিপ, সিথিতে সিঁদুর ও হাতে শাখা পরিধান করতে হয়! এ ছাড়াও এটি পুজার তিলক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তাই সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে এসব পরিহার করা মুসলিম নারীদের জন্য একান্ত কর্তব্য। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা জায়েয নয়।[৩৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন,

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার সাথে থাকবে যাকে সে মোহাব্বত করে।[৩৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি যাদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।[৩৫]

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, টিপ হিন্দুদের মতো লাল না হয়ে ভিন্ন রঙের হলে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য পরিধান করতে পারবে। তবে সার্বিক বিবেচনায় এটি পরিহার করাই উত্তম। উল্লেখ্য যে, কপালের টিপ পরিধানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত ইবরাহীম عليه السلام—এর একটি ঘটনা লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে, যা নিতান্তই বানোয়াট।

---

[৩২] সহীহ বুখারী- ৫২০৫, ৫৯৪১; সহীহ মুসলিম- ২১২২-২১২৩; সুনানে আবু দাউদ- ৪১৭০; সুনানে নাসাঈ- ৫২৫০; সুনানে ইবনু মাজাহ- ১৯৮৮; মুসনাদে আহমাদ- ৩৯৪৫; উমদাতুল ক্বারী- ২০/২০৪; তাবঈনুল হাকায়েক- ১০/৪৬৩, শরহে বেকায়া- ৪/১২৩, ফতহুল কাদীর শহরে হেদায়া- ১৫/৭; বাহরুর রায়েক- ৬/৮; ফাতাওয়াতুল হিন্দীয়্যাহ- ৩/১১৪;

[৩৩] মুসনাদে আহমাদ : ১০৯৫; সুনানে তিরমিযী : ১৭০৭

[৩৪] মুসনাদে আহমাদ- ৩৭১৮; সহীহ বুখারী- ৬১৬৮, ৫৮১৬

[৩৫] সুনানে আবু দাউদ- ৪০৩১



||১৬তম দারস||

মাসায়িলুন নিকাহ

পাত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন

১. পাত্র যদি ইসলামী কোনো ব্যাংকে চাকরি করে তাহলে সেইখানে বিয়ের জন্য রাজি হওয়া কি উচিত হবে? ইসলামী ব্যাংকগুলোতে চাকরি করা কি বৈধ?

◈ এদেশে আসলে কোনো ইসলামী ব্যাংক নেই। উক্ত প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়াই উত্তম হবে।

২. দ্বীনদার কাউকে পছন্দ হলে আল্লাহর কাছে কি তাকে চাওয়া যাবে নিজের অর্ধ দ্বীন পূরণের জন্য? মানে নির্দিষ্ট করে ওই মানুষটাকে?

◈ চাওয়া যাবে। তবে বলতে হবে, "আল্লাহ, যদি তার মাঝে আমার জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে তাহলে তাকে পাওয়া আমার জন্য সহজ করুন।"

৩. বিয়ের জন্য যদি পাত্রীর ছবি শুধু পাত্র দেখে, এমন অবস্থায় পাত্রীর ছবি দেওয়া ঠিক হবে?

◈ ছবি দেখায় সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বিয়ে না হলেও পাত্রের কাছে উক্ত ছবি স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়া। তাই ছবি আদান-প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪. পরিবার থেকে বিয়ের জন্য এমন পাত্রের কথা বলা হয় যার দাড়ি নেই, ৫ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমতো পড়ে না। এককথায় বলতে গেলে দ্বীনদার না। সবাই বলে যে, বিয়ের পর দ্বীনদার বানিয়ে নিলেই তো হবে। এরকম যুক্তি দেয় যে, ভালো মানুষ তো সবাই চায়। একজন বেদ্বীন মানুষকে যে দ্বীনের পথে আনতে পারে সেই তো প্রকৃত ভালো মানুষ। এটা আসলে কতটুকু যৌক্তিক? আর যেখানে আমিই দ্বীন ভালোমতো বুঝি না সেখানে আরেকজনকে কী শিখাবো? এক্ষেত্রে করণীয় কী?

◈ এসব যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই, এসব ক্ষেত্রে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে হবে।

৫. বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে ছেলে-মেয়ে যে মাহরামের উপস্থিতিতে একে অপরকে দেখবে এবং কিছু জানার থাকলে প্রশ্ন করবে, সেক্ষেত্রে মেয়ে যতক্ষণ প্রশ্ন করবে সে পুরোটা সময়ই কি ছেলের সামনে মুখ খোলা রাখতে পারবে? নাকি প্রশ্ন করা শেষ হয়ে গেলে ছেলেকে মুখ খুলে দেখিয়ে আবার মুখ ঢেকে ফেলবে? মেয়ে যদি প্রশ্ন করার সময় মুখ খোলা রাখে, তাহলে কি গুনাহ হবে বা পর্দার খেলাফ হবে?

◈ না এতে সমস্যা নেই, পুরো সময় মুখ খোলা রাখতে পারবে, গুনাহ হবে না।

বিয়ের গুরুত্ব না বোঝা পরিবার সম্পর্কিত প্রশ্ন

৬. আমার বয়স ২৩। বিয়ে করা খুব জরুরি। বাসার সকলকে বহুবার বুঝিয়েছি। কেউই পাত্তা দেয় না। আমার ব্যাপারে কেউ দায়িত্বপা্লন করে না। সবাই সবার কাজে ব্যস্ত। কোনো প্রস্তাব এলেও না বলে দেয়। বয়স হয়ে গেলে বিয়ে কঠিন হয়। আমার বড় ৪ বোন নিজেদের পছন্দে বিয়ে করেছে, তাও অনেক বয়সে (প্রায় ২৬) কিন্তু আমি কোনো হারাম সম্পর্কে যেতে পারবো না। বাসায় একমাত্র আমিই দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখি, সবাই দ্বীনবিমুখ। আমি জব করতে চাই না, তাই বিয়ে করতে চাই তাড়াতাড়ি। বাসায় পর্দা করাও বেশ কষ্টকর। আমি এসব মিলে বেশ চিন্তিত। আমার কী করা উচিত?

◈ উপযুক্ত পাত্রের কাছে প্রস্তাব দেওয়া উচিত আর নিজের অবস্থা মা-বাবাকে আরও ভালো করে বোঝানো উচিত। এতেও না মানলে ভয় দেখানো যেতে পারে যে, তারা বিয়ে না দিলে আপনি নিজে নিজেই বিয়ে করে ফেলবেন।

৭. আমি অবিবাহিত। যখন যৌন উত্তেজনা জাগে তখন কল্পনায় বা মনে মনে কোনো পুরুষকে নিয়ে নানান রকম কল্পনা আসে আর এই কল্পনাটা ইচ্ছায় নাকি অনিচ্ছায় বুঝতে পারি না। এতে করে কি গুনাহ হয়?

◈ এই ধরনের কল্পনা থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বিরত রাখতে হবে নাহলে গুনাহ হবে। আর বাসায় বিয়ের জন্য বাবা-মাকে বোঝাতে হবে।

বিয়ের পর নিজ পরিবারের খিদমত সম্পর্কিত প্রশ্ন

৮. আমার আর কোনো ভাই-বোন নেই তাই আমার মা বিশেষ করে চায় যে বিয়ের পর যেন বাবার বাড়িতেই থাকি। তারা এমন পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে চায় যার সাথে বিয়ে হলে বাবার বাড়িতেই থাকা যাবে। কিন্তু আমার কাছে বিয়ের পর বাবার বাড়িতে থাকাটা লজ্জাজনক মনে হয়। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী? আর আমার যেহেতু আর

কোনো ভাই-বোন নেই তাহলে বিয়ের পর যদি স্বামীর বাড়িতে থাকি সেক্ষেত্রে কীভাবে বাবা-মার সেবা করব? আমার ওপর বাবা-মার কতটুকু হক থাকবে?

◈ স্বামীর বাড়ি থেকেই আপনি চাইলে বাবা-মার খেদমত করতে পারেন। দরকার হলে হবু স্বামীকে এ কথা সুবিস্তারিত জানিয়ে বিয়ের জন্য আগাবেন।

স্বামীর সাথে আচরণবিধি

৯. স্বামীর সামনে কি পালাজো, গেঞ্জি পরিধান করা যাবে? সেক্ষেত্রে কখনো হাসবেন্ডের গেঞ্জি পরলে সমস্যা আছে?

◈ পালাজো পরা যাবে। নারীসুলভ গেঞ্জি পরিধান করা যাবে কিন্তু পুরুষের গেঞ্জি পরিধান করা যাবে না।

১০. স্বামী-স্ত্রী যদি কোনো কারণে আলাদা থাকে অথবা স্বামী যদি বিদেশে থাকে তাহলে কি স্বামীকে নিজের গোপনাঙ্গের ছবি দেওয়া যাবে? অথবা ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখানো যাবে?

◈ ছবি না তুলে রেকর্ড থাকে না এমন ভিডিও করা যাবে। তৃতীয় ব্যক্তি যাতে কোনোমতেই এর নাগাল না পায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। তবে এর মাধ্যমে যদি স্বামীর গোপন পাপে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে বিরত থাকতে হবে।

১১. স্বামী আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে, স্ত্রী স্বামীর টাকা থেকে তার বাবা-মাকে কিছু দিতে পারবে অথবা সাহায্য করতে পারবে?

◈ জি, পারবে।

১২. স্বামী-স্ত্রী যদি পারিবারিক সমস্যার কারণে একে অপর থেকে দূরে থাকে এবং একে অপরের সাথে দেখা করতেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়, আর এইক্ষেত্রে যদি তারা বাসায় মিথ্যা বলে একে অপরের সাথে দেখা করে; তাহলে কি গুনাহ হবে?

◈ মিথ্যা না বলে কৌশলে কথা বলবে, যাতে মিথ্যাও না হয় আবার সত্যটাও লুক্কায়িত থাকে।

১৩. সহবাসের পর গোসল করে পাক হয়ে যাওয়ার পরেও লজ্জাস্থান থেকে পানির মতো কিছু জিনিস বের হয়ে পায়জামা সামান্য ভিজে যায়। এটা কি পাক নাকি নাপাক? (আবার ফরয গোসল করতে হবে কিনা) এই পায়জামা পরেই কি নামায পড়া যাবে?

◈ ওযু করে নিলেই হবে। যদি লজ্জাস্থান থেকে তা নির্গত হয়ে কাপড়ে লাগে তাহলে ওই অংশটুকু চিহ্নিত করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর সেই কাপড়ে নামায পড়া যাবে।

১৪. একজন দ্বীনদার বোন, যার বিয়ে হয়েছে ২ বছর আগে। এখন তিনি জানতে পেরেছেন তার স্বামী পর্নোসক্ত। এটা নিয়ে বোন তার স্বামীর সাথে আলোচনা করতে গেলে স্বামী কোনো সহযোগিতা করে না। বোন অনেক হতাশায় ভুগছেন। স্বামীর এমন নির্লিপ্ততা দেখে স্বামীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ কাজ করছে, ছোট বাচ্চা থাকার কারণে আলাদা হতেও চাচ্ছেন না। শাইখের কাছে প্রশ্ন, বোনের এখন কী করণীয়? স্বামীর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা না থাকার দরুন আগের মতো স্বামীর আদেশ-নিষেধ না মানার কারণে বোন কি গুনাহগার হবেন? এই পরিস্থিতিতে সেই বোনের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ কী?

◈ স্বামীর যেসব আদেশ-নিষেধ শরী'আতসম্মত তা এ মুহূর্তেও মানতে হবে যদিও আগের মতো ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যবোধ না থাকে।

১৫. স্ত্রীর শারীরিক-মানসিক অবস্থা বিবেচনা না করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে প্রতিদিনই নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য জোর করাকে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে দেখে? জ্বর বা এই জাতীয় অসুস্থতা নিয়েও স্বামীর প্রয়োজন মিটানো জরুরি? স্বামীকে বোঝানোর পরও না মানলে কি করা যাবে?

◈ এটা জুলুম। যদি স্ত্রীর অসহনীয় অসুখ হয় এবং স্বামীকে বোঝানোর পরেও না বুঝে তাহলে স্ত্রী চাইলে সর্বাত্মকভাবে স্বামীকে বাধা দিতে পারে।

১৬. বহুবিবাহের ব্যাপারে স্বামীকে অনুৎসাহিত করা কি অনুচিত?

◈ যদি ১ম স্ত্রী স্বামীর সকল স্ত্রীসুলভ চাহিদা পূরণ করে থাকে তাহলে তাকে এব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে সমস্যা নেই। তবে আল্লাহর বিধান অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এটি পুরুষদের জন্য ইনসাফের শর্তে জায়েয।

সাজগোজ সম্পর্কিত প্রশ্ন

১৭. স্বামীর সামনে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পর্দার সহিত ব্যায়াম করা যাবে। কিন্তু ইয়োগা বা যোগব্যায়াম হিন্দু সমাজের প্রচলিত ব্যায়াম। এসব করা যাবে কি?

◈ ইয়োগা বা যোগব্যায়াম করা যাবে না।

১৮. কোনো স্কিন কেয়ার অথবা মেকআপ প্রোডাক্টে এলকোহল এবং এনিমেল এক্সট্রাক্ট (পশুর চর্বি বা অন্যান্য কিছু) থাকলে সেটা ব্যবহার করা কি হারাম?

◈ এলকোহলের অনেক ধরন আছে। পণ্যের মাঝে কোন এলকোহল রয়েছে সেটা না জেনে বলা যায় না। তবে এনিমেল এক্সট্রাক্টের উপস্থিতি থাকলে তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ সম্পর্কে পূর্বের দারসে বিস্তারিত উত্তর দেয়া হয়েছে।

মেডিকেল-বিষয়ক প্রশ্ন

১৯. সব সময় ব্রেসিয়ার/ব্রা পরে থাকলে কি কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে?

◈ সব সময় পরা উচিত না। রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই ব্রা ছাড়া ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা উচিত। অধিক টাইট ব্রা ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

২০. সপ্তাহে কতদিন সহবাস করা উচিত?

◈ কোনো নির্দিষ্টতা নেই। সহবাস প্রতিদিন করাতেও কোনো সমস্যা নেই ইন শা আল্লাহ।

২১. ছেলেদের কত বছর বয়স পর্যন্ত তাদের যৌন চাহিদা খুব প্রবল থাকে?

◈ একেক পুরুষের একেক রকম, তবে ১৮-৩২ বছর সময়টা যৌন চাহিদা প্রবল থাকে।

২২. বিয়ের প্রথম রাতে সহবাসের ইচ্ছা জাগলে সেক্ষেত্রে একজন মেয়ে কী ধরণের নিরাপত্তা নিতে পারে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য? প্রথম রাতে স্বামী যদি কোনো নিরাপত্তা গ্রহণ না করে সেক্ষেত্রে একজন মেয়ের কী ধরণের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রাখা উচিত বা রাখতে হবে?

◈ বিষয়টি স্বামী-স্ত্রী নিজেরা আলোচনা করে নেবে যে, তারা কী চায়। নিজেদের জন্য কোনটা সহজ এবং তৃপ্তিকর।

২৩. কোনো পুরুষ বিয়ের আগে যৌনমিলন করেছে কিনা তা কি বোঝার উপায় আছে?

◈ না এমন কোনো উপায় নেই। আর এটা জানার চেষ্টা করাও উচিত না।

২৪. মেয়েদের বীর্যপাত কি ছেলেদের চেয়ে সবসময়ই দেরিতে হয়? সেক্ষেত্রে পুরুষদের বীর্যপাত হয়ে যাওয়ার পর কী করতে হবে নারীর বীর্যপাতের জন্য?

◈ না, দেরিতেই হবে এমন কথা নেই। নারীর আগেও হতে পারে। যদি পুরুষের আগে হয় তখন স্ত্রীকে ফোরপ্লে করার দিকে মনোযোগী হতে হবে। তখন দুজনের জন্যই সহজ হবে।

২৫. ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করা কি অনুচিত? কারা কীভাবে ব্যবহার করতে পারে এটা? কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে?

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। কিছু টেস্ট, হিস্ট্রি নিয়ে তারপর বুঝতে হবে আপনার জন্য পারফেক্ট কিনা। তবে ইমপ্ল্যান্ট, পিল এসব কিছুরই সাইড ইফেক্ট রয়েছে। এজন্য উত্তম হচ্ছে ফিজিক্যাল ম্যাথড। যেমন: উইড্রো ম্যাথড, ক্যালেন্ডার ম্যাথড, কনডম ব্যবহার করা ইত্যাদি। এসব সবচেয়ে নিরাপদ ইন শা আল্লাহ।



||১৭তম দারস||

বীরাঙ্গনা

আগা গোড়া কালো কাপড়ে মোড়া, মুখ লুক্কায়িত নিকাবের আড়ালে, চাল চলনে ধীর-স্থিরতা, কণ্ঠস্বরে ক্ষীণতা, মোলায়েম আচরণ দ্বীনদার নারীদের বৈশিষ্ট্যগুলো এমনই। এই নারীদেরকে দেখলে প্রাথমিকভাবে সবাই ধরেই নেবে যে এরা দুর্বল, হাবা-গোবা, দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর, কিছু বুঝেনা গোছের মেয়েলোক। আসলেই কি তাই? মুসলিমাহ নারীরা হবে বাইরে কোমল, ভিতরে বজ্রসম। প্রয়োজনে আগ্নেয়গিরির রূপধারণ করবে। নিজের আত্মরক্ষায় তারা হবে কঠোর, নিজেদের দ্বীনি অধিকার আদায়ে তারা হবে আপসহীন। উম্মাহর খাতিরে প্রাণ বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আমাদের রোল মডেল সাহাবিয়াতদের থেকে আমরা তো এটাই শিক্ষা পাই। নারীদের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ—এর সম্মানিত পত্নীগণ ও মহিলা সাহাবিগণ অনুসরণীয়। তাঁরা যেমন নিজেদের আব্রু রক্ষার্থে ছিলেন কঠোর ঠিক তেমনি প্রয়োজনে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের ময়দানেও সমান তালে ভূমিকা রেখেছেন।

১. জিহাদের ময়দানে সাহাবিয়াতদের ভূমিকা

নবী ﷺ—এর জামানায় সপ্তম হিজরিতে খায়বারের জিহাদে এবং ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ে ও হুনাইয়েনের জিহাদে অনেক মহিলা সাহাবিয়াত رضي الله عنهن—এর অংশগ্রহণের কথা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

◆ **মহিলা সাহাবিগণ জিহাদে গিয়ে প্রধানত যে সব কাজে নিয়োজিত থাকতেন—**

◆ মুজাহিদদের তির তুলে এনে দিতেন;

◆ পিপাসার্তদের পানি এনে পান করাতেন;

◆ মুজাহিদদের জন্য রান্নায় সহযোগিতা করতেন;

◆ আহতদের মলম, পট্টি লাগিয়ে সেবা শুশ্রূষা করতেন;

◆ নিহত-আহতদের মদিনায় ফেরত পাঠাতেন;

◆ কেউ আবার প্রয়োজনে সম্মুখ সমরেও অংশগ্রহণ করতেন;

◆ জিহাদে অংশগ্রহণের বিনিময়ে তাদেরকে লব্ধ গনিমতের সম্পদ দেওয়া হতো।

◈ এ সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস—

◆ ইয়াজিদ ইবনে হুরমুয থেকে বর্ণিত যে, নাজদাতুল খারেজী ইবনে আব্বাস ﷺ—এর কাছে পত্র লেখেন। তার মাধ্যমে তিনি পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চান। ইবনে আব্বাস ﷺ জবাবে লেখেন তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ যে, রাসূল ﷺ কি নারীদেরকে জিহাদে শামিল করেছিলেন? হ্যাঁ, তিনি তাদেরকে জিহাদে শামিল করেছিলেন, তারা আহতদের শুশ্রূষা করেছিলেন এবং গনিমতের সম্পদ লাভ করেছিলেন।[১]

◆ রুবাই বিনতে মুআওবিস ﷺ থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, তাঁর বোনের স্বামী নবী ﷺ এর সাথে বারোটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তার স্বামীর সাথে দুটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আমরা যুদ্ধ ফেরত রোগীদের সেবা করতাম এবং আহতদের ক্ষত স্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিতাম।[২]

◆ আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইম ﷺ একটি খঞ্জর সঙ্গে করে এনেছিলেন। আবু তালহা সেটি দেখেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এই যে উম্মে সুলাইম, তার কাছে একটি খঞ্জর আছে।" রাসূল ﷺ তাকে বলেন, "এ খঞ্জরটা কোন কাজে লাগবে?" উম্মে সুলাইম ﷺ জবাব দিলেন, "এটা আমি নিয়ে এসেছি এ জন্য যে যদি মুশরিকদের কেউ আমার কাছাকাছি এসে যায় তাহলে এটা দিয়ে আমি তার পেট ফেঁড়ে ফেলব।" এ কথায় রাসূল ﷺ হেসে দিলেন।[৩]

◆ রাসূল ﷺ—এর ওফাতের পর আবু বকর ﷺ খলীফা হন। তার আমলে মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে বহু নারী জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উম্মে আম্মারাহ ﷺ—এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ জিহাদে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেন। মুসাইলামাকে হত্যার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এতে তিনি মারাত্মক আহত হন এবং কনুই পর্যন্ত একটি হাতও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৪]

◆ আবু বকর ﷺ—এর খেলাফতকালে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে উম্মে হাকাম ﷺ শরীক ছিলেন। তিনি তাঁর তাঁবুর একটি মোটা দণ্ড নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং একাই শত্রু সেনাদের সাতজনকে হত্যা করেন।

---

[১] সহীহ মুসলিম- ৫/১৯৭

[২] সহীহ বুখারী- ৩/১২২

[৩] সহীহ মুসলিম- ৫/১৯৬

[৪] নিসাউ হাওলার রাসূল- ১২৩ থেকে ১২৫

◆ উমার ﷺ—এর আমলে ১৫ হিজরিতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিনতে ইয়াজিদ ﷺ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একাই তাঁবুর খুঁটির আঘাতে নয় জন রোমান সৈন্য হত্যা করে বীরাঙ্গনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। [৫]

◆ আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন রাসূল ﷺ তাঁর খালা উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ﷺ—এর বাড়িতে যান, সেখানে শয়ন করেন। তারপর উঠে হাসতে থাকেন। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ﷺ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনি হাসছেন কেন?" তিনি জবাবে বলেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক (আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য) নৌযানে চড়ে ভূমধ্যসাগরে গমন করবে। (দুনিয়ায় ও আখিরাতে) তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহদের মতো হবে।" এ কথা শুনে উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ﷺ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দু'আ করুন আমাকে যেন তিনি তাদের মধ্যে শামিল করেন।" জবাবে রাসূল ﷺ দু'আ করেন, "হে আল্লাহ তাকে তাদের মধ্যে শামিল করুন।" অতঃপর মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ﷺ—এর যুগে নৌবহরে তিনি সওয়ার হন বিনতে কাযরার সাথে। তারপর ফেরার সময় নিজের সাওয়ারির পিঠে চড়লে তা তাকে ফেলে দেয়। তিনি নিচে পড়ে শাহাদাত বরণ করেন।[৬]

◆ শত্রুবাহিনী মুসলিম নারীদেরকে বন্দি করে তাদেরকে লালসার শিকারে পরিণত করার জন্য যখন বণ্টন করতে নেয় তখন প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে খাওলা ﷺ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বলেন,

يا بنات حمير و بقية تبع اترضين لا نفسكن علوج الروم، و يكون اولادكن عبيدا لاهل الروم فاين شجاعتكن و براءتكن التي تتحدث بها عنكن احياء العرب و محاضر الحضر و إني اراكن بمعزل عن ذلك، و إني ارى القتل عليكن أهون،

ওহে হুমাইর ও তুব্বার গোত্রের নারীরা, তোমরা কি রোমানদের লালসার শিকার হওয়ার জন্য এবং তোমাদের পুত্ররা মুশরিকদের গোলাম হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? তোমাদের সে সাহসিকতা ও ভূমিকা কোথায় যার উল্লেখ করে আমরা আরবদের মাঝে প্রাণ ফিরিয়ে আনতাম? তোমাদের মাঝে তো সেসব এখন দেখছি না। তোমাদের ওপর আপতিত এ বিপদে তোমরা রোমক কুকুরদের মনোরঞ্জন করবে এর চেয়ে মৃত্যুই আমি তোমাদের জন্য অধিক শ্রেয় মনে করি।

---

[৫] আল ইসাবা ফী তামইযিস সাহাবা- ১৩/৮৫

[৬] সহীহ বুখারী- ২৭৮৯; সহীহ মুসলিম- ১৯১২,২৩৩১; সিয়ারু আলামিন নুবালা- ২/৩১৬

তার এ জ্বালাময়ী বক্তব্য শুনে আফরা বিনতে গিফার ﵂ বলে উঠলেন,

صدقت والله يا بنت الأزور، ونحن في الشجاعة، كما ذكرت، وفي البراعة كما وصفت، غير أن السيف يحسن فعله في مثل هذا الوقت، وإنما دهمنا العدو على حين غفلة، وما نحن الا كالغنم بدون سلاح،

আল্লাহর কসম! তুমি সত্য বলেছ। হে বিনতে আযুর, তুমি যে সাহসিকতা ও বুদ্ধির কথা বলেছ আমরা তা ভুলিনি। আমাদের অনেক কৃতিত্ব ও বহু বড় বড় ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহর কসম, আমরা ঘোড়ায় আরোহণ করে রাতে ওইদিকে গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছি বটে, তবে ওই সময়ে তরবারি ভালো কাজে আসত। আমরা চাচ্ছি শত্রুদের অজান্তে তাদের উপর হামলা করতে। কারণ আমরা তো এখন মালিকের হাতের ছাগলের মতো।

তখন খাওলা ﵂ বললেন,

يا بنات التبايعة خذن اعمدة الخيام وأوتاد الاطناب ونحمل بها على هؤلاء اللئام فلعل الله ينصرنا عليهم فنستريح من معرة العرب،

ওহে তুব্বা ও আমালিকা বংশের মেয়েরা, তোমরা তাবুর খুঁটি ও কাঠগুলো হাতে নাও। আমরা এসব নিকৃষ্ট লোকদের ওপর আক্রমণ করব। হয়তো আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করবেন অথবা আমরা শহিদ হয়ে আরবদের লজ্জা ঘুঁচিয়ে দেবো।

তখন আফরা বিনতে গিফার ﵂ বললেন,

والله ما دعوت إلا لما هو أحب الينا مما ذكرت،

আল্লাহর কসম! আমি যা বলেছিলাম তার চাইতে তোমার প্রস্তাবটি আমার কাছে অধিক প্রিয়।

অতঃপর প্রত্যেকেই একটি করে তাঁবুর খুঁটি ও কাঠ হাতে নিলেন এবং সকলে একসাথে আওয়াজ তুললেন। খাওলা ﵂ তাঁর কাঁধে একটা বড় খুঁটি নিলেন আর তাঁর পিছনে আফরা, উম্মে আবান বিনতে আতবা, সালমা বিনতে যিরা, লুবনা বিনতে হাযেম, মাখরুমা বিনতে আমলুক ও সালমা বিনতে লুমান ﵅—সহ অন্যান্য মহিলারা চলতে লাগলেন। খাওলা ﵂ তাদেরকে বললেন, "তোমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা একটি চলন্ত বৃত্তের মতো থাক। যদি বিচ্ছিন্ন হও তাহলে শত্রুরা আমাদেরকে শেষ করে ফেলবে।"

অতঃপর খাওলা ﷺ সবার আগে গিয়ে হামলা করলেন। সর্বপ্রথম তাদের একজন লোকের ওপর আঘাত হানলেন। আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রোমানরা এদিক-সেদিক তাকিয়ে ভাবতে লাগল যে, ব্যাপার কী? তারা দেখল তাদের সামনে কিছু নারী। এভাবে খাওলা সঙ্গীদের নিয়ে রোমান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করলে তারা চর্তুদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। কিন্তু তারা কেউই তাদের কাছে আসতে সক্ষম হচ্ছিলো না।

তাঁদের নিকট কেউ যেতে চাইলে সাথে সাথে তারা তার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করত। আঘাতের ফলে যখন লোকটি লুটিয়ে পড়তো তখন তারা খুটি নিয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করতো এবং তার অস্ত্র নিয়ে নিত। এভাবে তাঁরা রোমানদের ত্রিশজন অশ্বারোহীকে হত্যা করলেন। রোমান সেনাপতি বুত্রোস এ অবস্থা দেখে প্রচন্ড রেগে গেল এবং সৈন্যদের নিয়ে তাদের দিকে পদব্রজে চলল। তাঁরা ওদেরকে কাছে আসতে দেখে একে অপরকে উৎসাহ দিয়ে বলল— সম্মানিত অবস্থায় মরো, লাঞ্ছিত অবস্থায় মরো না।

বুত্রোস মাথা তুলে তাঁদের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। আর খাওলা ﷺ—কে সিংহের মতো ঘুরতে দেখল। তিনি বলতে লাগলেন—

"আমরা হচ্ছি তুব্বা ও হিময়ার বীরাঙ্গনা
শত্রুদের ওপর আঘাত হানা আমাদের জন্য কঠিন না।
কারণ আমরা যুদ্ধে জ্বলন্ত আগুন, বজ্রনিনাদ
আজকে তোমাদের করতে হবে মহাশাস্তি আস্বাদ"

বুত্রোস যখন খাওলার একথা শুনল তখন বলল— "ওহে আরব রমণী, তুমি তোমার কাজ থেকে বিরত হও। আমি তোমাকে তোমার পছন্দনীয় সবকিছু দিয়ে সম্মানিত করবো। তুমি কি চাও না আমি তোমার স্বামী হই! আমাকে খ্রিস্টানরা অনেক ভক্তি করে। আমার রয়েছে অনেক ভূমি, অনেক সম্পদ ও অনেক পশু। আর সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকটও আমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আমার সবকিছু তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। তুমি কি দামেস্কবাসীর নেত্রী হতে চাও না! অনুরোধ করছি তুমি নিজেকে ধ্বংস করো না।" তার কথার উত্তরে খাওলা ﷺ বললেন, "অভিশপ্তের ছেলে অভিশপ্ত! আমি সুযোগ পেলে তোমার গর্দান উড়িয়ে ছাড়ব। আল্লাহর কসম, আমি তো তোমাকে আমার উটের রাখাল হিসেবেও পছন্দ করবো না, সেখানে তোমাকে কীভাবে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করি!" খাওলার একথা শুনে বুত্রোস রাগান্বিত হয়ে তার সৈন্যদের নির্দেশ দিলো চতুর্দিক থেকে নারীদের ওপর তীব্রভাবে আক্রমণ চালাতে।

কাফিরদের সেই আক্রমণ তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে প্রতিরোধ করছিল। এমন সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ মুজাহিদদের নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। দূর থেকে ধুলোবালি দেখে ও তরবারি ঝলকানী শুনে সাথিদের বললেন, “রোমানদের অবস্থা কে জেনে আসতে পারবে?” রাফে বিন উমাইরা আততাঈ তাদের অবস্থা জেনে আসার জন্য সম্মত হলেন এবং জেনে এসে খালিদ ﷺ–কে বললেন, “আমালিকা ও তুব্বা'য়িয়া বংশের নারীগণ মরণাপন্ন যুদ্ধে লিপ্ত।”

খালিদ ﷺ–এর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী দ্রুত নারীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং তাঁদেরকে মুক্ত করার জন্য চর্তুদিক থেকে রোমান সৈন্যদের আক্রমণ করেন। তখন খাওলা ﷺ চিৎকার দিয়ে বললেন– “ওহে তুব্বা বংশের নারীরা! কা'বার মালিকের কসম, তোমাদের জন্য সাহায্য চলে এসেছে।” এরপর খাওলার সাথে বুত্রোসের অনেক বাক্য বিনিময়ের পর খাওলা ﷺ ও তাঁর ভাই দিরার মিলে আল্লাহর দুশমন বুত্রোসকে হত্যা করলেন। শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। মুসলমানরা শত্রুদের ওপর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর দেখা গেল রোমানদের তিন হাজার সৈন্য খতম! হামেদ বিন আমের আল ইয়ারবুঈ বলেন, “আমি সেদিন দিরারকে ত্রিশজন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করতে দেখেছি। আর খাওলা ﷺ কে পাঁচজন ও আফরা বিনতে গিফার ﷺ কে চারজন শত্রু হত্যা করতে দেখেছি।”

....

২. হতে হবে বজ্রসম

বর্তমানে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট পুরোপুরিই ইসলামের বিপরীত। কেউ দ্বীনি লেবাস আপন করে নিলেই তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে সমাজ। দ্বীন যেন কেবল মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিংবা ৭০ বছরের বুড়ো-বুড়িদের জন্যই! জেনারেল পড়ুয়া কোনো যুবক দাড়ি রাখলে, টাখনুর ওপর পাজামা পরলে বা কোনো যুবতি হঠাৎ নিকাব-হাত-পা মোজা পরিধান করা শুরু করলেই ব্যস! অকাজের মানুষগুলোর গোবর-মগজে উঁকি দিতে থাকবে হাজারো প্রশ্ন। দ্বীনের এই লেবাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হয় অনেক কষ্ট করে। দ্বীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সাধারণ ইসলামিক বইটা পর্যন্ত ঘরে রাখা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। এমনই এক বিষময় সমাজে আমরা টিকে আছি আল্লাহর ইচ্ছায়। অনেকেই হেনস্তার শিকার হয় অকারণে, বিনা দোষে। এই হেনস্তার হার অবশ্য নারীদের তুলনায় পুরুষদের বেশি। বিশ্বব্যাপি প্রতিনিয়ত গুম হচ্ছে, কারাগারে বন্দি হচ্ছে ইসলামের পথে একনিষ্ঠ ঝান্ডাবাহী আলিম ও দ্বীন মেনে চলা সাধারণ মানুষগণ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটও অভিন্ন। হক কথা

বলতে মানা এই সমাজে। তবু এত বাধা-বিঘ্নের পরও বীরের বেশে দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে নিজের বুকের তাঁজা রক্ত উৎসর্গ করার মানসিকতা রাখেন অনেকেই।

বর্তমান প্রেক্ষিতে মুসলিমরা শোষিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। এমতাবস্থায় উম্মাহর জন্য উমার বিন খাত্তাব, খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো মানুষ প্রয়োজন। প্রয়োজন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মতো লড়াকু পুরুষ। তাহলেই তো এই উম্মাহ আবার মাথা চাড়া দিয়ে জাগবে। তাহলেই সম্ভব হবে সমস্ত কুফরের মস্তকে বাঁকা তলোয়ারের আঘাত হানা। তার অর্থ কি এই দাঁড়াচ্ছে যে, উম্মাহর জেগে ওঠার পিছনে কেবল পুরুষেরা বাহবার অধিকারী? না, এর পিছনে নারীদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর তা হচ্ছে নিজেদের পুরুষদেরকে প্রেষণাদান। সমাজ কখনই মুসলিমদের জন্য অনুকূল ছিল না। ভবিষ্যতেও কখনো মুসলিমদের জীবনে শান্তি নেমে আসবে না যদি না আমরা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। তাই নিজে দ্বীনের আহকামসমূহ পালনের পাশাপাশি অন্যদেরকে দ্বীনের দা'ওয়াহ দিতে হবে, অন্যদেরকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। হক্ব কথার প্রচার-প্রসার করতে হবে। এতে বিপদ আসবে জীবনে অন্ধকার ছায়ার মতো। কত নারী-পুরুষ কারাগারের নির্মম প্রকোষ্ঠে নিষ্পেষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, কেবল রবের ওপর পরিপূর্ণ ঈমান আনার কারণে। তাই বলে কি দ্বীন ছেড়ে দেবে? তা কি সম্ভব?

একজন দ্বীনদার পুরুষ যখন কারা-জীবন আলিঙ্গন করে নেয় তখন তার মা-স্ত্রীর ওপর দিয়ে কি ঝড় প্রবাহিত হয় তা কেবল মা'বুদ আর তাঁর সেই বান্দাগণই জানেন। একজন দ্বীনদার নারী কারাগারে কতটা কুরবানি দিয়ে যান, রবের সামনে দাড়িয়ে তার মধ্যরাতের অশ্রুই সেটা বলে দিতে পারে। রব যদি বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলে আর এমন যদি হয়েই যায়, অবশ্যই সবর করতে হবে, আর সত্যিকার অর্থেই নারীদেরকে সবর শেখানোর কিছুই নেই, এটা তো তাদের সহজাত। ঈমানের ওপর মজবুত থাকা কাম্য, কারাগার মন্দ কিছু না যদি সেটা হয় দ্বীনের জন্য। আমাদের পূর্বসূরিদেরকে দেখলেই আমরা সেটা আঁচ করতে পারি। নিশ্চয় সবরের পর সুমিষ্ট কিছুই অপেক্ষা করছে। প্রিয়, জান্নাতে জান্নাতি পরিবারদেরকে কেউই আলাদা করতে পারবে না, সেখানে তো কারাগার বলে কিছু নেই...

আল্লাহ ﷻ—এর বিধানকে সমুন্নত রাখতে, মুসলিম ভাই-বোনদের রক্তের হেফাজত করতে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ—কে যারা অপমান করবে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য একজন মুসলিম পুরুষ সর্বদা প্রস্তুত থাকবে এটাই মুসলিমের ফিতরাহ হওয়া চাই। আর শরী'আতের দিক থেকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তা অনেক সময় ফরযের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় রবের আহ্বানে বান্দার সাড়া দেওয়ার মাঝে অন্তরায়

হয়ে দাঁড়াতে পারে তার নিজের চক্ষুশীতলকারী স্ত্রীটি, যাকে সে তার জীবনের চেয়ে অধিক ভালোবাসে, যেই স্ত্রীর প্রতি তার মুহাব্বাত শৃঙ্গসম। পদস্খলনের জন্য স্ত্রীর একটি বাক্য; 'যেয়ো না'—ই যথেষ্ট

কিন্তু মুসলিমাহ নারীদের উচিত নিজের আবেগের ওপর আল্লাহর ইচ্ছা ও উম্মাহর খইরকে প্রাধান্য দেওয়া। এটাই তো বিশ্বাসের দাবি, বিশ্বাসীদের সিফাত। তাই স্বামীকে সর্বদা আশ্বাস দিয়ে যেতে হবে, সময় যখন আসবে তখন সে যাতে উম্মাহর সিংহ হয়ে লড়ে যেতে পারে, যাতে রক্ত বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না করে। এই দুনিয়ার কিই বা দাম? জান্নাত তো তাদের জন্য অপেক্ষমাণ যারা আল্লাহর সন্তুটির জন্য দুনিয়াবি সুখকে পা দিয়ে ঠেলে দিয়েছে।

৩. সন্তানকে বীর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

আমরা সালাফদের জীবনী পড়েছি। টুকরো টুকরো অনেক গল্পের মাধ্যমে জেনেছি যে, তাদের বড় করে তোলার পিছনে কেমন ছিল তাদের মায়েদের অবদান। তাদেরকে বীরের সজ্জায় কীভাবে সাজিয়েছেন তাদের মায়েরা। আমাদের সমাজে আজ এমন নারীর খুব প্রয়োজন যাদের জঠোরে সালাহউদ্দীনের মতো বীরেরা জন্মাবে। যারা মানসিকতা রাখবে অধিক সন্তান প্রসবের মাধ্যমে উম্মাহর সংখ্যাধিক্য ঘটানোর। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগ থেকেই মা চিন্তিত থাকবে কীভাবে সন্তানকে আসন্ন ফিতনার টর্নেডো থেকে রক্ষা করা যায়। কীভাবে তাকে এই সমাজের আবর্জনাগুলো দূর করার জন্য গড়ে তোলা যায়। কীভাবে সন্তানের বুকে যোদ্ধার বর্ম জড়িয়ে দেওয়া যায়। মায়েদের মন-মগজে যেন একটা বিষয়ই ঘুর-পাক খেতে থাকে— ছোট্ট শিশুটা, মায়ের তর্জনী ধরে দাঁড়ায়, আঙুল ছেড়ে দিলে ভুলণ্ঠিত হয়, এভাবেই একদিন সন্তান শিখবে, শিখতে শিখতে একদিন সে আল্লাহর সৈনিক হয়ে তলোয়ার হাতে নেবে। সন্তানেরা শৌর্যে-বীর্যে বলবান হয়ে উঠবে মায়েরই কোমল আঁচলতলে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি আসন্ন। দিন যত গড়াচ্ছে পরিস্থিতি ততই আঁধার রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে পরিণত হচ্ছে। সেই নিদান অন্ধকারে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে মশাল ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব মায়েদেরই। এজন্য প্রয়োজন সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি, প্রয়োজন সন্তানের সঠিক তারবিয়াত।

৪. সন্তানের তারবিয়াত

একটা সময় নারীর সমস্ত স্বপ্ন জন্ম নেয় তার স্বামীকে ঘিরে। নানান বাধা-বিপত্তি পার হয়ে সে অবশেষে তার স্বামীকে খুঁজে পায়। এরপরেই নারীর জীবনের আরেকটি মোড় এসে হাজির হয়। যেখানে সে রাজকুমারী থেকে পরিণত হয় রানিতে। নানান দায়িত্ব

চলে আসে তার কাঁধে। কারণ সে তখন *রাব্বিয়াতুল বাইত।* একটা সময় তার জীবনে নতুন আরেক স্বপ্নের সংযোজন ঘটে। অন্তরে তখন মা হওয়ার তাড়না জাগে। ছোট্ট কোনো শিশু নজরে আসলেই তার স্বপ্নগুলো আরো প্রকট হয়ে কাছে এসে হাতছানি দিতে থাকে। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের নিমিত্তেই তার জন্য শুরু হয় আরেক নতুন প্রস্তুতি। তবে সন্তানের তারবিয়াত বা প্যারেন্টিং এর শুরুটা সন্তান জন্মেরও অনেক আগে থেকেই শুরু করা উচিত।

◈ **সন্তানের বাবা নির্বাচন-** সন্তানের তারবিয়াতের প্রস্তুতির শুরুটা হওয়া উচিত বিয়ের আগ থেকেই। কারণ বিয়ের মাধ্যমে নারীরা পরোক্ষভাবে তাদের আসন্ন সন্তানের বাবাকেই নির্বাচন করে। সেক্ষেত্রে সন্তানের বাবা নির্বাচনের বেলায় তাঁর দ্বীনদারিতার পাশাপাশি পিতা হিসেবে অন্যান্য বিষয়গুলোও মাথায় রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ সন্তানের বাবার বিবেক-বুদ্ধি, মহানুভবতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শক্তি-সামর্থ্য, শারীরিক গঠন, বিচক্ষণতা ইত্যাদি। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, (দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশি প্রিয়।[৭]

◈ **মায়ের মা হওয়ার আগের প্রস্তুতি-** বিয়ের পরে প্রত্যেকটা নারীর অন্তরে শিশুদের প্রতি এক পরম আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এ আগ্রহ থেকেই তারা অতি দ্রুতই তাদের মা হওয়ার স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সময়টাতে একজন নারীর অনেক পড়াশোনা করা উচিত সন্তানের তারবিয়াত নিয়ে। সেই সাথে নিজে নিজে আগে ভাগেই জল্পনা-কল্পনা করে রাখা উচিত যে আদরের সন্তানকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলতে ভবিষ্যতে সে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এতে সামনে পথচলা সহজ হবে। তাই সন্তানের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই তাকে নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় নেওয়া উচিত।

◈ **তারবিয়াতে অপরিপক্কতা-** সন্তানের সঠিক তারবিয়াত মহৎ এবং বৃহৎ একটা বিষয়। তাই হুট করেই সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্তে আসাটা বোকামি। এই সিদ্ধান্তে পৌছাবার আগে মা বাবাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে এ বিষয়ে। সন্তানের সাইকোলোজি, ইসলামী আলোকে মা-বাবার দায়িত্ব প্রতিটা বিষয় তাকে বুঝে নিতে হবে। এ ছাড়াও দ্বীনদার নারী এবং পুরুষেরা সাধারণত অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এর ফলে অনেকের মাঝে সাংসারিক বিষয়ে বেশ অপরিপক্কতা রয়েই যায়। মা-বাবা বুঝতেই পারে না সন্তান প্রতিপালনে কে-কীভাবে-কী দায়িত্ব পালন করবে। একদিকে বাবা বুঝতে পারে না বাচ্চার মায়ের এখন কী প্রয়োজন, অপরদিকে মা ভুগতে থাকে এই কষ্টে যে, তার স্বামী কেন তাকে বুঝে না। তাই সন্তান নেওয়ার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর

[৭] বুখারি- ২৬৬৪; ইবন মাজাহ- ৭৯, ৪১৬৮; মুসনাদে আহমাদ- ৮৫৭৩, ৮৬১১

মাঝে পারস্পরিক সমঝোতারও প্রয়োজন রয়েছে। সন্তান হওয়ার পর উভয়ের করণীয়, সন্তানের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আগে থেকেই আলোচনা করে একে অপরকে বুঝিয়ে দেওয়া, তারবিয়াতের জন্য পরিকল্পিত পদক্ষেপগুলো একে অপরের সাথে আলোচনা করা ইত্যাদি বিষয়ে উভয়ের মতের মিল দরকার। এই কারণে স্বামী ও স্ত্রীর বুঝের উপর নির্ভর করে বিয়ের পর থেকে সন্তান নেওয়া পর্যন্ত কমপক্ষে দেড়-দুই বছর সময় নেওয়া যেতে পারে।

❖ **ভালোবাসায় ছেদ-** একজন দ্বীনি পুরুষ হাজারো ফিতনা অতিক্রম করে তার জীবনসঙ্গীকে খুঁজে পায়। এ অবস্থায় বিয়ের পরে নারীদের উপর অনেক দায়িত্ব চলে আসে তার স্বামীর চরিত্রকে হিফাজতের জন্য। বিয়ের পরে পরিপূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে স্বামীকে আগলে রাখতে হবে। কিন্তু এ ভালোবাসায় ছেদ পড়ে তখনই যখন তাদের মাঝে আরেকটা ছোট্ট ভালোবাসা এসে সেখানে ভাগ বসায়। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর পুরুষেরা সর্বোক্ষণ তাদের স্ত্রীদেরকে কাছে পেতে চায়। কিন্তু সন্তানকে সময় দিতে গিয়ে যখন তার স্ত্রী তাকে সময় দিতে না পারে তখন সেটা পুরুষদের জন্য মানসিক অবসাদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনকি ফিতনায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এ কারণে সন্তান নেওয়ার পরও স্বামীর চাহিদার দিকে স্ত্রীর যথেষ্ট নজর দিতে হবে। একজন আরেকজনকে অধিক জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। সন্তান দুনিয়ায় এসে পড়ার পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য সময় বের করে আনা কিছুটা কঠিন। তাই বিয়ের পর থেকে সন্তান নেওয়ার আগ পর্যন্ত পরস্পরকে বোঝা ও জানার মোক্ষম সময়। নিজেদের একান্ত কিছু মুহূর্তের জন্য সময় হাতে রাখা উচিত। তারপর যখন নিজেরা একে অপরের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে তখন তাদের আরেক আদুরে ভালোবাসাকে আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীতে স্বাগত জানানো যেতে পারে।

❖ **গর্ভে প্রাণের সঞ্চার-** অনেক প্রহর গুনতে গুনতে রাব্বে কারিমের ইচ্ছাতে ইউরিন স্ট্রিপে ডাবল দাগের দেখা মিলে। স্বামী-স্ত্রীর জন্য সেদিনটি পরম আনন্দের। এদিকে শুরু হয়ে যায় মায়েদের আসল দায়িত্ব নেওয়ার পালা। সন্তানকে দ্বীনের ছাঁচে ঢেলে প্রকৃত অর্থে মানুষ করার শুরুটা গর্ভকাল থেকেই আরম্ভ হোক—

◆ এ সময়টা মায়েদের জন্য খুবই দামি এবং নাজুক একটি সময়। গর্ভাবস্থায় মায়েদের জন্য আমলে অধিক মশগুল হওয়া উচিত। দৈনিক ফরয, সুন্নাহ সলাতের পাশাপাশি কিছু নফল আমলও বাড়ানো যেতে পারে।

◆ পূর্বে যাই-ই হোক না কেন গর্ভাবস্থায় এসে আমলে আর কোনো হেলা করা যাবে না। কারণ তার এই সময়টাতে সে যা আমল করবে এর প্রভাব তার সন্তানের ওপরও

পড়বে। গর্ভাবস্থায় মায়েদের বেশিরভাগ সময় কুরআন পাঠে মশগুল থাকা উচিত। পড়তে না পারলে তিলাওয়াত শোনাও যেতে পারে। চার মাসের মাথায় ছোট্ট দেহটাতে আত্মার সঞ্চার ঘটে। তখন তারা শ্রবণশক্তি অর্জন করে। এই সময় থেকেই যদি তাকে সারাক্ষণ কুরআন শোনানো হয় তাহলে জন্মের পূর্ব থেকেই আল্লাহর ইচ্ছায় তার অন্তরে কুরআন গেঁথে যাবে।

◆ অনেক মায়েরা চিন্তা করতে থাকেন যে, তারা অসুস্থ এখন কিছু করা যাবে না। অথচ এ সময়কে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। কেননা এটি স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরবর্তীতে আমরা জানতে পারব ইন শা আল্লাহ।

◆ অনেক মায়েরাই এ সময়ে শয়তানের নানান ওয়াসওয়াসায় ভুগে। কারণ দুর্বল সময়গুলোতে শয়তান সুযোগ নেওয়ার চেষ্টায় থাকে। শয়তান নানানভাবে দুর্বলতার অজুহাত দেখিয়ে মায়েদেরকে আমল থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে এবং নানাভাবে অন্তরে হতাশা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। তাই এই সময়ে মায়েদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা চিনতে হবে। সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন জিকিরগুলো নিয়মিত করতে হবে। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে নিজের ওপর রুক্কিয়াহও করা যেতে পারে।

◆ এ সময়ে বাবা-মা উভয়েরই নিজেদের মাঝে সকল অশুদ্ধ বাচ্য, অহেতুক কথা এবং কাজ বর্জন করার অনুশীলন এখন থেকেই করতে হবে।

◆ অনেকের বাসায় টিভি থাকে। এই সময়ে টিভির ঘর থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

◆ শয়তানের ফাঁদে পড়ে বাজনাওয়ালা গান, ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে।

◆ সম্ভব হলে বেশি বেশি সিয়াম এবং সাদাকার মাধ্যমে সময়গুলোকে আরো মূল্যবান করে তোলা যেতে পারে।

◆ গর্ভাবস্থায় দু'আর কোনো বিকল্প নেই। এই সময়টাতে সন্তানের সুস্থতা, তার ভবিষ্যতের জন্য অধিক দু'আ করে যেতে হবে।

◆ **আঁদুরের আগমন-** হঠাৎ আঁদুরে সোনার পৃথিবী দেখার প্রবল ইচ্ছাকে আর কিছুতেই দমিয়ে রাখা গেলো না। মায়ের গর্ভ থেকে সজোরে এক চিৎকার দিয়ে ছুটে বের হয়ে এলো পৃথিবী দেখবে বলে। মা বাবার জন্য আরো এক আনন্দের দিনের সংযোজন ঘটে এভাবেই। সন্তানকে ঘিরে শুরু হয় তাদের পূর্বের সকল প্রস্তুতির বাস্তব প্রয়োগ—

◆ শিশুদের সামনে খুব সংযত হয়ে থাকতে হবে যাতে তারা কোনো খারাপ কিছুর সম্মুখীন না হয়। স্বামী-স্ত্রীদের নিজেদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ বন্ধ করতে হবে। এগুলো সন্তানদের ওপর ছোটকাল থেকেই কুপ্রভাব ফেলে। সন্তান যখন সামান্য বুঝতে শুরু

করবে তারও আগ থেকেই বাবা মায়ের উচিত সন্তানদের সামনে সুন্দর, শুদ্ধ ও সাবলীল ভাষায় কথা বলা।

◆ সন্তানের সামনে বাবা মায়ের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটানো কঠিনভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

◆ অনেক সময় মায়েরা সন্তানের সামনেই পোশাক পরিবর্তন করতে শুরু করে কিংবা ওড়না ছাড়া অবস্থান করে। এ বিষয়গুলো মায়েদের কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে। কারণ তারা বাচ্চা বলে কিছু বুঝেনা বিষয়টা আসলে এমন নয়। ওরা যা দেখে তা ওদের অবচেতন মনে ঠিকই থেকে যায় এবং এগুলোর প্রভাব পড়ে পরবর্তীতে। তাই এই সময় থেকেই উক্ত ব্যাপারাগুলোতে সাবধান থাকতে হবে।

◆ গান, মিউজিক, কার্টুন ইত্যাদির সাথে কোনোভাবেই সন্তানকে সাক্ষাৎ করানো যাবে না। এ ব্যাপারে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের আগে থেকেই বোঝাতে হবে।

◆ শিশুকে খাওয়ানো এবং ঘুম পারানোর সময় অনেক মায়েরা মোবাইলে কার্টুন, গান ইত্যাদি ছেড়ে দেন। কিন্তু এসকল অন্তঃস্বারশূণ্য কার্টুন বাচ্চাদের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলে। কার্টুন দেখতে দেখতে এসবের প্রতি বাচ্চাদের অতি আকর্ষণ তার দ্বীন মানার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এছাড়া বাচ্চারা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতি খুব সহজেই আসক্ত হয়ে যায়। ফলে মানুষদের সাথে কথাবার্তা, চলাচল ও উঠাবসা বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে শৈশবকাল থেকেই তারা অন্তর্মুখী হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে এটি শিশুর কথা বলা শেখার পথে বাঁধাও হয়ে দাঁড়ায়।

◆ ছোট্ট বয়স থেকেই মায়েদের উচিত বাচ্চাকে সকল কিছু সুন্নাহ মেনে করানোর। যেমন- কার্টুন জাতীয় চেহারাওয়ালা পোশাক কঠোরভাবে পরিহার করা, সকাল বিকাল এবং ঘুমানোর জিকিরগুলো বাচ্চাকে শুনিয়ে শুনিয়ে করা, প্রতিটা কাজের আগে এবং পরের দু'আগুলো বাচ্চাকে শুনিয়ে পড়া, গোসল করানোর সময় সুন্নাহ মেনে বাচ্চাকে ওযু করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, ছেলে বাচ্চা হলে প্যান্ট টাখনুর উপরে পরানো, মেয়ে বাচ্চা হলে বাইরে বের হওয়ার সময় হিজাব পরানো ইত্যাদি অভ্যাস ছোটকাল থেকেই গড়তে হবে।

◆ কারো সামনে ছেলে বা মেয়ে শিশুকে প্যান্ট ছাড়া কিংবা খালি গায়ে রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

◆ স্বলাত এবং কুরআন পড়ার সময় বাচ্চাকে সামনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করা উচিত যাতে তার অন্তরে এই বিষয়গুলো ছোটকাল থেকে গেঁথে যায়। বাচ্চা বিরক্ত করুক তারপরও যতটুকু সম্ভব এ সময়গুলোতে বাচ্চাকে কাছে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

❖ বেড়ে ওঠা- ছোট্ট ছোট্ট পায়ে আগাতে আগাতে সে বড় হতে থাকে। তাকে ঘিরে যত প্রস্তুতি সেগুলোও যেন কমতে থাকে। কিন্তু বেখেয়াল হয়ে পড়লে চলবে না। এই ভয়াবহ ফিতনার জামানায় নিজের সন্তানকে পবিত্রতার চাদরে আগলে রাখা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তবুও বাবা-মায়েদের এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। একেবারে শিশু বয়স থেকেই যে অভ্যাসগুলো গঠন করা হয়েছিল সেগুলোর পাশাপাশি এই বেড়ে উঠার সময়গুলোতে আরো বেশ কিছু বিষয়ের সংযোজন ঘটে। কারণ এ সময় সন্তান আর শিশু থাকে না। সে অনেক কিছু বুঝতে শিখে এবং অতিরিক্ত অনেক কিছু করার সামর্থ্য তৈরি হয়। এজন্য সন্তান কি শিখছে এবং কি করছে সে বিষয়ে বাবা-মায়ের সম্যক অবগত থাকতে হবে।

• প্রথমত সন্তানের সাথে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে মাঝে মাঝে সন্তানদের সাথে নিজেদেরও বাচ্চা হয়ে যেতে হবে। যেমন: সন্তানের সাথে খেলাধুলা করা, সন্তানের অপ্রয়োজনীয় কথাগুলোও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে জবাব দেওয়া, মাঝে মাঝে নিজেও সন্তানের সাথে নানান গল্প করা ইত্যাদি। যাতে সে বুঝতে পারে যে তার মা বাবা তাকেও অন্যান্যদের মতোই গুরুত্ব দেয়। তাকে বোঝাতে হবে সেও বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। তাকে বোঝাতে হবে যে, তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুটি হচ্ছে তার মা অথবা বাবা। যেকোনো বিষয় অন্য কাউকে বলার আগে তার মাকে যাতে নির্দ্বিধায় বলতে পারে, তাকে সেরকম পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে।

• সন্তানের সাথে গল্প করার ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে যে, গল্পের বিষয়বস্তু যাতে শিক্ষনীয় হয়। যেমন: কুরআনের ঘটনাসমূহ, নবী-রাসূলদের জীবনী, সাহাবা-সাহাবিয়াতদের জীবনী, ইমাম-সালাফ-খলাফদের জীবনী, পূর্ববর্তী আলিমদের বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদি। পাশ্চাত্য সমাজে ওয়াল্ট ডিসনি, ঈশপের গল্প ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচলিত যা থেকে সন্তানের নৈতিক শিক্ষা অর্জন অভাবনীয়। এমনকি অনেক সময় এসব গল্প কাহিনীর মাঝে কুফরী-শিরকি ধারণা, অশ্লীলতা, অবাধ্যতা ইত্যাদি প্রচার করা হয়। তাই সেগুলো অবশ্যই বর্জনীয়।

• আদর এবং বন্ধুত্বের সাথে মায়ের রাগী চেহারাটাও যাতে তার স্মৃতিতে থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যাতে সে মা-বাবার মূল্যায়ন করতে ভুলে না বসে। সেজন্য প্রয়োজন মাফিক শাসনও করতে হবে। সরাসরি প্রহার করা থেকে যতটা বিরত থাকা যায় ততই উত্তম। ভুল করলে ভেবে চিন্তে এমন শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে যেই শাস্তিগুলোর মাঝে শিক্ষা রয়েছে।

◆ বাচ্চাকে সময়মতো বুকের দুধ ছাড়াতে হবে। আর যখন বাচ্চার মস্তিস্কের মোটামুটি উন্নতি হয়ে যায় তখন থেকে দুগ্ধপান করানোর সময় কক্ষ অন্ধকার করে বা বাচ্চার চোখের উপর কোনো কাপড় রেখে দুধপান করানো যেতে পারে। কেননা, অধিকাংশ শিশুর ক্ষেত্রে নারীদের বক্ষের বিষয়ে ধারণা আসে মায়েদের থেকেই। আর সেই ধারণা থেকেই খুব অল্প বয়স হতেই বাচ্চাদের মাঝে নারীদের বক্ষের প্রতি একটা কৌতূহল কাজ করতে শুরু করে।

◆ সন্তানেরা বড় হলে তাকে ইবাদাতের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। তাদের জন্য মা-বাবা বাসার ভিতরের কোনো একটা জায়গায় মাসজিদের মতো বানিয়ে দিতে পারে। আর সেই জায়গাটা থাকবে কেবল তাদেরই অধীনে। ছোট্ট জায়নামায, ছোট্ট মুসহাফ দিয়ে সেই ঘরটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। যাতে বাচ্চারা সেই ঘরে অধিক সময় ব্যয় করতে আগ্রহী হয়।

◆ ছোট্টকাল থেকেই মা বাবার উচিত সন্তানের জন্য একটি আলাদা কক্ষ নির্ধারণ করে দেওয়া। আলাদা থাকার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। বাচ্চাকে আলাদা ঘুমানোর অভ্যাস তৈরি করাতে হবে খুব ছোট থেকেই। তিন/চার বছর বয়স থেকেই বাচ্চার জন্য সেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দশ বছর বয়স হলে হঠাৎ ঘর আলাদা করে দিলে অনেক বাচ্চাদের মেনে নিতে কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে বাবা মা নিজেদের ঘরে খুব ছোট বয়স থেকেই শিশুর জন্য আলাদা আরেকটি কটের (বাচ্চাদের খাট) ব্যবস্থা করতে পারে। নিজেদের শোবার খাটের পাশে সেটি স্থাপন করবে, যাতে সর্বোক্ষণ চোখে চোখে রাখা সম্ভব হয়। এভাবে আস্তে আস্তে তাকে তার কক্ষে স্থানান্তর করতে হবে। তার ঘরটা যথাসম্ভব আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে যাতে সে তার ঘরে ঘুমাতে আগ্রহী হয়।

◆ বাচ্চাকে খেলাধুলার পরিবেশও দিতে হবে। মা বাবার খুব কাছের দ্বীনি ভাই-বোন যাদের নিজেদেরও সন্তান রয়েছে এমন ভাই-বোনের সন্তানদের সাথে খেলার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

◆ ছেলে এবং মেয়ে নির্জনে একত্রিত হয়ে যাতে খেলাধুলা না করতে পারে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এমনও কিছু ঘটনা খবরের কাগজে আসে যেখানে খুব অল্প বয়সেই শিশু তাদের বিপরীত লিঙ্গের কোনো বাচ্চার সাথে অস্বাভাবিক যৌন আচরণ করে।[৮]

৮] www.kalerkantho.com/amp/online/lifestyle/2020/01/23/866046

◆ বাচ্চাদেরকে ছোট্টকাল থেকেই যুহদ তথা, দুনিয়ার প্রতি বিমুখিতা এবং অপচয় না করার বুঝ দিতে হবে খুব সুন্দরভাবে। অপ্রয়োজনীয় কিছু কিনতে চাইলেই তাকে যুহদ এবং অপচয়ের বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে থামাতে হবে। আর এই বিষয়গুলোই পরবর্তীতে তার জীবনের প্রতি পরতে পরতে কাজে আসবে ইন শা আল্লাহ।

সন্তানের সঠিক ও সুষ্ঠ তারবিয়াতের উপরই নির্ভর করছে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ও এই উম্মাহর বিজয়। তাই সন্তান প্রতিপালনের মতো জীবনের এই অবিচ্ছেদ্য অংশকে হেলা না করে তাদের পিছনে সময় ব্যয় করুন। তাদের শারীরিক, মানসিক উন্নতির পাশাপাশি আত্মারও পরিচর্যা করে যান আত্মার মালিকের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী। সন্তানদের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করুন, পরিচর্যা করুন, তার পিছনে শ্রম দিন। শ্রম বিসর্জন শেষে গভীর রাতে মুসল্লায় বসে রবের সামনে দুটি রিক্ত হাত তুলে অশ্রুসিক্ত নয়নে দু'আ করুন– "ইয়া রব, আমাদের ও আমাদের সন্তানদের অন্তরে ঈমানের অঙ্কুরোদগম ঘটিয়ে দিন......"

||১৮তম দারস||



মেডিকেলঃ গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সচেতনতা

নারীদের জীবনে গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত নাজুকও। তাই সেই সময়ে কোনো মতেই অসচেতন থাকা যাবে না। সামান্য অসচেতনতা নিজের জন্য এবং সন্তানের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। আমাদের জানতে হবে যে, গর্ভকালীন সময়ে কি কি করতে হয় আর কিই বা করা যায় না।

১. গর্ভাবস্থায় মায়েদের প্রস্তুতি

◆ কোনো মাসে হায়েয না হলে ইউরিন টেস্টের মাধ্যমে গর্ভে সন্তান এসেছে বলে জানা গেলে প্রথম কাজ হচ্ছে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। প্রথম ভিজিটের পরীক্ষাগুলো (হিমোগ্লোবিং লেবেল টেস্ট, ব্লাড সুগার লেবেল টেস্ট, থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট, আলট্রাসনোগ্রাফসহ ৭-৮টি টেস্ট) গুরুত্বের সাথে করা উচিত।

◆ হাইরিক্স প্রেগন্যান্সি বা উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন গর্ভাবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে ডাক্তারের দেওয়া আল্ট্রাসনোগ্রাফি দেখেই ডাক্তার প্লাসেন্টার পজিশন সম্পর্কে বলে দেবেন। প্ল্যাসেন্টা গর্ভাবস্থায় জরায়ুতে বিকাশ লাভ করে। এটি গর্ভে ক্রমবর্ধমান শিশুর জন্য অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে এবং শিশুর রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে দেয়। প্লাসেন্টা গর্ভের উপরে অবস্থান করলে সেটা নরমাল। কিন্তু যদি তা গর্ভের নিচে অবস্থান করে তাহলে তা হাইরিস্ক প্রেগন্যান্সির লক্ষণ। একে 'প্লাসেন্টা প্রিভিয়া' বলে। এ ছাড়াও হাইরিস্ক প্রেগন্যান্সির আরও কিছু অবস্থা রয়েছে, যা ডাক্তার টেস্ট রিপোর্ট দেখে বলবেন। এসময় সহবাস থেকে দূরে থাকা ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা উচিত।

২. ট্রাইমেস্টার

গর্ভাবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা: **ফাস্ট ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার, থার্ড ট্রাইমেস্টার।**

◈ ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার (প্রথম তিন মাস)

- খাওয়া-দাওয়ায় সতর্ক থাকা, ফলিক এসিড ও জিংক ট্যাবলেট খাওয়া;
- এই সময়ে সহবাস থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ এতে গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে;
- সাধারণ কাজগুলো করা তবে ভারী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, এতে মানসিক চাপ নেওয়া যাবে না;
- অতিরিক্ত চিন্তা না করে সবকিছু আল্লাহর কাছে সপে দিতে হবে। বারবার দু'আ, রুক্বইয়াহ, ইস্তেগফার করতে হবে;
- হাইরিস্ক প্রেগন্যান্সি হলে দু'আ করতে হবে যাতে নরমাল ডেলিভারি হয়। দৃঢ় তায়াক্কুল, উত্তম সবর, আল্লাহর উপর সুধারণা রেখে দু'আ করলে আল্লাহ দু'আ কবুল করবেন ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ চাইলে নরমাল ডেলিভারি হওয়া অসম্ভব কিছুই না তাই প্রবল সুধারণা এবং পাশাপাশি তাহাজ্জুদ, দু'আ কবুলের বিশেষ সময়গুলোতে বেশি বেশি দু'আ করে যেতে হবে;
- দিনে ১০-১২ গ্লাস পানি পান করা, কচুর লতি, শাক (রক্তশূন্যতা পূরণে সাহায্য করে), ফলমূল, সবুজ শাকসবজি, ২ গ্লাস করে দুধ ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে;
- এসময় অনেকের বমি হয়। তাই খাবার একবার না খেয়ে অল্প অল্প করে খাওয়া যেতে পারে;
- বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, খাওয়ায় অরুচি—এসব বিষয়গুলো এই সময়টায় বেশি হয়। একেই বলা হয় Morning Sickness। এই বিষয়গুলো আগে থেকেই পরিবারের লোকদের বিশেষ করে স্বামীর জেনে রাখা জরুরি। গর্ভকালে নারীদের ঘন ঘন মেজাজ পরিবর্তন (Mood Swing) হয়ে থাকে। অনেকেই বেশ খিটখিটে স্বভাবের হয়ে ওঠেন ও বিষণ্ণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

◈ সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার (দ্বিতীয় তিন মাস)

- এসময় ডাক্তার হিমোগ্লোবিন টেস্ট ও আলট্রাসনোগ্রাফ করতে বললে সেগুলো গুরুত্বের সাথে করতে হবে;

- ৫/৭ মাসে Congential Anamalies চেকআপের জন্য ডাক্তার আলট্রাসনোগ্রাফ করতে দিলে তা করাতে হবে। এর মাধ্যমে বাচ্চার কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা দেখা হয়;
- আয়রন ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট নিয়মিত খেতে হবে;
- এই সময়ে একজন ভালো ডায়ট্রেশিয়ানের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে যাতে মায়ের খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার থাকবে তা জেনে নেয়া যায়;
- গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হলে ব্লাড সুগার লেভেল নিয়মিত টেস্ট করা উচিত। একে Gestational Diabetes বলে। এটা নরমাল, কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় তাই টেস্ট করা জরুরি। এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।

❖ থার্ড ট্রাইমেস্টার (তৃতীয় তিন মাস)

- যাদের নরমাল প্রেগন্যান্সি তারা এই সময়টাতে সহবাসের মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে যেন পেটে চাপ না পড়ে। অবশ্য পুরো প্রেগন্যান্সিতেই সহবাসের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। (প্রথম তিন মাস সহবাস না করাই ভালো);
- এ সময়টাতে অধিক পানি খাওয়া উচিত। নাহলে ইউরিন ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে;
- ডাক্তার এই সময়টাতে একটা আলট্রাসনোগ্রাফ করতে দেয় যাতে বাচ্চার ওজন ও প্লাসেন্টার অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। এটা ৩৭ সপ্তাহের দিকে করতে হয়;
- গর্ভবতী মায়ের ওজন বেশি হয়ে গেলে কিংবা ডায়াবেটিস থাকলেও যদি মায়ের পেলভিস এরিয়া এবং বাচ্চার ওজন ঠিক থাকলে সমস্যা হবে না;
- বাচ্চার মাথার অবস্থান যদি গর্ভের নিচের দিকে না থাকে এবং যদি বাকি সব স্বাভাবিক থাকে, তথা— পেলভিস এরিয়া বা বাচ্চা প্রসবের রাস্তা, বাচ্চার ওজন ইত্যাদি; তাহলে নরমাল ডেলিভারিতে সমস্যা নেই ইন শা আল্লাহ। তবে শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আপনার ডাক্তারই সঠিক বলতে পারবেন;
- ৩৭ সপ্তাহ হয়ে গেলে ডাক্তারের পরামর্শে কিছু প্রিনেটাল এক্সারসাইজ করা ভালো;
- ৩৭ সপ্তাহ পরে নিয়মিত ৭-৮টি খেজুর, পাকা পেঁপে খাওয়া উচিত। এ সময়ে ফলিক অ্যাসিডযুক্ত খাবার মা ও সন্তানের জন্য অধিক প্রয়োজন। এটি শিশুর স্পাইনা বিফিডা (অপরিণত মেরুদণ্ড)-এর মতো জন্মগত

সমস্যাগুলোর আশঙ্কা কমিয়ে আনে। শাক, শিম, মটরশুঁটি, লেবু, কমলা, তরমুজ, কলা ইত্যাদিতে ভালো পরিমাণে ফলিক এ্যাসিড রয়েছে। এছাড়া ভালো ফলমূল, আমিষ, দুধ, ডিম সবই এই সময় মায়েদের খাওয়া উচিত। সন্তানের বুদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে ২০% অবদান সন্তানের তারবিয়াতের ওপর নির্ভর করে। বাকি ৮০% বুদ্ধির বিকাশে অবদান রাখে খাদ্য। অথচ আমরা অনেকেই খাদ্যের দিকে অতটা নজরপাত করি না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার খাদ্য যেমন প্রয়োজন, গর্ভে থাকা অবস্থাতেও তা-ই। তবে অনেকেই গর্ভবতী মায়েদেরকে বলে থাকে যে, সন্তান গর্ভে থাকাকালীন ফলমূল কম খেতে। তাহলে নরমাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এমনটি করা একদমই উচিত নয়। কেননা, এতে পুষ্টিহীনতার অভাবে বাচ্চা অসুস্থ এমনকি মারাও যেতে পারে।

- এ ছাড়া অন্তত আধ-ঘণ্টা করে সকাল-বিকেল হাঁটা ও অন্যান্য সাধারণ কাজ করা যেতে পারে;
- গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে গর্ভকালীন সময়ের শেষের দিকে পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত লোম পরিষ্কার করা, যোনিপথ পরিচ্ছন্ন রাখা, V-care ব্যবহার করা প্রয়োজনীয়। যোনিপথের স্বাভাবিক pH বজায় রাখতে V-care সাধারণ সাবানের চেয়ে অধিক কার্যকর যা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

৩. সন্তান প্রসব

সি-সেকশন বা সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারির অনেকগুলো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। তাই সিজারে ডেলিভারি হলে ডেলিভারির পর অনেক সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। সে কারণে প্রত্যেকের উচিত নরমাল ডেলিভারির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা। তবে কিছু অবস্থা ভিন্ন যেগুলোতে সি-সেকশন ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। যেমন: লেবার পেইন অনেক ঘণ্টা ধরে কিন্তু বাচ্চা উল্টো পজিশনে আছে, অক্সিজেন কমে গেছে, পানি ভাঙার অনেক পরেও পেইন না উঠা ও পজিশন উল্টো ইত্যাদি। এমন অনেক কঠিন পরিস্থিতিতে সি-সেকশন করা লাগতে পারে।

তবে নরমাল ডেলিভারির জন্য নিজেকে আগে থেকেই কাউন্সিলিং করা উচিত। সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দু'আ। আল্লাহর কাছে খুব দু'আ করা উচিত। নিজেকে বোঝাতে হবে যে— আল্লাহ মেয়েদেরকে সামর্থ্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি সাধ্যের চেয়ে অধিক বোঝা চাপান না, তাই আমিও পারবো ইন শা আল্লাহ। প্রথমেই 'পারব না' ভেবে ভয়

পাওয়ার কিছু নেই। এটা একটা সাধারণ প্রক্রিয়া। শতাব্দী ধরে কোটি কোটি মানুষ এভাবেই জন্মেছে। বরং সি-সেকশনই অস্বাভাবিক যদিও তা বর্তমানে ব্যাপক হারে গ্রহণযোগ্য। সি-সেকশন অনেক বড় একটা সার্জারি, নরমাল ডেলিভারির চেয়ে সি-সেকশনই বরং কঠিন। তাই অস্বাভাবিক কোনো কিছুতে যাওয়ার চিন্তা মাথায় আনা যাবে না। আমাদের সার্বক্ষণিক দু'আ করা ও আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা উচিত। আল্লাহর উপর ভরসা করলে তিনি এমনভাবে সহজ করে দেবেন যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারব না।

নরমাল ডেলিভারির জন্য কিছু বিষয় লক্ষণীয়

- গর্ভধারণ কোনো রোগ নয়। এটা স্বাভাবিক, তাই স্বাভাবিক থাকতে হবে;
- সহজ কাজগুলোকে ব্যায়াম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। হাই কমোড বাদ দিয়ে নরমাল কমোড/লো প্যান ব্যবহার করা উচিত। দিনে কমপক্ষে ২/৩ বার নরমাল কমোড ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে নরমাল ডেলিভারির জন্য পেলভিক এরিয়ার মাংসপেশির ব্যায়ামও হয়ে যায় যা নরমাল ডেলিভারির জন্য খুব দরকারি। ভারী কাজ বাদে ঘরের অন্যান্য স্বাভাবিক কাজ করা যাবে;
- হাসিখুশি থাকা, মেজাজ ঠিক রাখা;
- খাবারের দিকে নজর দেওয়া ও নিজের যত্ন নেওয়া;
- চতুর্থ মাস হতে বাচ্চার নড়াচড়া খেয়াল করা দরকার। শেষ সপ্তাহগুলোতে এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা, বাচ্চার নড়াচড়া না থাকলে ডাক্তার দেখানো জরুরি;
- ডেলিভারির পর যত দ্রুত সম্ভব বাচ্চাকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো যা পূর্বেও একাধিক বার উল্লেখ হয়েছে;
- যেসব মায়েদের ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাদের জন্য হাসপাতালে ডেলিভারি করানো আবশ্যক;
- এছাড়া সর্বাবস্থাতেই বাসায় ডেলিভারি না করে হাসপাতালে করানোই উত্তম, বাসায় করালে **পেরিনিয়াল টেয়ার** (যোনিপথ ও পায়ুপথের মধ্যবর্তী স্থান ছিঁড়ে যাওয়া) হওয়ার সম্ভবনা থাকে। পেরিনিয়াল টেয়ার যাতে না হয় এ জন্য হাসপাতালে এপিশিওটমি **(Episiotomy)** করে থাকে।

সন্তান বের হয়ে আসার রাস্তা সংকীর্ণ হলে তা একপাশ থেকে কেটে বড় করে নেওয়া হচ্ছে— এপিশিওটমি। এতে ভয় করার দরকার নেই, এটা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং ইনফেকশনেরও ভয় থাকে না।

❖ *এপিশিওটমি সম্পর্কে কিছু কথা*

- ডেলিভারির পর নিয়মিত হিপ বাথ নেওয়া— কুসুম গরম পানিতে ১ চামচ **পভিসেপ আয়োডিন** মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট পানিতে বসে থাকতে হবে। দিনে ২ বার করে টানা ১ মাস এভাবে চালিয়ে যেতে হবে।
- এতে সহবাস ও মলমূত্র ত্যাগে কোনো সমস্যা হয় না।

❖ *কখন সি-সেকশন বা সিজার করতে হবে*

- বাচ্চার মাথা কোনমতেই নিচে না নামলে;
- পানি ভেঙে গেলে ও বাচ্চার পজিশন ঠিক না থাকলে;
- বাচ্চার হার্টবিট কমে গেলে ও বাচ্চার পজিশন ঠিক না থাকলে;
- ইমার্জেন্সি ছাড়া সি-সেকশন করা যাবে না। প্রথম সিজারের পর নরমাল ডেলিভারি করা যাবে তবে সেলাইয়ের পুরুত্ব খেয়াল করে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সিজারে প্রথম বাচ্চা হওয়ার অন্তত ২ বছর পর পরবর্তী বাচ্চা নেওয়া যেতে পারে;

৪. পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন

পোস্ট-পার্টাম অর্থাৎ প্রসব-পরবর্তী মুহূর্তে হতাশা অনুভূত হওয়া গর্ভকালীন সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়। প্রসব-পরবর্তী সময়টাতে সাধারণত শিশুর দিকেই সবাই অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং তাকে ঘিরেই এক আনন্দঘন মুহূর্ত তৈরি হয়। প্রেগন্যান্সির একটা বড় চাপের পর হঠাৎ হরমোনাল পরিবর্তনের জন্য মায়ের মধ্যে এক ধরণের হতাশা কাজ করে। এটি একটি সাধারণ ফিজিওলজি। এ সময়ে মায়ের মনে এই ভেবে হতাশা জন্মায় যে, তার দিকে কেউ ততোটা মনোযোগ দিচ্ছে না, সকলে বাচ্চাকে নিয়ে মেতে আছে। তাই এই সময়টাতে মায়েরও অনেক পরিচর্যা করা দরকার। সবার উচিত তাকে সহযোগিতা করা ও সঙ্গ দেওয়া। পরিবারের সদস্যদেরকে; বিশেষ করে নিজের স্বামীকে ভালো করে প্রসবের পূর্বেই এই বিষয়ে বুঝিয়ে দেয়া উচিত। স্বামীর দায়িত্ব হবে পরিবারের বাকী সকলকে বিষয়টা বুঝানো। এ সম্পর্কে যখন সবাই মোটামুটি একটা ধারণা পাবে তখন তারা সবাই আগে থেকেই প্রস্তুত থাকবে বলে আশা করা যায়।

পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশন সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের কোনো প্রকার ধারণা না থাকার কারণে অনেক সময় মায়েদেরকে বহু পারিবারিক সমস্যা ও ভুল বোঝাবুঝির সম্মুখীন হতে দেখা যায়।

পোস্ট-পার্টাম ডিপ্রেশনের কিছু লক্ষণ

- দ্রুত মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়া, মন খারাপ থাকা;
- হতাশগ্রস্ত ও বিষণ্ণ থাকা;
- মানসিক অবসাদ বোধ করা;
- কেউ মায়ের খেয়াল নিচ্ছে না, সবাই শুধু বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত, মায়ের কাছে এমন মনে হওয়া;
- ঠিকমতো ঘুম না হওয়া;
- আগে যেসব কাজ করতে ভালো লাগত এখন তা করতে ভালো না লাগা;
- বাচ্চা বা স্বামীর প্রতি অনীহাও জন্ম নিতে পারে।



||১৯তম দারস||

মাসায়িলুত তারবিয়াত

সন্তান লালন-পালন বিষয়ক প্রশ্ন

১. আমার ৫ বছরের বাচ্চা ছবি আঁকতে পছন্দ করে। কী ধরনের ছবি আঁকা জায়েয?

◈ তাদের ছোট থেকে ইসলামী শরী'আহ শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রাণীর ছবি ব্যতীত যেকোনো ছবিই আঁকা যাবে।

২. বাচ্চাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য মিথ্যা বলা যাবে?

◈ না, যাবে না। এমনভাবে হিকমতের সাথে বলতে হবে যাতে মিথ্যা না হয়।

৩. বাচ্চাদেরকে কেমন ধরণের খেলনা দেওয়া যেতে পারে?

◈ ছেলে বাচ্চাদের গাড়ি, বন্দুক ইত্যাদি জাতীয় খেলনা দেওয়া যেতে পারে। আর মেয়ে বাচ্চাদেরকে হাড়ি-পাতিল, ঘর-বাড়ির সামগ্রী জাতীয় খেলনা দেওয়া যায়। এছাড়া প্রাণীর আকৃতি বোঝা যায় না এমন খেলনাও দেওয়া যেতে পারে।

৪. শাষণের জন্য সন্তানের গায়ে হাত তোলা যাবে? সেক্ষেত্রে প্রহারের হার কেমন হওয়া উচিত?

◈ গাল, চেহারা ও স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো বাদে হালকা প্রহার করা যাবে।

৫. মেয়েকে কত বছর থেকেই হিজাব পরাবো?

◈ নাবালিকা অবস্থা থেকেই অভ্যাস করানো উচিত।

সন্তানের অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন

৬. নিজ পিতামাতা যদি বছরের পর বছর সীমাহীন জুলুম করেই যায়, হক থেকে বঞ্চিত করে, এক্ষেত্রে সন্তানের করণীয় কী? উল্লেখ্য, একজন সন্তানের ক্ষেত্রেই এমন করা হয় অর্থাৎ অন্য সন্তানদের বেলায় সবকিছু ঠিকঠাকভাবে করা হয়।

◈ শরী'আহসম্মত অধিকার চাওয়া এবং এ নিয়ে উত্তম তরিকায় বাক-বিতণ্ডা করা উক্ত সন্তানের জন্য বৈধ।

মেডিকেল—বিষয়ক প্রশ্ন

৭. সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করলে সহবাসের পর কি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে ভালো হয়? যদি হয় তাহলে কি সোজা হয়ে শোয়া ভালো নাকি ডান কাতে?

◈ শুয়ে থাকতে পারেন তবে এতে তেমন কোনো বিশেষ উপকারিতা নেই।

৮. গর্ভাবস্থায় সহবাসের ক্ষেত্রে আসনের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে?

◈ গর্ভাবস্থায় আসনের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এমন আসন বাছাই করতে হবে যে আসনে পেটে চাপ না পড়ে।

৯. আমি শুনেছি ২১ বছর হওয়ার আগে বাচ্চা নেওয়া ঠিক না, এতে কিনা মায়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এ কথা কি সঠিক? নাকি ১৮ বছরের পর থেকেই বাচ্চা নেওয়া সম্ভব?

◈ কম বয়সে সন্তান নেওয়ায় কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই ইন শা আল্লাহ।

১০. একটি সন্তান জন্মের পর কত বছরের ব্যবধানে পরের সন্তানটি নিলে আগের সন্তানকে দুগ্ধপানে/পুষ্টি প্রদানে/পালনে কোনো সমস্যা হবে না?

◈ যদি নরমাল ডেলিভারি হয় তাহলে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। এটা যার যার সক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। অনেকে প্রথম বাচ্চার ৬ মাসের সময় দ্বিতীয় বার কনসিভ করেন এবং ভালোমতোই পারছেন দুই সন্তানকে সমানভাবে কেয়ার করতে, নরমাল ডেলিভারিসহ। তবে সিজারিয়ান সেকশনে হলে বাচ্চা নেওয়ার আগে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন, সেলাইয়ের অবস্থা দেখে ডাক্তার মতামত জানাবেন। কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এবং আমাদেরও মতামত এই যে, প্রথম বাচ্চার কমপক্ষে ২ বছর পর দ্বিতীয় বাচ্চা নেওয়া। সেটা সন্তান এবং মা উভয়ের জন্যই উত্তম। কারণ গর্ভাবস্থা, ডেলিভারি এই প্রক্রিয়াগুলোতে একজন মায়ের মাঝে অনেক পরিবর্তন আসে, নিজের যত্ন নেওয়ার জন্যও এই সময়টুকু অনেক দরকার।

১১. গর্ভাবস্থায় দাড়িয়ে সালাত আদায় করলে কোনো সমস্যা হবে?

◈ যদি অসুবিধা মনে না হয় তাহলে পড়তে পারেন কিন্তু যদি দাড়িয়ে সালাত আদায় করা একদমই সম্ভব না হয়, তাহলে বসে বসে আদায় করতে পারেন ইন শা আল্লাহ। মেডিকেল দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নেই।

১২. গর্ভপাতের কতদিন পর আবার সন্তানের জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে?

◈ গর্ভপাত অনেক ধরণের হয়। তাই গর্ভপাতের পর ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে পরিকল্পনা করা উচিত। ডাক্তার আপনার অবস্থা দেখে তারপর পরামর্শ দেবেন।

১৩. গর্ভধারণ অবস্থায় সহবাস করলে কি কোনোভাবে আবার গর্ভধারণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

◈ না, একবার গর্ভাবস্থা নিশ্চিত হওয়ার পর আর সম্ভাবনা নেই।

تم بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم
الصالحات

তুলিবাদের পাতা

নারী। যাদের জীবনে অনেক দায়িত্ব। শৈশবকাল থেকেই তার সেই দায়িত্ব শুরু হয়ে যায়। কৈশোরের চৌকাঠে পা দিলেই বাবার বাড়ির সংসার গুছানোর দায়িত্ব চেপে বসে কাঁধে। তারপর বয়স হলে বিয়ে, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি বা নিজের সংসার। স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকদের নিয়ে গড়ে ওঠে আরেকটি নতুন জীবন। এরই মাঝে কোল জুড়ে আসে এক চিলতে মায়া। সন্তানকে মানুষ করার ঝোঁক তখন চেপে বসে মাথায়। অনেক দায়িত্ব! আর সেই নারী যদি হয় আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের প্রকৃত অনুসারী, তাহলে তো তার দায়িত্ব বেড়ে যায় কয়েকগুণ। সাথে যুক্ত হয় জবাব্দিহিতার ভয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা, স্বামীকে খুশি রাখা, নিজেকে পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে হেফাযত করা, সন্তানদের দ্বীনি পরিবেশ দেয়া, চারপাশের মানুষগুলোকে দ্বীনের পথে আহ্বান করা, একবিংশ শতাব্দীর বড় বড় ফিতনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাওয়া...আরও কত কি!

আল্লাহ ﷻ পবিত্রতা পছন্দ করেন। সেই পবিত্রতা দেহের, সেই পবিত্রতা আত্মার। একজন মুসলিমাহ নিজের দেহ, পোশাক, সৌন্দর্য, চরিত্র, আখলাক সবকিছুই পবিত্র রাখবে, কলুষিত হতে দিবে না। তারাই তো 'মুহস্বানাত', তাবৎ দুনিয়ার সবচেয়ে দামী সম্পদ।

inbaat publication

ইনবাত পাবলিকেশন
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
দোকান নং- ৫৭, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭১১৭৩৫৯৬৫
www.inbaat.com/pub
www.facebook.com/inbaat.pub